উপনিষদ প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ খণ্ড ঃ তৈত্তিরীয়

শ্রীমৎ অনির্বাণ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

[Ishopanishad Vol VI
Taittiriya
Upanishad
(32)
Upanishat
Prasanga
V.6.

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্

উপনিষৎ-প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ খণ্ড

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্

শ্রীমৎ অনির্বাণ

১৯৬৫ সালে প্রদত্ত প্রবচন অবলম্বনে

অনুবাদ, সংযোজন ও সম্পাদনা গৌতম ধর্মপাল

অনুলেখন : ব্রততি মুখোপাধ্যায়

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

রাজবাটী, বর্ধমান-৭১৩১০৪

ISBN No. : 81-87259-49-3

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তক মেলা, ২০০৭

মূল্য : ৬০ টাকা

গ্রন্থস্বত্ব : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশক : ড. ষোড়শীমোহন দাঁ, রেজিস্ট্রার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
মুদ্রক : ইউনাইটেড অফসেট, নতুনপল্লী, বর্ধমান

নিবেদন

কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সপ্তম থেকে নবম পর্যন্ত তিনটি প্রপাঠক নিয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্। শ্রীমৎ অনির্বাণ আমাদের কেয়াতলা-স্থিত বাড়ির ধর্মসভায় ৬-২-১৯৬৫ থেকে ১০-৭-১৯৬৫ পর্যন্ত এই উপনিষদ্ নিয়ে প্রবচন করেছিলেন। প্রবচনের নোট্স্ আমি যথারীতি গুজরাতী লিপিতে লিখে নিয়েছিলাম। নানা জনের আগ্রহে প্রায় ৩৭ বছর পরে খাতা থেকে পুনরুদ্ধার করলাম। অনুলেখন করেছেন শ্রীমতী ব্রততি মুখোপাধ্যায়—তাঁর অধ্যাপনা ও অন্যান্য কাজের বিপুল বোঝা বহন করতে করতে। তার জন্য আমাদের সবার সে ধন্যবাদার্হ।

এই উপনিষদ্ হালিসহর আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ থেকে প্রকাশিত 'আর্যদর্পণ' পত্রিকায় ফাল্গুন ১৪০৯ থেকে ফাল্গুন ১৪১২ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। এজন্য আর্যদর্পণের সম্পাদকদ্বয় স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী ও স্বামী বিমলানন্দ সরস্বতীকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপনিষৎ-প্রসঙ্গ গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠখণ্ড রূপে প্রকাশ করার জন্যে উপাচার্য অধ্যাপক অমিত মল্লিক ও প্রকাশনা শাখার সকলকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গৌতম ধর্মপাল

ঊর্ধ্বকরে

১৯৬৩-৬৪তে বিদেশে শ্রুতি-মার জ্যোতিমঞ্জীর দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে, Linguistic Atom 'বাক্-অণু' লিখে, লুই রেণুর কাছে brilliant প্রশস্তি পাৱা গেল। ১৯৬৫তে গৌতম ধর্মপালের ধর্মসভায় বেদমুনি অনির্বাণের উপনিষৎ প্রবচন শুনতে এলাম। সেদিন 'হাৱু হাৱু' অহো অহো এই সামগান গাইতে গাইতে, আমিই অন্ন, আমিই অন্নাদ, আমিই বিশ্বভুবনের প্রশাস্তা ও অন্তর্যামী, জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন—এই ঘোষণা করতে করতে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ শেষ হচ্ছিল। ৪১ বছর পরে ২০০৬-এ সেই তৈত্তিরীয়-র ভূমিকা লিখছি ঊর্ধ্বকরে, গৌতমবিষ্ণুর 'কান্তসম্মিত উপদেশ' love-message সম্বল করে। স্বস্থ মানুষের জীবন হল দেব-হিত। দেবের অর্থাৎ পরম জ্যোতির্ময়ের দ্বারা নির্ধারিত। কেউ পা ফেলে পিঁপড়ের মতো সারে সারে। কেউ চলে গড্ডলের মতো, সামনের গাড়লটির পেছন-পেছন। সে অতলস্পর্শ খাদে পড়লে তারাও হুড়মুড়িয়ে পড়ে। স্বস্থরা চলেন 'আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো' সেই মহা-আলো-অন্ধকারের জয়ধ্বনি দিতে দিতে ছুটির নিমন্ত্রণে। জ্যোতির্ময় বলব? না জ্যোতির্ময়ী? আমরা তো 'মা' বলছিই। 'অম্বার্থ-নদ্যোর্ হ্রস্বঃ' পা ৭।৩।১০৭ সূত্রে কাশিকা বলছেন, অল্লা শব্দও মাতৃবাচক।

উপনিষৎ গ্রন্থমালার এই ষষ্ঠ খণ্ড শুধু প্রবচন নয়, অনু-প্রবচন এবং অনু-প্রবচনও। অনেক নতুন কথা এবং নতুনতর কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলেছেন গুরু-শিষ্যে, যা বিভ্রান্ত আধুনিকদের পথ দেখাবে।

মহামুনি গিরীন্দ্রশেখর বসুর পুরাণপ্রবেশের গবেষণার সঙ্গে মিলিয়ে, আট হাজার বছর ধরে আমরা বেদ বলছি, বেদ লিখছি, বেদ শুনছি। বলা-শোনা-লেখা করতে করতে তা আমাদের মনোজবা, মনোজিহ্বা, সত্তার সার হয়ে আমাদের নাড়ীর বাঁধনে বেঁধেছে। বি—স্ময়ে তাই জাগে, জাগে আমার গান, আকাশভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ।

বাঁকড়োর সলাতুর'-শলাতুর'-শালতোড়-সাল্তড়ার ছেলে পাণিনির কাল হল মোটামুটি ৩৪০০ বছর আগে। তিত্তিরি ছিলেন পাণিনির পূর্বকালীন যজুর্বেদের বিখ্যাত অধ্যাপক। সূত্র ৪।৩।১০২ তিত্তিরি-বরতন্তু-খণ্ডিক-উখাত্ ছণ্। তাঁর 'চরণে' অর্থাৎ ক্রমিক পাঠ-শালায়, সম্-প্র-দায়ে, School-এ জন্ম হল তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও তৈত্তিরীয় উপনিষদের। ভারতের কোনো দখ্‌না ভুঁইয়ে, যেখানে লোকে 'শিক্ষা' না ব'লে, বলে শীক্ষা। 'অরুক্ষাঃ' না ব'লে, বলে অলূক্ষাঃ। গৌতম বলেন, ইশ আর তৈত্তিরীয়—এই দুটি উপনিষদ কেউ যদি একাগ্র মনে পড়ে, তাহলে জীবনের অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়সের রাস্তা পেয়ে যাবে— যাকে অণু-বৈজ্ঞানিক কণাদ বলেন 'ধর্ম'। কিসে উন্নতি আর কিসে যথার্থ মঙ্গল। অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সাভ্যাং ধর্মঃ।

ঈশ তাঁর বক্তব্য বলে দিয়েছেন প্রথম শ্লোকের প্রথম পাদেই—ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্বম্। গোউরের অনুবাদে—

দেখ সব ঠাঁই ঈশ্বর।
সব তাঁরই উদ্ভাস, পরণের বাস,
তাঁরই বসতের ঘর।।

আড়াল ঘুচলেই আমিই সে। সে-ই আমি-তিনি-তুমি-তুই। তৈত্তিরীয় বলছেন ঐ একই কথা। পর্দায় পর্দায়, খাপে খাপে, ধাপে ধাপে। তিনটি অধ্যায়ে। শীক্ষাবল্লী, ব্রহ্মানন্দবল্লী, ভৃগুবল্লী। লতার তিনটি আঁকশি। তাই দিয়ে পৌঁছই সেই আনন্দেই। আদর্শ ব্রহ্মচারী, আদর্শ গৃহস্থ এই জীবনেই পূর্ণব্রহ্মের উপলব্ধি ক'রে বহু অন্নের দাতা ভোক্তা, মহাশাল মানুষ হন। তাই হয়েছেন মা-কোলকাতার কোলে জন্মানো তিন ঋষি— রবি বিলে অরো। তাঁরা ছন্দস্ থেকে উপনিষদ্ পর্যন্ত বৈদিক সাহিত্যের ধারাকে পষ্টাপষ্টি নামিয়ে এনেছেন ভাষায় সংস্কৃতিতে। তাঁরা বলেছেন, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' নয়। জগৎও পুরোপুরি সত্য। দুঃখও সত্য। দুঃখ থেকে মুক্তির পথও সত্য। তাঁদের ভাবসখা মৈমনসিংহের নরেন্দ্র-অনির্বাণও প্রায় তাই বলছেন। বলছেন মহর্ষি সত্যদেব, দক্ষিণের বাসভাইয়া, পঞ্জাবের রামতীর্থ। দারিদ্র বৈদিক জীবনের আদর্শ নয়। সবার সর্বতোভদ্র জীবনই আদর্শ। এঁরা বুদ্ধ ও শঙ্কর থেকে এগিয়ে গেছেন। জীবন থেকে মুখ ফেরানো নয়। জীবনলোলুপতাও নয়। বিরাটের ছায়াতপে ঘেরা জীবনের সহজিয়া আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।

মহাকবি মহাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দেখা পাঁচটি মহা-সংহিতা বা মহাসন্ধির কথা বলেছেন তৈত্তিরীয়। শিক্ষার আধুনিক ধারণাই পাল্টে দেয়। অধিলোক অধিজ্যোতিষ অধিবিদ্য অধিপ্রজ অধ্যাত্ম। সারা আকাশ ঘুরে থামলে এসে নিজেয়। রবিবাউল একতারাতে তান তুলছেন—

আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই তখন যাহা পাই
সে যে আমি হারাই বারে বারে।।
তিনি যখন ভিক্ষা নিতে আসেন আমার দ্বারে
বন্ধ তালা ভেঙে দেখি আপন-মাঝে গোপন রতনভার,
হারায় না সে আর।।
প্রভাত আসে তাঁহার কাছে আলোক ভিক্ষা নিতে,
সে আলো আর লুটায় ধরণীতে।
তিনি যখন সন্ধ্যা-কাছে দাঁড়ান '**উর্ধ্বকরে**', তখন স্তরে স্তরে
ফুটে ওঠে অন্ধকারের আপন প্রাণের ধন—
মুকুটে তাঁর পরেন সে রতন।।

মিনমিনে ভারত নয়। সাংখ্যায়ন রাজনীতির সংসদীয় গণতন্ত্রের উচ্চশিক্ষার প্যাঁচে আধা-অযোগ্য, নড়বড়ে ভারত নয়। যে-যার কাজে প্রতিষ্ঠিত নিরক্ষর সাক্ষর স্বাধীন বহুবলধারী ভারত। কোলকাতা শান্তিনিকেতন বেলুড় পণ্ডিচেরী কাশী কাঞ্চী গুয়াহাটি শিলং চেন্নাই-র গলিঘুঁজিতে, কামারপুকুর জয়রামবাটির চোরকাঁটায় লুকিয়ে থাকা মহর্লোকের পৃথিবী।

ক্ষুদ্র আমি নয়, জীবনের মহা-চমস্ থেকে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তুলে-আনা মহামৃত্যুঞ্জয় সোমপাত্র। তার কথা বলছেন তৈত্তিরীয়-র ঋষি মাহাচমস্য। এ যুগের তিন মহা ঋষির সঙ্গে একেবারে এক। তাঁদের শাক্ত পদাবলী যে-যার নিজের আখর দিয়ে সাধ্‌তে হবে। তবেই তো?

গৌরী ধর্মপাল
ঋতম্
৯/২ ফার্ন রোড, কলকাতা- ১৯

২৪/০৫/০৬
বুধবার

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
তৈত্তিরীয় উপনিষদের সংক্ষিপ্তসার	১১
শান্তিপাঠ	২০
প্রথম অধ্যায়	
শীক্ষাবল্লী— অনুবাক ১-১২	২৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	
ব্রহ্মানন্দবল্লী— অনুবাক ১-৯	৬৩
তৃতীয় অধ্যায়	
ভৃগুবল্লী— অনুবাক ১-১০	১১৬

সংক্ষিপ্তসার

(বেদমীমাংসা প্রথম খণ্ড, ১৯৬১ সংস্করণ; পৃ ১৬৫-১৭২ থেকে)

তৈত্তিরীয়ারণ্যকের সপ্তম হতে নবম পর্যন্ত তিনটি প্রপাঠক নিয়ে তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। তারও পরে দশম প্রপাঠকটি নারায়ণোপনিষৎ। আচার্যেরা এটিকে খিল বলে গণ্য করেন। আরণ্যকের তিনটি প্রপাঠক উপনিষদে হয়ছে বল্লী—শীক্ষাবল্লী ব্রহ্মবল্লী আর ভৃগুবল্লী।

শীক্ষাবল্লীতে বারটি অনুবাক। শিক্ষা একটি বেদাঙ্গ, তার প্রতিপাদ্য হল মন্ত্রোচ্চারণের বিজ্ঞান (১)। গুরুগৃহে শিক্ষার্থীর জীবন আরম্ভ হয় বেদাভ্যাস দিয়ে, তারপর বেদের রহস্য এবং উপনিষৎ আয়ত্ত করে তার সংসারে ফিরে আসা। শিক্ষাবল্লীতে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত এবং বলিষ্ঠ রেখায় গুরুগৃহের একটি উজ্জ্বল ছবি আঁকা হয়েছে।

প্রথম অনুবাকে শান্তিপাঠ। তাতে বায়ুকে বলা হয়েছে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম (২)। বায়ু অন্তরিক্ষস্থান দেবতা। যজুর্বেদ অন্তরিক্ষ বা প্রাণলোক জয়ের সাধন (৩)। বায়ু তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

---

১. বেদবিদ্যার অনুশীলনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বেদাধ্যয়ন। অধ্যয়নের বিশেষ বিধি ছিল। আচার্য পূর্ব উত্তর বা অপরাজিতা দিকে মুখ করে বসলে শিষ্যেরা তাঁর কাছ থেকে শুনে বেদের শব্দরাশি গ্রহণ করতেন। (সমস্ত কর্মেই দিগ্ বিজ্ঞান দরকার। পূর্বদিকে সূর্যোদয় হয়, উত্তরায়ণে সূর্যের আলো বেড়ে চলে। সুতরাং এই দুটি দিক প্রশস্ত। পূর্বোত্তর দিক্ 'অপরাজিতা') এই ব্যাপারের নাম 'পারায়ণ' বা শিক্ষা। যে শাস্ত্রে এই শিক্ষার বিষয় আলোচিত হয়েছে, তাও শিক্ষা— যা স্বভাবতই বেদাঙ্গের আদি (< √শক্ +স (পা. ৭।৪।৫৪)। ধাতুটির ঋক্‌সংহিতায় যেসব প্রয়োগ আছে, তা হতে এই অর্থ পাওয়া যায় : সমর্থ হওয়া, সামর্থ্য সঞ্চার করা। 'শিক্ষা'র ব্যুৎপত্তিতে এই শেষের অর্থটিই খাটে। বেদমন্ত্রের পারায়ণের সময় আচার্য অন্তেবাসীর মাঝে মন্ত্রের শক্তি সঞ্চারণ করে দিতেন। তা-ই হল 'শিক্ষা'। এই সংজ্ঞার মূল ঋগ্বেদেতেই পাওয়া যায়। তু. ৭।১০৩।৫। সেখানে আচার্য 'শাক্ত', অন্তেবাসী 'শিক্ষমাণ'। এই শিক্ষাই দীক্ষা। তু. কঠোপনিষদে বেদসার ওঙ্কারে নচিকেতার দীক্ষা ১।২।১৫। শিক্ষার সাধারণ লক্ষণ : 'বর্ণস্বরাদ্যোচ্চারণ-প্রকারো যত্রোপদিশ্যতে যা শিক্ষা' (সায়ণ ঋ. ভা. উপোদ্‌ঘাত পৃ. ২৫ তিলকমন্দির সং)।

শিক্ষার সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় তৈত্তিরীয়োপনিষদে। সেখানে শিক্ষার বিষয়বস্তুর একটি তালিকা আছে। তার মধ্যে দেখা যায় সন্তান বা সংহিতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। (দ্র. বেমী পৃ ২২৩, বেদাঙ্গ ২।) বাক্ সর্বশক্তিময়ী (তু. ঋ রাষ্ট্রী দেবানাম্ ৮।১০০।১, ইষমূর্জং দুহানা ১১, বাক্‌সূক্ত ১০।১২৫), সুতরাং মন্ত্রবর্ণের একটা নিজস্ব শক্তি আছে। তাই তার উচ্চারণবিশুদ্ধি প্রয়োজন (দ্র. সায়ণ ঋ. ভা. ঐ)। ঋক্‌সংহিতাতেও অধ্যয়নপ্রশংসা আছে ৯।৬৭।৩১-৩২। তু. ঐ. ব্রা. ন্যূঙ্খবিধি ৫।৩; স্বর উষ্ম ও স্পর্শবর্ণের উচ্চারণবিধি ছা. ২।২২।৩-৫)।

২. বৈদিক চিন্ময়প্রত্যক্ষবাদের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয় দিয়েও উপলব্ধি করা যায়। এই থেকেই উপনিষদের 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছা. ৩।১৪।১)। অধিভূত দৃষ্টি তখন রূপান্তরিত হয় অধিদৈবত দৃষ্টিতে। বৃহদারণ্যকে বায়ু অমূর্ত (২।৩।৩),— এটি অধিভূত দৃষ্টি। অথচ ঋক্‌সংহিতায় তিনি 'দর্শত' (১।২।১)— এটি অধিদৈবত দৃষ্টি।

৩. তু. প্র. ৫।৭।

দ্বিতীয় অনুবাকে বলা হচ্ছে শিক্ষার অধ্যেতব্য বিষয় কি কি। সন্তান বা সংহিতাই তার মধ্যে প্রধান (৪)। তৃতীয় অনুবাকে তাই সংহিতার উপনিষৎ বা নিগূঢ় তত্ত্ব বলা হয়েছে। সংহিতার পাঁচটি অধিকরণ— লোকে জ্যোতিতে বিদ্যায় প্রজাতে এবং আত্মায় বা শরীরে (৫)। এইগুলিই মহাসংহিতার আধার। আর মহাসংহিতার বিজ্ঞানই মানুষের সমস্ত পুরুষার্থের সাধক (৬)।

চতুর্থ অনুবাকে আচার্যের প্রস্তুতি। বিদ্যা যিনি দেবেন, তাঁর দেবার অধিকার থাকা চাই। তিনি হবেন অমৃতের আধার। বিদ্যা তাঁতে আবিষ্ট হয়ে দেহকেও করবে 'বিচর্ষণ' কিনা শক্তির বৈদ্যুতে টলমল (৭)। বিদ্যার সঙ্গে চাই শ্রীও, নইলে অন্তেবাসীদের ভরণপোষণ চলবে কি করে? আচার্যকে ভিতরে-বাইরে সবদিক দিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে।

প্রস্তুতির পর ব্রহ্মচারীদের উদ্দেশে আচার্য উদাত্ত আহ্বান পাঠিয়ে দিলেন দিকে দিকে— 'তোমরা এসো'। এ-আহ্বান সহস্ররশ্মি আদিত্য-দ্যুতিতে আবিষ্ট চেতনার আহ্বান কিশোর প্রাণের কাছে (৮)। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে এ-ছবির তুলনা নেই।

তারপর কয়েকটি অনুবাকে গুরুগৃহে অনুশীলিত বিদ্যার বিবৃতি। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুবাকে ব্যাহৃতি-বিদ্যা। প্রবক্তা ঋষি মাহাচামস্য। ব্যাহৃতি সৃষ্টির মন্ত্র (৯) ভূঃ ভুবঃ স্বঃ— এই তিনটি ব্যাহৃতিতে অপরার্ধের আবির্ভাব হয়। চতুর্থী ব্যাহৃতি মহঃ পরার্থের দ্যোতক। মহঃ ব্রহ্ম, মহঃ আত্মা। আত্মচৈতন্যের মহিমাই ব্রহ্মচৈতন্য (১০)। দেবতারা

---

৪. অধ্যেতব্য বিষয়ের প্রথম তিনটির সম্পর্ক বাকের সঙ্গে, পরের তিনটির সম্পর্ক বক্তার সঙ্গে। সন্তান বা সংহিতার লক্ষ্য ঐকপদ্যপ্রত্যয়ের উৎপাদন। মন্ত্রের ব্যঞ্জনা তাইতে পর্যবসিত হয় ব্যাহৃতিতে. ব্যাহৃতির ব্যঞ্জনা ওঙ্কারে। তারপর তুরীয়া বা বৈখরী বাক্‌কে গুহাহিত আর-তিনটি পদে ক্রমে উঠিয়ে নেওয়াই হল 'উচ্চারণ' বা শিক্ষাবিজ্ঞানের রহস্য (দ্র. ঋ. স. ১।১৬৪।৪৫; মা. ৮-১২)।

৫. প্রত্যেক লোকেরই অধিষ্ঠাতৃচৈতন্য হল জ্যোতি। বিদ্যার সহায়ে এই জ্যোতিকে নামিয়ে আনতে হবে নিজের আধারে— বাকে। তারপর সম্প্রদায়কে অবিচ্ছেদ রাখবার জন্য তাকে সঞ্চারিত করতে হবে শিষ্যে বা প্রজায়। এমনি করে বেদাধ্যয়ন হবে অনন্ত-দেশকালব্যাপী একটি অখণ্ড প্রত্যয়ের সাধক। এই হল সংহিতার উপনিষৎ।

৬. ফলশ্রুতিতে পাঁচটি পুরুষার্থের উল্লেখ আছে। অন্ন পশু এবং প্রজা অর্থাৎ দেহ-প্রাণের পুষ্টি সবাই চায়। যাঁরা ধীর, তাঁরা অধিকন্তু চান ব্রহ্মবর্চস এবং সুবর্গ্য লোক বা পরমপদ।

৭. তু. শরীরং মে বিচক্ষণম্ ঋ. (খিল) ৪।৮।৫। ঋক্‌সংহিতায় আছে 'বিচর্ষণি' (দ্র. ৩।২।৮ টীকা)। নিঘ. পশ্যতিকর্মা (৩।১১)। কিন্তু শব্দটি √চর্ হতে উৎপন্ন, অর্থ 'বিচরণশীল'; এখানে বোঝাচ্ছে অন্নময় আধারে প্রাণস্পন্দকে। তু. সাত্ত্বিকবিকার।

৮. গৃহ্যসূত্রে ব্রাহ্মণকুমারকে আট বছর বয়সে উপনয়ন দেবার কথা আছে। ষোল বছর পর্যন্ত দেওয়া চলে (আশ্ব. ১।১৯।১-৬; তু. মনু ২।৩৬, ৩৮) এই সঙ্গে তু. ঔপনিষদ পুরুষ ষোড়শকল। ষোল বছর পর্যন্ত কৈশোর। মর্ত্যতনুতে দিব্যচেতনার আবেশ এই সময়েই হতে পারে, অধ্যাত্মসাধনার এটি একটি নিগূঢ় রহস্য। উপনিষদে দুটি সত্যার্থী কিশোরের অপরূপ কাহিনী আছে— কঠে নচিকেতার আর ছান্দোগ্যে সত্যকামের।

৯. ব্রাহ্মণে ব্যাহৃতির অনেক প্রসঙ্গ আছে। দ্র. ঐ. ৫।৩২, ৮।৭; তৈ. ২।২।৪।৩; শ. ২।১।৪।১০...। তিনটি ব্যাহৃতির সার হল প্রণব (ঐ. ব্রা. ৫।৩২)। তু. তৈ. স. ৫।৫।৫।৩।

১০. তু. 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (বৃ. ২।৫।১৯, ৪।৪।৫)।

এই চৈতন্যের অঙ্গ বা বিভূতি। চারটি ব্যাহৃতিকে লোক জ্যোতি বিদ্যা এবং আত্মা বা আধার— এই চারদিক থেকে দেখা যেতে পারে (১১)। তাহলে পাই ব্রহ্মপুরুষের ষোলটি অবয়ব। বেদের পুরুষ ষোড়শকল।

সেই পুরুষ আছেন হৃদয়ের মাঝে যে আকাশ (১২) তাতে মনোময় হিরণ্ময় অমৃত হয়ে (১৩)। এই দেহেই অন্তরাবৃত্ত হয়ে তাঁকে অনুভব করা যায়। তালুর ভিতর দিয়ে সুষুম্ণা নাড়ী চলে গেছে মূর্ধার দিকে। তার আরেক নাম ইন্দ্রযোনি (১৪)। এই পথ ধরে ঊর্ধ্বস্রোতা চেতনা শিরঃকপাল বিদীর্ণ করে মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়। ঊর্ধ্বগতির সময় একেকটি ব্যাহৃতির প্রতিপাদ্য একেকটি দিব্যজ্যোতির আবির্ভাব হয়। অগ্নি বায়ু এবং আদিত্য পার হয়ে পাই ব্রহ্মকে (১৫)। এই পাওয়াই স্বারাজ্য। পুরুষ তখন বাক্, চক্ষু শ্রোত্র মন এবং বিজ্ঞানের পতি (১৬)। তিনি তখন আকাশশরীর সত্যাত্ম প্রাণারাম মন-আনন্দ শান্তি সমৃদ্ধ অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ।

তারপর সপ্তম অনুবাকে পাঙ্‌ক্ত ব্রহ্মবিদ্যা। পঙ্‌ক্তি একটি পঞ্চাক্ষর ছন্দ। সবকিছু সেই ছন্দে গাঁথা, সব পাঁচের খেলা (১৭)। অধিভূতদৃষ্টিতে যেমন দেখছি পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চলোক, অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চদেবতা বা পঞ্চজ্যোতি (১৮), অপ্ প্রভৃতি পঞ্চভূত; তেমনি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখছি প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চবায়ু, চক্ষুঃ প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয় (১৯) এবং চর্ম প্রভৃতি পঞ্চধাতু। মোটের উপর যেমন অধিভূত বিষয় পনেরটি, তেমনি অধ্যাত্ম বিষয়ও পনেরটি। পনের-র অধিষ্ঠাতৃরূপে ষোড়শকল পুরুষ। পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই

---

১১. আগের দুটিতে দৃষ্টি অধিদৈবত (Objective), পরের দুটিতে অধ্যাত্ম (Subjective)। বাইরে-ভিতরে মহিমার অনুভবই তুরীয়সম্পত্তি বা ব্রহ্মানুভব।

১২. হৃদয়ই অধ্যাত্মোপলব্ধির প্রকৃষ্ট স্থান, এই কথাটি উপনিষদের নানা জায়গায়। হৃদয় হতেই নাড়ীপথ ধরে প্রাণ ঊর্ধ্বস্রোতা হয়ে চলে যায় আদিত্যের দিকে। এই ভাবটির মূল রয়েছে ঋক্‌সংহিতায় : এতা অর্ষন্তি হৃদ্যাৎ সমুদ্রাৎ (৪।৫৮।৫), অন্তঃসমুদ্রে হৃদ্যন্তরায়ুষি, অপামনীকে সমিথে (১১)। উপনিষদে যেমন হৃদয়াকাশ, সংহিতায় তেমনি হৃদ্যসমুদ্র। তু. ঋ. ইন্দ্রায় হৃদা মনসা মনীষা (১।৬১।২)।

১৩. তু. মু. ২।২।৭। পুরুষ মনোময়— এটা তাঁর সঙ্কোচের পরিচয় নয়। উত্তারপন্থায় মনকে ছাপিয়ে যেতে হয়, তার কথা পরে আছে (২।৩-৪)। কিন্তু আকাশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আবার অনুভব করি, তিনিই দেহে প্রাণে মনে সর্বত্র (তু. ১।৬।২; শাণ্ডিল্যবিদ্যা ছা. ৩।১৪।১-২; বৃ. ৪।৪।৫, ৫।৬।১)। এ-অনুভব অবতরণের।

১৪. 'ইন্দ্রযোনি' ইন্দ্রকে বা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার মার্গ। ঐতরেয়োপনিষদে তাকে বলা হয়েছে 'বিদৃতির্নাম দ্বাঃ' বা 'নান্দন' (১।৩।১২)। ঋক্‌সংহিতার আপ্রীসূক্তগুলিতে এই দুয়ারের নাম 'দেবীর্দ্বারঃ' (দ্র. ৩।৪।৫ টীকা), উপনিষদে তা-ই 'লোকদ্বার' (ছা. ২।২৪, ৮।৬।২-৬)। নান্দন আর সুষুম্ণ সমার্থক। ইন্দ্রযোনিই যোগশাস্ত্রের ব্রহ্মরন্ধ্র।

১৫. তু. কে. ৩, ৪। আদিত্যের জায়গায় সেখানে পাই ইন্দ্র। কিন্তু ইন্দ্রও আদিত্য। বৃত্রবধের দ্বারা বর্ষা নামানো এবং আলো ফোটানো দুইই তাঁর কাজ।

১৬. প্রাণের জায়গায় পাচ্ছি বিজ্ঞানকে। কৌষীতকীতে দেখেছি, প্রাণ আর প্রজ্ঞায় কোনও ভেদ নেই (২।১৪, ৩।৯)।

১৭. তু. তৈ. ব্রা. ১।১।১০।৪ (পঞ্চাগ্নি প্রসঙ্গে); বৃ. ১।৪।১৭।

১৮. পরম্পরাটি লক্ষণীয়। তার ভিতর দিয়ে সূচিত হচ্ছে চেতনার উত্তরায়ণ। কঠোপনিষদে বায়ুর জায়গায় আছে বিদ্যুৎ (২।২।১৫)।

১৯. প্রাণের জায়গায় পাচ্ছি ত্বক্। ত্বক্ স্পর্শেন্দ্রিয়। অধ্যাত্ম প্রাণ অথবা অধিদৈবত বায়ুর গুণও স্পর্শ। এই স্পর্শ ঋক্‌সংহিতায় 'পৃশ্নি', মরুদ্‌গণ সেখানে 'পৃশ্নিমাতরঃ' (১।২৩।১০, ৩৮।৪, ৮৫।২, ৫।৫৭।২...)।

বিভূতি, তাঁরই পাঁচের খেলা, তিনিই সব— এই হল উপনিষৎ।

তারপর অষ্টম অনুবাকে প্রণববিদ্যা। ওম্‌ই ব্রহ্ম, ওম্‌ই সব-কিছু (২০)।

তারপর নবম অনুবাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবনাদর্শের বিবৃতি। স্বাধ্যায় এবং প্রবচনের দ্বারা বিদ্যার অনুশীলন এবং সম্প্রদানের ধারা তাঁকে অব্যাহত রাখতে হবে। ঋত সত্য তপঃ দম এবং শম হবে তাঁর আশ্রয়। তাঁকে অগ্ন্যাধান করে অগ্নিহোত্রী হতে হবে। অতিথিসৎকার এবং মানুষের প্রতি যথাকর্তব্য করতে হবে। সন্তানোৎপাদন করে গৃহকে সুব্যবস্থিত করতে হবে (২১)।

এইসব সাধনাঙ্গের মধ্যে রাথীতরের মতে সত্যই শ্রেষ্ঠ, পৌরুশিষ্টির মতে তপ, এবং মৌদ্‌গল্যের মতে স্বাধ্যায় ও প্রবচন।

তারপর দশম অনুবাকে ঋষি ত্রিশঙ্কুর বেদানুবচনে ব্রহ্মাত্মভাবের গম্ভীর প্রকাশ।

একাদশ অনুবাকে গুরুকুল হতে সমাবর্তনের সময় অন্তেবাসীর প্রতি আচার্যের অনুশাসন। আচার্য বলছেন, 'অপ্রমত্ত থেকো : সত্য থেকে ধর্ম হতে কুশল (২২) হতে ভূতি হতে স্বাধ্যায়-প্রবচন হতে কখনও বিচ্যুত হয়ো না। মাতৃদেব পিতৃদেব আচার্যদেব অতিথিদেব হয়ো। তোমার কর্ম অনবদ্য হ'ক। সুচরিতের অনুশীলন করো। ব্রহ্মবিদ্‌দের সম্মান করো। দান করো— শ্রদ্ধা শ্রী হ্রী ভয় আর সংবিৎ নিয়ে। ব্রহ্মবিদ্‌দের আচরণে জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজো'।

ভারতবর্ষের সমাজ এই অনুশাসনকে যথাসাধ্য পালন করবার চেষ্টা করে এসেছে।

দ্বাদশ অনুবাকে শান্তিপাঠের অনুবৃত্তিতে শীক্ষাবল্লীর শেষ।

তারপর নয়টি অনুবাকে ব্রহ্মাবল্লী। তার প্রথম অনুবাকেই ব্রহ্মের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' (২৩)। এই ব্রহ্ম পরমব্যোমে গুহাহিত হয়ে

---

২০. প্রণববিদ্যা সর্ববিদ্যার সার, প্রায় সমস্ত উপনিষদেই তার প্রসঙ্গ আছে। এখানে ব্রহ্ম বলতে শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম দুইই বোঝাচ্ছে। সংহিতায় 'ব্রহ্ম' বিশেষ করে বোঝায় শব্দব্রহ্মকেই। যে শব্দরাশি বেদ বা জ্ঞানের বাহন, তা 'ব্রহ্ম'। ঐ শব্দরাশির সার ব্যাহৃতি, তার সার প্রণব (ঐ. ব্রা. ৫।৩২)। ব্যাহৃতি লোকসৃষ্টির মন্ত্র, সুতরাং প্রণব আকাশে সৃষ্টির আদিস্পন্দ। ঋক্‌সংহিতার ভাষায় গৌরীরূপিণী একপদী বাক্, যাঁর হাম্বারবে কারণসলিল ব্যাকৃত হল (১।১৬৪।৪১)।

২১. ব্রাহ্মণের জীবন ব্রহ্মলাভেরই প্রস্তুতি। গৃহস্থ ব্রহ্মবিদ্ হতে পারেন না, প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলিতে এমন কথা পাওয়া যায় না। এই ভাবটি এসেছে পরে। মনে হয়, তা অবৈদিক মুনি-সম্প্রদায়ের প্রভাবের ফল।

২২. 'অপ্রমত্ত থেকো' এটি বুদ্ধদেবেরও অন্তিম উপদেশ। 'কুশল' বৌদ্ধধর্মে একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা। বলা হয়েছে, কুশলের করণ, অকুশলের অকরণ এবং চিত্তশুদ্ধি— এই তিনটিই বুদ্ধানুশাসনের সার।

২৩. বেদান্তে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ হল সৎ-চিৎ-আনন্দ। উপনিষদে কোথাও এ-তিনটিকে এক জায়গায় পাওয়া যায় না। তাই কেউ কেউ প্রস্তাব করেন, 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম'র জায়গায় পড়া হ'ক 'সত্যং জ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম'। কিন্তু সেক্ষেত্রে পাঠান্তরকল্পনা নিষ্প্রয়োজন। আনন্দের প্রসঙ্গ এই বল্লীর শেষে বিস্তৃতভাবেই আছে। সুতরাং সমস্ত বল্লীটিকেই বৈদান্তিক সচ্চিদানন্দ-ভাবনার বীজ বলা যেতে পারে, তার জন্য আনন্ত্যের ভাবনাকে ছেঁটে ফেলবার কোনও দরকার হয় না। মনে রাখতে হবে, ব্রহ্ম বা বৃহতের চেতনার প্রতিষ্ঠাই আনন্ত্যে।

আছেন (২৪)। তাঁকে জানা-ই আমাদের পুরুষার্থ এবং তাইতে সমস্ত কামনার পরিতৃপ্তি। আবার এই ব্রহ্মই আমাদের আত্মা।

তারপর ষষ্ঠ অনুবাক পর্যন্ত আত্মচৈতন্য কি করে ব্রহ্মচৈতন্যে বিস্ফারিত হতে পারে, তার বিবৃতি।

চৈতন্যের বিস্ফারণ ঘটে অন্তরাবৃত্তির দ্বারা। পুরুষকে এখানে কল্পনা করা হয়েছে যেন একটি পাখি— উড়ে চলেছে অনন্তের পানে (২৫)।

প্রাকৃত দৃষ্টিতে পুরুষকে প্রথম দেখতে পাচ্ছি অন্নরসময় বা জড়ময়। তখন দেহই তার আত্মা বা আমিত্ববোধের আধার। দেহ অন্নের বিকার। অন্ন জড় কিন্তু জানতে হবে, এই অন্নও ব্রহ্ম (২৬)।

তবে কিনা অন্নময় দেহই পুরুষের সব নয়। এই অন্নময় আমির অন্তরে আছে প্রাণময় আমি। সেই প্রাণ দেহকে পূর্ণ করে রেখেছে, সে-ই বস্তুত দেহের আত্মা। তার নিজের আত্মা হল আকাশ (২৭)। এই প্রাণও ব্রহ্ম।

এমনি করে প্রাণময় পুরুষের অন্তরে আছে মনোময় পুরুষ, আদেশ তার আত্মা (২৮)। মনোময় পুরুষের অন্তরে বিজ্ঞানময় পুরুষ, যোগ তার আত্মা (২৯)। তার অন্তরে আনন্দময় পুরুষ, আনন্দই তার আত্মা।

এই আনন্দকে জানাই পুরুষের পরমার্থ। তা-ই ব্রহ্মকে জানা।

---

২৪. 'পরমব্যোম' ঋক্‌সংহিতায় পরিভাষিত চেতনার উত্তম ভূমি। অন্য নাম, —নাক, উরুলোক, পরমপদ, অনিবাধ ইত্যাদি। উপনিষদে তা-ই 'আকাশ'। গুহা হার্দাকাশ। পরমব্যোমকে হৃদয়ে অনুভব করার ফলেই বলা চলে 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'।

২৫. এই কল্পনাটি সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে সুপরিচিত। অগ্নিচয়নের বেদির আকার পাখির মত। উপনিষদে এই ভাবনাটি অনুসৃত হয়েছে। আদিত্য হংস বা সুপর্ণ (ঋ. ৪।৪০।৫; ১।৩৫।৭...)। আদিত্যে যে-পুরুষ, তিনিই আবার গুহাহিত পুরুষ (তৈ. ২।৮।৫)। এই পুরুষও একটি পাখি। দুটি পাখি সযুক্ সখার মত জড়িয়ে আছেন একই গাছকে (ঋ. ১।১৬৪।২০)।

২৬. অন্ন জড় বা matter। কিন্তু matter-এর চাইতে সংজ্ঞাটি বেশী ব্যঞ্জনাবহ। উপনিষৎ সত্তাকে দুভাগ করেছেন— এক ভাগ অন্ন, আরেক ভাগ অন্নাদ। অন্নাদ অন্নকে আত্মসাৎ করে, অন্নই রূপান্তরিত হয় অন্নাদে। এই আত্তীকরণের (assimilation) পরম্পরাই হল সৃষ্টির মাঝে ঊর্ধ্বপরিণামের ধারা। সুতরাং অন্ন নিছক জড় নয়, চৈতন্যে রূপান্তরিত হবার সামর্থ্যযুক্ত জড়। তাকে আশ্রয় করে চেতনার ক্রমিক উৎকর্ষণ সৃষ্টির রহস্য। অন্ন হতে আত্মা পর্যন্ত এই ক্রমটিই এখানে বিবৃত হচ্ছে। জীব অন্নাদ; কিন্তু পরম অন্নাদ হলেন সেই পরম চৈতন্য (তু. দেবীসূক্ত 'ময়া সো অন্নমত্তি' ঋ. ১০।১২৫।৪)।

২৭. অন্নরসময় আত্মচৈতন্যের অনুভবকে নিয়ে যেতে হবে প্রাণময় আত্মচৈতন্যের গভীরে। এই ধারা সর্বত্র। প্রাণের আত্মা বা অধিষ্ঠান আকাশ অর্থাৎ প্রাণ আকাশেরই স্পন্দমাত্র। আকাশ-প্রাণ শিব-শক্তির মত একটি মিথুন। এই প্রাণের অনুভব পাওয়া যেতে পারে সুষুপ্তিতে, যখন চেতনা নির্বিষয় অতএব আকাশবৎ (তু. প্র. ৪)।

২৮. 'আদেশ' প্রচোদিকা বাক্ (১০।১০, ১২।৪)। মনের মাঝে ঊর্ধ্বচেতনার আবেশের ফলে এটি স্ফুরিত হয়। এটি 'মনোজবা' অগ্নিশিখার সঙ্গে তুলনীয় (মু. ১।২।৪; তু. হৃদা তষ্টেষু মনসো জবেষু ঋ. ১০।৭১।৮)।

২৯. পাতঞ্জলদর্শনেও পাই, বিজ্ঞানভূমিই যোগের প্রবর্তক। চিত্ত তখন একাগ্র। সংহিতায় এইটি 'ধীযোগ'। তার সূচক কতকগুলি মন্ত্র শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পাই (২।১-৫)।

যে-জানার দুটি রূপ— অসদ্‌ব্রহ্মরূপে, আবার অস্তিব্রহ্মরূপে (৩০)। দুইই আনন্দ।

ব্রহ্মকে যে জানে না অথবা জানে, চেতনার সংহরণে বা মৃত্যুতে (৩১) দুজনেই তারা ব্রহ্মেই যায় (৩২), কিন্তু আনন্দের সম্ভোগ হয় বিদ্বানেরই (৩৩)।

এই আনন্দব্রহ্মকে পেলেই সৃষ্টির রহস্যকে বোঝা যায়। সৃষ্টির কামনা তাঁর আনন্দের একটি রূপ। সৃষ্টি বস্তুত তাঁর প্রজনন। তার মূলে আছে তপঃ (৩৪)। সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট (৩৫) হয়ে তিনি হলেন সৎ এবং ত্যৎ অর্থাৎ ব্যক্ত এবং অব্যক্ত। তা-ই সত্য (৩৬)। যিনি অসৎ, তিনিই সদ্‌রূপে নিজেকে ব্যাকৃত করলেন। এই তাঁর সুকৃতি। তিনি তাই 'সুকৃত'।

তিনি রস। রসস্বরূপকে পেলেই আনন্দ। তিনিই আনন্দ, আকাশরূপ আনন্দ, যা নিখিল প্রাণনের মূলাধার। এই অব্যক্ত আকাশে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই আনন্দ। আনন্দ অভয়, আনন্দ পরমসাম্যে। তাহতে এতটুকু বিচ্যুতিতেই ভয়। ভয় অবিদ্যাগ্রস্তের, ভয় দেবতার। দেবতার ভয় প্রশাসনের।

তারপর অষ্টম অনুবাকে আনন্দমীমাংসা। মানুষের সর্বকামতর্পণের আনন্দ হতে অকামহত শ্রোত্রিয়ের ব্রহ্মানন্দ পর্যন্ত আনন্দের স্তরভেদ আছে। মানুষের আনন্দকে ছাপিয়ে মনুষ্যগন্ধর্বের আনন্দ, তাকে ছাপিয়ে দেবগন্ধর্বের। গন্ধর্বের আনন্দ প্রাণের তর্পণে। তাকে ছাপিয়ে মনের তর্পণে পিতৃগণের আনন্দ। তারও পরে বিজ্ঞানের দিব্য

---

৩০. সদ্‌ব্রহ্মের প্রতীক আদিত্য, অসদ্‌ব্রহ্মের প্রতীক আকাশ। এই ধরে সাধনায় ঋষিধারা'আর মুনিধারার প্রবর্তন। সংহিতায় তাঁরা মিত্রাবরুণ। দর্শনে বেদান্ত এবং সাংখ্য-প্রস্থান। উপনিষদের বহু জায়গায় দুয়ের সমন্বয়ের কথাই আছে, বিরোধের নয়।

৩১. সুষুপ্তি যেমন চেতনার সংহরণ, মৃত্যুও তেমনি। সমাধিও তাই। সমাধিযোগে ইচ্ছাসুপ্তি বা ইচ্ছামৃত্যু সম্ভব।

৩২. ব্রহ্ম এখানে নির্বিশেষ চৈতন্য। প্রাকৃতচেতনার কাছে তা তমোময় অব্যক্ত, কিন্তু যোগচেতনায় জ্যোতির্ময় অব্যক্ত।

৩৩. চেতনার সংহরণকে মূলে বলা হয়েছে 'প্রেত্য'। এই শব্দটি উপনিষদে বহুপ্রযুক্ত। অবিদ্বানের বেলায় তার অর্থ মৃত্যু, আর বিদ্বানের বেলায় চেতনার উত্তরণ— তা জীবনেই হ'ক বা মৃত্যুতেই হ'ক। 'প্রেত্য' আনন্দের সম্ভোগ হয়। সে-সম্ভোগ অনির্বচনীয়। তাই মুনিপন্থীরা বললেন, ওর লক্ষণ হচ্ছে দুঃখাভাব, ওটা সংজ্ঞাও নয় অসংজ্ঞাও নয়।

৩৪. এই কাম সম্পর্কে ঋক্‌সংহিতায় বলা হয়েছে, 'কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ' (১০।১২৯।৪)। এইটিই ছান্দোগ্যে আদিত্যের অন্তর্গত 'ক্ষোভ' (৩।৫।৩)। আদিত্যের তাপই 'তপঃ' (radiation)। তা-ই সৃষ্টির মূলে (তু. ঋতং চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসো ঽধ্যজায়ত ১০।১৯০।১)। সৃষ্টি তাহলে পরমপুরুষের আত্মবিকিরণ (তু. ঋ. পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ, ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ ১০।৯০।৪)।

৩৫. সৃষ্টিতে তাঁর যে অনুপ্রবেশ, তা-ই তাঁর 'মায়া' (তু. ঋ. রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব... ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ৬।৪৭।১৮)। এই মায়াতেই তিনি 'একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্' (ঋ. ৮।৫৮।২), তিনি 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' (১০।৯০।১) অর্থাৎ সব শীর্ষই তাঁর শীর্ষ, সব চোখই তাঁর চোখ, সব চরণই তাঁর চরণ।

৩৬. সব নিয়েই এক অখণ্ড সত্য, কিছু বাদসাদ দিয়ে নয় (তু. ছা. ৮।৩।৫, বৃ. ৫।৫।১)।

আনন্দ। তার ছয়টি স্তর, শেষ স্তরে প্রজাপতির আনন্দ। তাকেও ছাপিয়ে আনন্দের আনন্দ বা ব্রহ্মানন্দ।

এই আনন্দে অনুভব হয়, যিনি এই হৃদয়ে আর যিনি ঐ আদিত্যে, দুইই এক। (৩৭) অনুভবিতার চৈতন্য তখন সংক্রামিত হয় অন্নময় হতে শুরু করে আনন্দময় পর্যন্ত আত্মচৈতন্যের সকল ভূমিতে। এমনি করে ব্রহ্মের আনন্দকে জেনে কোথাও আর ভয় থাকে না। 'পুণ্য করলাম না, পাপ করলাম'। এই তাপও থাকে না। (৩৮)

এইখানে ব্রহ্মবল্লীর শেষ। তারপর দশটি অনুবাকে ভৃগুবল্লী।

প্রথম ছয়টি অনুবাকে ভার্গবী বারুণী বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ। বরুণ (৩৯) ভৃগুকে বলছেন, 'অন্ন অর্থাৎ অন্নরসময় শরীর প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র মন এবং বাক্— এইগুলি ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার। (৪০) ব্রহ্মের লক্ষণ, তিনি সর্বভূতের উৎপত্তি স্থিতি এবং লয়ের কারণ। (৪১) ব্রহ্মকে জানা যায় তপের দ্বারা। (৪২) এই বিজ্ঞানের ক্রম আছে। ক্রমটি ব্রহ্মবল্লীতে উল্লিখিত ক্রমের অনুরূপ— অন্ন প্রাণ মন বিজ্ঞান এবং আনন্দরূপে ব্রহ্মকে জানতে হবে।

তারপর তিনটি অনুবাকে অন্নের প্রশস্তি। অন্ন জড়, অন্নাদ বা 'অন্নকে যা আত্মসাৎ করে' তা চৈতন্য। তারা ওতপ্রোত এবং অন্যোন্য প্রতিষ্ঠিত। প্রাণ এবং শরীর, অপ্ তেজ, পৃথিবী এবং আকাশ— এই তিনটি মিথুনের মাঝে এই সম্পর্ক। ভৌতিক শরীরও অন্নাদ বা চেতনাযুক্ত। তপস্যার ফলে প্রাণের উদানগতিতে তা হয় আকাশ-শরীর। এমনি করে অন্নও ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার হয়। অতএব অন্নকে নিন্দা করবে না, তাকে

---

৩৭. তু. ঈ. ১৫-১৬। এই হল সাযুজ্য। সংহিতায়ও তার উদাত্ত প্রকাশ আছে।

৩৮. তু. বৃ. ৪।৪।২২, কৌ. ৩।১। অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্য পাপপুণ্যবোধের ঊর্ধ্বে। সাধনার প্রথম পর্বে এই বোধ থাকে, থাকাও উচিত। তখন অধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে ধর্মের সাধনা করি। তারপর ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেখি, সত্য ধর্মাধর্মের অতীত (তু. ক. ১।২।১৪)। এ যেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে তারপর দুটি কাঁটাই ফেলে দেওয়া। আগেও দেখেছি, আপেক্ষিক সত্য ও অনৃত দুই নিয়েই পরম সত্য। আর্যভাবনায় সদসৎ দুইটি তাঁর বিভূতি। সেমিটিক ভাবনা কিন্তু দুয়ের মাঝে বিরোধটাকে শেষ পর্যন্ত জিইয়ে রাখতে চায়। অখণ্ডাদ্বৈতের দৃষ্টিতে পাপসমস্যার সমাধান একমাত্র ভারতীয় ভাবনারই বৈশিষ্ট্য।

৩৯. ব্রহ্মবিদ্যাকে বলা হচ্ছে বারুণী বিদ্যা। বরুণ ব্রহ্ম। সংহিতায় তাঁর প্রতীক আকাশ, বিশেষ করে অব্যক্ত-জ্যোতির্ময় রাতের আকাশ। এই আকাশ উপনিষদে ব্রহ্মের সাধারণ সংজ্ঞা।

৪০. প্রসিদ্ধ পাঁচটি সাধনের অতিরিক্ত অন্নকেও এখানে ব্রহ্মের সাধন বলা হচ্ছে, যেমন বৃহদারণ্যকে বলা হয়েছে হৃদয়কেও (৪।১।৭)।

৪১. বেদান্তে এইটি ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ (ব্র. সূ. ১।১।২)। পরাক্ দৃষ্টিতে তটস্থ লক্ষণ, প্রত্যক্ (subjective) দৃষ্টিতে স্বরূপলক্ষণ সৎ-চিৎ-আনন্দ। এখানে তটস্থ লক্ষণ ধরে অগ্র্যা বুদ্ধির দ্বারা স্বরূপ-লক্ষণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্কেত।

৪২. 'তপঃ' ব্রহ্মোপলব্ধির মুখ্য সাধন। আরেকটি সাধন হল শ্রদ্ধা (তু.ছা. ৫।১০।১)। পতঞ্জলিও এদের বলেছেন যোগের উপায় (যো. সূ. ১/২০)। তু.ঋ.ত্বং তপঃ পরিতপ্যা[illegible] স্বঃ (তুর্যজ্যোতিঃ) ১০।১৬৭।১; তপসা যে স্বর্যযুঃ ১৫৪।২।

উপেক্ষা করবেনা, তাকে সংবর্ধিত করবে।

তারপর দশম অনুবাকের প্রথমে বলা হচ্ছে, কেউ আশ্রয় চাইলে প্রত্যাখ্যান করবে না। অন্ন সবার সঙ্গে ভাগ করে খাবে। (৪৩) এইটি জেনো, যেমন দেবে, তেমনি পাবে।

তারপর সর্বত্র ব্রহ্মানুভবের উপদেশ। ব্রহ্মকে অনুভব করতে হবে ভিতরে-বাইরে সর্বত্র। নিজের মাঝে তাঁকে অনুভব করা হল 'মানষী সমাজ্ঞা' বা আধ্যাত্মবিজ্ঞান। তিনি তোমার বাক্যে আছেন ক্ষেমরূপে, প্রাণাপান বা উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসে আছেন যোগ-ক্ষেমরূপে, হাতে আছেন কর্মরূপে, চরণে গতিরূপে, পায়ুতে বিমুক্তিরূপে। (৪৪)

তেমনি তাঁকে আবার বাইরে অনুভব করা হল 'দৈবী' সমাজ্ঞা' বা অধিদৈবত বিজ্ঞান। তিনি আছেন বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে, বিদ্যুতে বলরূপে, পশুতে যশ বা ঈশনারূপে, নক্ষত্রে জ্যোতিরূপে, উপস্থে প্রজনন অমৃত এবং আনন্দরূপে। (৪৫) আকাশরূপে তিনি সব হয়ে আছেন। তিনিই প্রতিষ্ঠা, তিনিই মহঃ বা মহিমা, (৪৬) তিনিই মন বা মান, আবার তিনিই প্রণতি।

যাকে বলি অনির্বচনীয় 'তৎ',(৪৭) তিনিই ব্রহ্ম। যিনি ব্রহ্মবান্, ব্রহ্মদ্বেষীরা তাঁর আশেপাশে থাকতে পারে না। তখন এই পুরুষে আর ঐ আদিত্যে অনুভূত হন সেই এক।

এইভাবে ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তাঁর চৈতন্য অন্ন হতে আনন্দ পর্যন্ত সকল ভূমিতে সংক্রামিত হয়। তিনি কামান্নী কামরূপী কামচারী হয়ে আনন্দে গেয়ে বেড়ান, 'আমিই অন্ন, আমিই অন্নাদ, আমি শ্লোককৃৎ। (৪৮) আমি ঋতএবং দেবগণেরও পূর্বজ। (৪৯)

---

৪৩. তু.ঋ. মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎ স তস্য, নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী (১০।১১৭।৬)। এই হতেই পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত নৃযজ্ঞের অনুশাসন।

৪৪. পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের চারটি এখানে আছে। উপস্থকে দৈবী সমাজ্ঞার অন্তর্গত করা হয়েছে তার গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে।

৪৫. সুপ্রজননকে বেদে অতি পবিত্র দৃষ্টিতে দেখা হত। বৃহদারণ্যকে গর্ভাধানের বিস্তৃত বিবরণ আছে (৬।৪।১৩-২২)। গর্ভাধানকে বলা হয় পুত্রমন্থ। আরও দুটি মন্থকর্ম আছে, একটি শ্রীমন্থ (ছা. ৫।২, বৃ. ৬।৩), আরেকটি ঊর্ধ্বমন্থ (তু. বাতরশনাঃ ....শ্রমণা ঊর্ধ্বমন্থিনঃ' তৈ. আ. ২।৭।১; দ্র. মুনিসূক্ত ঋ. ১০।১৩৬)। তিনটি মন্থকর্মের লক্ষ্য যথাক্রমে প্রজা শ্রী এবং আত্মাকে লাভ করা। বৃহদারণ্যকের কয়েকটি গর্ভাধান মন্ত্র ঋক্‌সংহিতা হতে নেওয়া (১০।১৮৪; তু. ১০।১৮৩), কয়েকটি যজুর্মন্ত্র দিব্যভাবে পূর্ণ, দম্পতিকে সেখানে আদিমিথুন দ্যাবাপৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাই মন্ত্রাংশটিতে : জায়েদস্তং মঘবন্ সেদু যোনিঃ' (ঋ. ৩।৫৩।৪; তু. ১০।৮৫।৪৬)।

৪৬. মহঃ বোঝায় বিস্তার জ্যোতিঃ এবং শক্তি এই তিনের সমন্বয়কে। সংহিতায় তা-ই 'মঘ'। সাংখ্যসাধনায় জ্ঞানাত্মার মহাত্মাতে নিয়মনের মূলেও এই ভাব (কঠ. ১।৩।১৩)। তু. চতুর্থী ব্যাহৃতি (তৈ. ১।৫)।

৪৭. 'তৎ' বা 'ত্যৎ' বোঝায় অনিরুক্তকে (তৈ. ২।৬), যার আরেকটি সংজ্ঞা হল 'অতিষ্ঠাঃ' (বৃ. ২।১।২; তু. ঋ. স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ১০।৯০।১)। তাকেই সংহিতায় বলা হয়েছে : তদেকং দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুষাম্ ঋ ৫।৬২।১, কিমপি স্বিদেকম্ ১।১৬৪।৬।

৪৮. শ্লোক ।। শ্রোক = শ্রুতি বা বাকের গুহাহিত পদ (ঋ. ১।১৪৬।৪৫)।

৪৯. দেবগণেরও পূর্বে ছিলেন অদিতি বা অসৎ (ঋ. ১০।৭২।২, ৩, ৫)। দেবগণের প্রতীক হলেন সূর্য (তু. ঋ. ১।১১৫।১), আর তার পিছনে যে আকাশ, তা-ই অদিতি বা অসৎ বা 'অসুর' বরুণ।

আমি অমৃতের নাভি। (৫০) আমাকে যে দেয়, সে-ই আমাকে পায়। আমি অন্নাদেরও অত্তা। (৫১) আমিই বিশ্বভুবনের প্রশাস্তা। আমি জ্যোতি—সূর্যের জ্যোতির মত।'

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ এখানে শেষ হল। এই উপনিষদে আমরা শিক্ষা এবং জীবনাদর্শের একটি সুন্দর ছবি পেলাম। তাছাড়া পেলাম ব্যাহৃতিবিদ্যা এবং পাংক্তবিদ্যাকে অবলম্বন করে ষোড়শকল পুরুষের উদ্দেশ, অন্ন হতে আনন্দ পর্যন্ত ব্রহ্মচৈতন্যের ক্রমবিকাশ এবং আনন্দ-মীমাংসা। অন্নকেও ব্রহ্মবিদ্যার সাধনরূপে গ্রহণ করা এই উপনিষদের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। [সমাপ্ত]

---

৫০. 'নাভি কেন্দ্রবিন্দু, গ্রন্থি। তু. ঋ. ৯।৭৪।৬, সেখানে দ্যুলোকের নীচে চারটি অমৃতভৃৎ নাভির কথা আছে।

৫১. অর্থাৎ চেতনেরও চেতন (ক. ২।২।১৩) বা পরমচৈতন্য। সমস্ত মন্ত্রটি সামসংহিতা থেকে নেওয়া (৬।১।৯)। বেদমীমাংসা প্রথম খণ্ড, ১৯৬১ সংস্করণ, পৃ. ১৬৫-১৭২।

শান্তিপাঠ

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং ৱরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো ৱিষ্ণুরুরুক্রমঃ।।

নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে ৱায়ো। ত্বমেৱ প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেৱ প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম ৱদিষ্যামি। ঋতং ৱদিষ্যামি। সত্যং ৱদিষ্যামি। তন্মামৱতু তদ্বক্তারমৱতু। অৱতু মাম্। অৱতু ৱক্তারম্।।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ওঁ, মিত্র আমাদের কল্যাণ করুন, বরুণ আমাদের শান্তি প্রদান করুন, অর্যমা আমাদের সুখপ্রদান করুন। ইন্দ্র ও বৃহস্পতি আমাদের শান্তি ও আনন্দ বর্ধন করুন, বিশাল পদসঞ্চারী বিশ্বব্যাপী বিষ্ণু আমাদের কল্যাণ করুন। ব্রহ্মকে নমস্কার। হে বায়ু, তোমাকে নমস্কার। তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলব। তোমাকেই ঋত বলব, সত্য বলব। তিনি (বায়ুরূপী প্রত্যক্ষ ব্রহ্মই) আমাকে আগলে রাখুন, আমাকে রক্ষা করুন। তিনি বক্তাকে রক্ষা করুন। আমাকে রক্ষা করুন, বক্তাকে রক্ষা করুন।

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।

প্রত্যেক উপনিষদের আরম্ভে ও শেষে শান্তিপাঠ অবশ্য কর্তব্য। শান্তিপাঠ একটি আবহ তৈরি করে। শান্তিপাঠ বহু প্রকারের হয়। উপনিষদ্‌গুলি (ঈশ বাদ দিয়ে) বেদের আরণ্যকভাগের অন্তে থাকে। সেখানে শান্তিপাঠও সংহিতার অনুরূপ থাকে। এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা উপনিষৎ প্রসঙ্গ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (ঈশোপনিষদের) ভূমিকায় করা হয়েছে।

এই শান্তিপাঠে মিত্র, বরুণ, অর্যমা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং উরুক্রম বিষ্ণুর কাছে কল্যাণ, সুখ, শান্তি ও আনন্দ-কামনায় প্রার্থনা করা হয়েছে। উল্লিখিত দেবতাদের সঙ্গে বায়ুকেও দেবতারূপে, প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করে প্রার্থনা করা হয়েছে। অবশ্য বেদে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতকেও দেবতাস্থান দেওয়া হয়েছে। ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের

প্রথম সূক্তেই অগ্নিদেবতার পরে দ্বিতীয় সূক্তের আরম্ভে বায়ুর স্থান। তারপরে ইন্দ্র ও মিত্র-বরুণাদির স্তুতি। এটা বৈদিক চিন্ময়প্রত্যক্ষবাদ ও ঔপনিষদিক 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—ভাবনার দ্যোতক। বলতে গেলে আকাশে বায়ুই সূর্যরূপ গ্রহণ করেছে। বায়ুই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণ। তাই প্রশ্নোপনিষদে বলা হয়েছে, প্রাণঃ প্রজানাম্ উদয়তি এষঃ সূর্যঃ (প্র. ১।৮)

বস্তুত, বেদে সূর্যই মুখ্য দেবতা। বৈদিকাঃ প্রাণবাদিনঃ, আর্যা জ্যোতিরগ্রাঃ। মিত্র বরুণ ইন্দ্র বিষ্ণু সবাই জ্যোতি ও চৈতন্যেরই বিবিধ নামরূপ। অগ্নি পৃথিবীতে জ্যোতিঃস্বরূপ, তাই বায়ুস্বরূপও। আবার, সব দেবতাই ব্রহ্মজ্যোতির নামরূপ। ব্রহ্ম, দেবতা ও পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেছেন পরবর্তী মুনিপন্থী দুঃখবাদী বিদ্বান্ আচার্যেরা। এই শান্তিপাঠে উল্লিখিত দেবতাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপনিষদের আবহ অনুভব করতে সহায়ক হবে।

সর্বপ্রথম মিত্র ও বরুণ। এঁরা যুগ্ম দেবতা। ঋগ্বেদে প্রথম অনুবাকেই বায়ু ও ইন্দ্রের পরেই মিত্রাবরুণের স্থান। মিত্র দিনের আলো, দিনের সূর্য। বরুণ রাত্রির অন্ধকারের আলো, অদৃশ্য সূর্য। বলা হয়েছে, অহোরাত্রে বৈ মিত্রাবরুণৌ। মিত্র যেহেতু দিনের আলো, তাই তাঁকে স্বীকার করা, তাঁর মহিমা খ্যাপন করা আমাদের পক্ষে সহজ। কিন্তু অন্ধকারের আলোকে জানা, অনুভব করা, আমরা যারা অন্ধকারকে, রাত্রিকে ভয় করি, তাদের পক্ষে অতি কঠিন। বেদের ঋষিরা পর্যন্ত বরুণকে ভয় করেছেন এবং তাই তাঁকে বিশেষভাবে সমীহ করেছেন। রাত্রির মত মেঘলা আকাশও বরুণের স্থান। গভীর সমুদ্র অন্ধকারময়, ভীতিজনক। তাই বরুণ সমুদ্রেরও দেবতা। আকাশ, শূন্যতা সবই বরুণের এলাকা।

তারপর অর্যমা। ইনি আনন্দ, সম্ভোগ ও সখ্যের দেবতা। তাই জীবনে বিবাহাদি আনন্দবর্ধক প্রসঙ্গে তাঁর প্রাধান্য। দ্র. বিবাহসূক্ত ১০।৮৫।২৩ ও পুরোনতুন বেদের কবিতা।

ইন্দ্র ও বৃহস্পতি। ইন্দ্র বেদের প্রধান দেবতা। ঋগ্বেদের সব থেকে বেশি সংখ্যক সূক্ত তাঁরই উদ্দেশে রচিত। বজ্রধর শতক্রতু ইন্দ্রের স্তুতি ঋষিরা সহস্রমুখে সহস্রভাবে করেছেন। মেঘরূপী বৃত্রের বিনাশ করে তিনি সহস্রধারায় বর্ষণ করেছেন। অন্ধকারের আড়াল ভেদ করেছেন। অসুরবধে তাঁর জুড়ি নেই, আর এই আবরণ ও অন্ধকার দূর করার কর্মে, পণিদের লুকোন গোযূথকে মুক্ত করার জন্য তাঁর সাথী হলেন বৃহস্পতি। বলা হয়েছে, ইন্দ্র তাঁর বজ্র আর বৃহস্পতি তাঁর আরাব দিয়ে পণিদের গুহাগ্রন্থিগুলি ভেঙে গোযূথকে মুক্ত করেছেন। এই বৃহস্পতির আরাব থেকেই বেদের ব্রহ্মঘোষ আর পুরাণে ব্রহ্মার চতুর্মুখে বেদ-উচ্চারণ প্রভৃতি ভাব বর্ণিত হয়েছে। বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি,

ব্রহ্মা আর ব্রহ্ম—সবই একই √বৃহ্ থেকে নিষ্পন্ন। সর্বত্র ব্যাপ্ত চৈতন্যই ব্রহ্ম। সংহিতায় কিন্তু ব্রহ্ম শব্দ, শব্দব্রহ্ম অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। বেদের ঋক্‌গুলিকেও ব্রহ্ম বলা হয়েছে। পরে উপনিষদে ব্রহ্ম জ্ঞান আর জ্ঞেয়, ধ্যেয়, প্রাপ্তব্য ইষ্টরূপে গৃহীত হয়েছে।

ইন্দ্র ও বৃহস্পতির পরেই উরুক্রম বিষ্ণুর প্রতি প্রার্থনা। বেদে ইন্দ্রের পরে অগ্নির উদ্দেশে অধিক সূক্ত রচিত হলেও বিষ্ণুই পরম দেবতা। জ্যোতির চৈতন্যের উত্তরায়ণের সপ্তপদীতে বিষ্ণুর স্থান সর্বশেষে সপ্তমপদে। বিষ্ণু মধ্যগগনের পূর্ণপ্রভাস্বর জ্যোতি। তাঁকে পাওয়া, সেই বিষ্ণুর পরমধামে পৌঁছনই বৈদিক সিদ্ধির চরম। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তাঁর স্থান আমাদের মূর্ধন্যচেতনায়, মাথার উপরে সহস্রারে। এই বিষ্ণুই উরুক্রম—বিপুল বিশাল সর্বব্যাপী যাঁর ক্রমণ, বিচরণ। তাঁর ত্রিবিক্রমের কথা সংহিতায় আছে, ত্রীণি পদা রি চক্রমে রিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ (ঋ. ১।২২।১৮। দ্র. ঋ. ১।২২।১৭-২১)। এই ভাবটি পুরাণের বলিবামনের কাহিনীতে প্রপঞ্চিত হয়েছে। বৈদিক ধারাতেই পৌরাণিক যুগে বিষ্ণু পরমদেবতা হয়েছেন। কিন্তু ইন্দ্র পুরাণে তাঁর উচ্চস্থান থেকে নেমে এসেছেন। অবশ্য তাঁর উচ্চতার মান রাখা হয়েছে বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণকে উপেন্দ্র নাম দেওয়াতে।

বৈদিক সাধনার পরম সাধন যে যজ্ঞ, তাকেও বিষ্ণু বলা হয়েছে—যজ্ঞো রৈ রিষ্ণুঃ। সাধন আর সাধ্য একাকার হয়ে গেছে। সাধন, সাধ্য ও সাধক; ধ্যান, ধ্যেয় ও ধ্যাতা; জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—তিনের একাত্মতাই বৈদিক সাধনার, বৈদিক জীবনের উপজীব্য।

চৈতন্যের পরমধামে উপনীত হয়ে ঋষি আবার এই মাটির পৃথিবীতে নেমে আসছেন। Ascent, উত্তরণের পরে descent, অবতরণ।

প্রথম তিন মহাভূতের মধ্যম ভূত বায়ুকেই ব্রহ্ম বলছেন। বায়ু, যাকে চক্ষু দিয়ে দেখা যায় না, তাঁকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলছেন। সংহিতাতে বায়ুকে দর্শত—দর্শনীয় বলা হয়েছে। চিন্ময় প্রত্যক্ষবাদের এটা অপূর্ব দৃষ্টান্ত। তারপরে ঋষি এই ভাবের উপরে বিশেষ জোর দিয়ে বলছেন—আমি যা বলছি বা বলব, তা ঋত এবং সত্য। ঋতং চ সত্যং চ—এটা বেদের এক অপূর্ব মিথুন। পরম সত্যই আমাদের সাধ্য ও সাধন। Truth is God, সত্যই পরমেশ্বর। শুধু বেদে নয়, পুরাণেও সত্যই পরমেশ্বর। ভাগবতেও—যে পুরাণে বিষ্ণুর সর্বঅবতার আর সর্বশেষ অবতার পুরুষোত্তম কৃষ্ণের কীর্তিগাথা রচিত হয়েছে, তার প্রথম প্রার্থনা মন্ত্রে উচ্চারিত হয়েছে—সত্যং পরং ধীমহি। এই সত্য যখন জীবনে আচরিত হবে, তখন তা ঋতময় হওয়া চাই, harmonious, সুসম্বাদী হওয়া চাই। জীবন ঋদ্ধ সিদ্ধ মধুময় প্রেমময় আনন্দময়

ছন্দোময় হওয়া চাই। Truth and harmony are the two legs on which Life Divine stands.

সর্বশেষে সেই সত্যময় ঋতময় ব্রহ্মকেই ঋষি প্রার্থনা করছেন। ব্রহ্ম বৃহৎচেতনা। সে অনাদি অনন্ত অসীম চৈতন্য, যাঁর থেকে সব সৃষ্টি হয়েছে, যাঁতে সব কিছুর স্থিতি ও লয়। আত্মা আর ঈশ্বর তাঁরই বিভাব। ব্যক্তিরূপে সবার দেহে তিনিই আত্মারূপে অধিষ্ঠিত, সৃষ্টির কর্তা, ভর্তা, হর্তা রূপে তিনি ঈশ্বর এবং ব্যক্তি আর সৃষ্টি, আত্মা আর ঈশ্বরেরও অতীত হয়ে যিনি আছেন, তিনিই ব্রহ্ম। আত্মা, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম—Self, God and Brahman—তিনে এক, একে তিন। ব্রহ্মই একমেবাদ্বিতীয়ম্ হয়েও সবার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে রয়েছেন। কেবল বিশ্লেষণ দৃষ্টিতে যখন দেখি, তখন তাদের আলাদাভাবে দেখি। তাই ভারতীয় সাধনায় তিনভাবেই তাঁর সাধনা করা যায়। কিন্তু অন্যান্য ধর্মে তাঁকে কেবল ঈশ্বর, আল্লা, God রূপে ভাবা হয়।

শান্তিমন্ত্রে বলা হয়েছে, এই ব্রহ্মই আমাকে অর্থাৎ শিষ্যকে রক্ষা করুন। তিনি বক্তা অর্থাৎ গুরুকে, যিনি এই উপনিষৎ শোনাচ্ছেন, তাঁকেও রক্ষা করুন। উপনিষদের অন্তে দ্বিরুক্তি, emphasis, জোর দেবার জন্য আর শেষ বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ওম্ এখানে শান্তি হোক, ওখানে শান্তি হোক, সর্বত্র শান্তি হোক। ওম্ পৃথিবীতে শান্তি হোক, অন্তরিক্ষে শান্তি হোক, দ্যুলোকে শান্তি হোক।

শান্তিপাঠ শেষ হল। এবার উপনিষদের আরম্ভ।

প্রথম অধ্যায়

শীক্ষাবল্লী

প্রথম অনুবাক

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং ৱরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো ৱিষ্ণুরুরুক্রমঃ।

নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে ৱায়ো। ত্বমেৱ প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেৱ প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম ৱদিষ্যামি। ঋতং ৱদিষ্যামি। সত্যং ৱদিষ্যামি। তন্মামৱতু তদ্বক্তারমৱতু। অৱতু মাম্। অৱতু ৱক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। ইতি শীক্ষাধ্যায়ে প্রথমোঽনুৱাকঃ ।। ১।১

অনুবাদ ও ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য শান্তিপাঠ।

তৈত্তিরীয়োপনিষদের শীক্ষাবল্লীতে বারোটি অনুবাক আছে। প্রথম ও দ্বাদশ অনুবাকে শান্তিপাঠমন্ত্রের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে পার্থক্য কেবল মন্ত্রের শেষে ক্রিয়াপদের কালের ব্যবহারে। দ্বাদশ অনুবাকে ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের স্থানে অতীত কালের ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অনুবাক

ওঁ শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ৱর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ।। ১।২

ওঁ শিক্ষাবিষয়ে আলোচনা করব। (অকারাদি) বর্ণ, (উদাত্তাদি) স্বর, (হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত) মাত্রা, (শব্দোচ্চারণের প্রযত্ন) বল, (সম, সুষম স্বরে উচ্চারণ) সাম, আর (সংহিতা অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমবদ্ধ = পরপর সাজানো পদ বা বাক্য) সন্তান—(এই বিষয়গুলি প্রধানত) শিক্ষণীয়। এইরূপ শিক্ষণীয় বস্তুবিষয়ক অধ্যায় সমাপ্ত হল।

উপনয়নের পরেই দ্বিজাতি-সন্তানদের গুরুগৃহে বেদাভ্যাস অবশ্যকর্তব্য ছিল।

আরম্ভেই গুরুমুখে বেদপাঠ উচ্চারণ শিক্ষণীয় ছিল। মন্ত্রের যথার্থ উচ্চারণ না হলে বিপরীত ফল হবার সম্ভাবনা। এই নিয়ে ব্রাহ্মণে কিছু কাহিনী আছে। যেমন ইন্দ্রের সম্পর্কে 'ইন্দ্রশত্রুঃ ৱর্ধস্ব'। (দ্র. বে.মী. ৩য় খণ্ড, ৬৭১-৬৭৩)। মন্ত্র যথাযথ উচ্চারিত হলে মন্ত্রের নিজস্ব শক্তিতেই ফল লাভ হবে, একথা মানা হত। বেদমন্ত্রের প্রকৃত উচ্চারণের শক্তি সম্বন্ধে এত শ্রদ্ধা যাজ্ঞিকদের মনে উৎপন্ন হয়েছিল যে তাঁরা মনে করতেন বেদমন্ত্রের অর্থভাবনার কোনও প্রয়োজনই নেই। 'অনর্থকা মন্ত্র ইতি কৌৎসঃ' বলে যাস্ক নিরুক্তে উল্লেখ করেছেন। তাই উচ্চারণ-শিক্ষার এত মাহাত্ম্য। এখানে কয়েকটি শব্দসংকেতে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্দেশিত হয়েছে। পরে প্রত্যেক বেদের নিজস্ব শিক্ষাগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। যেমন ঋক্ ও যজুর্বেদের পাণিনীয় শিক্ষা, সামবেদের নারদশিক্ষা, কৃষ্ণযজুর্বেদের ব্যাসশিক্ষা, শুক্ল যজুর্বেদের যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা, অথর্ববেদের মাণ্ডূক্য শিক্ষা।

শিক্ষায় শব্দবিজ্ঞানের অনুশীলনে আর্যমনীষার একটি উজ্জ্বল পরিচয় মেলে। দ্র. সংক্ষিপ্তসারের টীকা ১ ও ৪। পরের যুগে বর্ণ ও স্বর নিয়ে সাধন ও সিদ্ধির বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাশ্মীরী শৈবাগমের ক্ষেমরাজের শিবসূত্রম্। 'বর্ণোচ্চারণের বিশুদ্ধি থেকে শুরু করে একতান বিশ্বসামে পৌঁছনই বেদবিদ্যার রহস্য বা উপনিষৎ। এই হল মন্ত্রের প্রতিপাদ্য' (তৈ. ১।১)। দ্র. বেদের ভাষা ও ছন্দ, পৃ. ১০, ১.৭১। 'উচ্চারণের শেষ কথা হল সাম এবং সন্তান। সাম—ভারসাম্য, সমতা, সৌষম্য সঙ্গীত সুর। সন্তান—ছড়িয়ে যাওয়া, অনুরণন, ঐকতান'। ঐ, পৃ. ১০, ১.৭.১। 'সমতার প্রধান বাহন হল সুষম ধ্বনিসমবায় অর্থাৎ ছন্দ। এই ছন্দকে শ্রবণসুভগ মসৃণ নিখুঁত করার জন্য বহু ক্ষেত্রে ঋ-ভিন্ন হ্রস্ব স্বরবর্ণকে দীর্ঘ করে দেওয়া হয়েছে—অ-কে আ, ই-কে ঈ, উ-কে ঊ (ঐ পৃ. ৭৭, ৪.১৫)। আরও দ্রষ্টব্য পৃ. ৩৯, ৪র্থ অধ্যায়— ধ্বনি ও ধ্বনি পরিবর্তন।

তৃতীয় অনুবাক

সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মৱর্চসম্। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ৱ্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকমধিজ্যোতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে। অথাধিলোকম্। পৃথিৱী পূর্ৱরূপম্। দ্যৌরুত্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ, ৱায়ুঃ সন্ধানম্ ইত্যধিলোকম্।। ১।৩।১

আমাদের উভয়ের (আচার্য ও অন্তেবাসীর) যশ সমানভাবে বর্ধিত ও বিস্তারিত

হোক। আমাদের উভয়ের ব্রহ্মতেজ সমানভাবে বর্ধিত ও প্রকাশিত হোক। এরপর সংহিতাগুলির উপনিষৎ বা রহস্য ব্যাখ্যা করব। অধিলোক, অধিজ্যোতিষ, অধিবিদ্য, অধিপ্রজ ও অধ্যাত্ম—এই পঞ্চ অধিকরণ অর্থাৎ বিষয় অবলম্বনে আলোচনা করব। এই পঞ্চ বিষয়ের সম্মিলিত সংহিতাগুলির উপনিষৎকে মহাসংহিতা বলা হয়।

এখন লোকবিষয়ে বলা হচ্ছে। পৃথিবী অধিলোক সংহিতার পূর্বরূপ—আগের বর্ণরূপ; দ্যৌ উত্তররূপ অর্থাৎ পরবর্ণস্বরূপ; আকাশ অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোক সন্ধি—উভয়বর্ণের মধ্যস্থান; আর বায়ু সন্ধান অর্থাৎ উভয় লোক বা বর্ণের সংযোগকারী (দেবতা)। এই হল অধিলোক দৃষ্টি বা দর্শন। ১।৩।১

এই অনুবাকের আরম্ভে দুটি মন্ত্রে শান্তিপাঠের মত প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রথম অনুবাকে সমস্ত উপনিষদের শান্তিপাঠকে রাখা হয়েছে।

এই অনুবাকের প্রথম দুটি মন্ত্র দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দবল্লী ও তৃতীয় ভৃগুবল্লীর আরম্ভে উল্লিখিত ও প্রসিদ্ধ আচার্য ও শিষ্য উভয়ের দ্বারা উচ্চারিত আর প্রযোজ্য শান্তিমন্ত্র ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু... ইত্যাদির অনুরূপ। আচার্য ও শিষ্য দুজনেরই যশ ও ব্রহ্মতেজ সমানভাবে বর্ধিত হোক, প্রকাশিত হোক, তার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। অনুবাকের অন্তে মহাসংহিতা-বিজ্ঞানের ফলশ্রুতিতে পাঁচটি পুরুষার্থের উল্লেখ আছে। সেখানেও এই যশঃ ও ব্রহ্মবর্চসের কথা আছে।

বৈদিক ঋষিদের কাছে পুরুষার্থের মধ্যে পশু, প্রজা, ধনসম্পত্তি, নাম-যশ, সুবর্গ্য অর্থাৎ স্বর্গ ও পরমপদ (বিষ্ণুর) সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁদের ধর্মসাধনায় ইহজগতের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স দুটোই সাধ্য। পরবর্তী মুনিপন্থীদের মতো তাঁরা জগৎবিমুখ ছিলেন না।

সংহিতাগুলিকে লোক, জ্যোতি, বিদ্যা, প্রজা ও আত্মা বা ব্যক্তির নিজের অধিকরণ—এইভাবে সাজানো হয়েছে।

প্রত্যেক লোকের অধিষ্ঠাতৃ চৈতন্য তার বিশিষ্ট জ্যোতি। লোক শব্দের মধ্যেই জ্যোতির অর্থ নিহিত আছে। লোক বা রোক √লুক্ ।। √রুচ্, to shine, to be radiant, ঝলমল করা, উজ্জ্বল হওয়া, থেকে নিষ্পন্ন। আলোক শব্দও আমরা প্রকাশ অর্থে ব্যবহার করি। লোক, এক একটি জ্যোতির বিশেষ স্থান। পরে লোক ও ব্যাহৃতি সমার্থক হয়েছে। এখানে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—তিনটি লোকের কথা বলা হয়েছে। এই উপনিষদেই আমরা চতুর্থ ব্যাহৃতি বা লোক মহঃ-এর বিবৃতি পাব। অন্যত্র (মহানারায়ণোপনিষদে) আরও তিনটি লোক বা ব্যাহৃতির যোগ হয়েছে, ঊর্ধ্বে তিনটি ব্যাহৃতি—জনঃ, তপঃ, সত্যম্। এই তিন লোক সৎ চিৎ আনন্দের দ্যোতক। এই তিনটিই পরে সচ্চিদানন্দরূপে সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের অভিধা হয়েছে।

অধীত বিদ্যার সাহায্যে, লোকের জ্যোতিকে আত্মায়—নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এটাই অধিলোক, অধিজ্যোতি, অধিবিদ্য ও অধ্যাত্ম ভাবনার রহস্য। তারপর সেই জ্যোতিকে অবিচ্ছিন্নভাবে শিষ্য বা প্রজাপরম্পরায় সঞ্চারিত করে অনন্ত দেশকালে বিকশিত ও ব্যাপ্ত করতে হবে। এই হল অধিপ্রজ ভাবনার রহস্য।

অধিলোকসংহিতার পূর্বপদ পৃথিবী আর উত্তরপদ দ্যৌ। পৃথিবী থেকে দ্যৌ পর্যন্ত লোকব্যাপ্তি হবে। পৃথিবী আর দ্যৌ-এর মধ্যে সন্ধি হল আকাশ বা অন্তরিক্ষ। অন্তরিক্ষের দেবতা বায়ু। তাই বায়ু হল সন্ধান অর্থাৎ উভয় লোকের সংযোগকারী দেবতা। এইভাবে লোক বিষয়ে ভাবনা ও দর্শন করতে হবে।

বর্ণের সংহিতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লোক, জ্যোতি, বিদ্যা, প্রজা ও অধ্যাত্ম সংহিতাগুলি মিলিয়ে উপাসনা ক্রমশ সূক্ষ্মতর করা হয়েছে।

অথাধিজ্যৌতিষম্। অগ্নিঃ পূর্ব্বরূপম্। আদিত্য উত্তররূপম্। আপঃ সন্ধিঃ। বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্। ইত্যধিজৌতিষম্। ১।৩।২

এরপর জ্যোতিঃ বিষয়ক সংহিতা বা দর্শন বা উপাসনার বিষয় সম্পর্কে বলা হচ্ছে—অগ্নি পূর্ববর্ণস্বরূপ, আদিত্য উত্তরবর্ণস্বরূপ, আপঃ (জল) সন্ধি বা মধ্যস্থান, আর বিদ্যুৎ সন্ধান বা সংযোগকারী দেবতা। এভাবে অধিজ্যোতি-দর্শন বলা হল। ১।৩।২

পৃথিবীর জ্যোতি অগ্নি, দ্যৌ-এর জ্যোতি আদিত্য। তাই এখানে জ্যোতিষ বিষয়ে অগ্নি পূর্ববর্ণরূপ আর আদিত্য উত্তরবর্ণরূপ। জল, দ্যৌ আর পৃথিবীকে অন্তরিক্ষের মত সংযোগ স্থাপন করছে। তাই আপঃ হল সন্ধি। আপঃ-কে অধিজ্যোতিষে রাখা হয়েছে, তার দ্বারা কিন্তু জলের দেবতা চন্দ্রকেই উপমিত করা হয়েছে। মেঘের ঘর্ষণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় আর বৃষ্টিরূপে জলের ধারা পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়। তাই বিদ্যুৎকে সন্ধান বা সংযোগকারী দেবতা বলা হয়েছে।

অথাধিৱিদ্যম্। আচার্যঃ পূর্ব্বরূপম্। অন্তেৱাসী উত্তররূপম্। ৱিদ্যা সন্ধিঃ। প্রৱচনং সন্ধানম্। ইতি অধিৱিদ্যম্। ১।৩।৩

অনন্তর বিদ্যাবিষয়ক দর্শন বলা হচ্ছে। আচার্য পূর্ববর্ণস্বরূপ, অন্তেবাসী বা শিষ্য উত্তরবর্ণস্বরূপ। বিদ্যা সন্ধি বা মধ্যস্থানস্বরূপ। আচার্যের প্রবচন সন্ধান বা সংযোগ-স্বরূপ। এইভাবে অধিবিদ্য দর্শন বলা হল। ১।৩।৩

অথ অধিপ্রজম্। মাতা পূর্বরূপম্। পিতা উত্তররূপম্। প্রজা সন্ধিঃ। প্রজননং সন্ধানম্। ইতি অধিপ্রজম্। ১।৩।৪

অনন্তর প্রজা বা সন্তান বিষয়ক দর্শন বলা হচ্ছে। মাতা পূর্ববর্ণস্বরূপ, পিতা উত্তরবর্ণস্বরূপ। সন্তান সন্ধি বা মধ্যস্থান স্বরূপ। প্রজনন—সন্তান-উৎপত্তি সন্ধান বা উভয়ের সম্বন্ধস্থাপনকারী। এইভাবে অধিপ্রজ বিষয়ে বলা হল। ১।৩।৪

অথ অধ্যাত্মম্। অধরা হনুঃ পূর্বরূপম্। উত্তরা হনুঃ উত্তররূপম্। বাক্ সন্ধিঃ। জিহ্বা সন্ধানম্। ইতি অধ্যাত্মম্। ১।৩।৫

এরপরে অধ্যাত্ম অর্থাৎ আত্মা বা দেহবিষয়ে দর্শন বলা হচ্ছে। নিম্ন হনু বা চোয়াল পূর্ববর্ণস্বরূপ, উত্তর হনু উত্তরবর্ণস্বরূপ। বাক্ সন্ধি আর জিহ্বা সন্ধানস্বরূপ। এভাবে অধ্যাত্ম—(বর্ণোচ্চারণের জন্য দেহগত) বিষয়ে দর্শন বলা হল। ১।৩।৫

এখানে বাক্-উচ্চারণক্ষম তালুকেই বাক্ বলা হয়েছে। আর জিহ্বাই সবার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে উচ্চারণ-কার্য সম্পন্ন করে বলে তাকেই সন্ধান বা সংযোগকারী বলা হয়েছে। উচ্চারণক্রিয়াই বেদ-অধ্যয়নের মুখ্য মাধ্যম ছিল বলে এখানে কেবল মুখকেই ধরা হয়েছে।

ইতীমা মহাসংহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যবতা বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভিঃ। ব্রহ্ম বর্চসেন-অন্নাদ্যেন সুবর্গ্যেণ লোকেন।। ১।৩।৬

উপরিউক্ত পঞ্চধা-বিভক্ত মহাসংহিতা বলা হল। যিনি এই সকল যথাব্যাখ্যাত মহাসংহিতাগুলি জানেন ও উপাসনা করেন, তিনি সন্তান, পশু, ব্রহ্মতেজ, ভক্ষণীয় অন্ন এবং সুবর্গ্য বা স্বর্গলোক লাভ করেন। ১।৩।৬

উপাসনার ফলশ্রুতি বলা হল। অন্ন, পশু আর সন্তান, দেহ ও প্রাণের পুষ্টি ও বৃদ্ধির কারণ—এগুলি সবাই চায়। কিন্তু যাঁরা বেদবিদ্যা লাভ করেন তাঁরা অধিকন্তু লাভ করেন ব্রহ্মবর্চস্ আর স্বর্গ বা পরমপদ। নিঃশ্রেয়সের পথে তাঁরা এগিয়ে যান।

এই উপনিষদ বিশেষ করে জীবনের সমস্ত দিককে সাধনা ও সিদ্ধির অঙ্গ রূপে স্বীকার করেছেন। জীবনের কোনও অংশ বা বিষয়কে উপেক্ষার যোগ্য বা হেয় মনে করেন নি। কিন্তু মুনিপন্থী ভাষ্যকাররা এখানেও ফলকামী উপাসক বা ফলকামনাহীন উপাসকের ভেদ করেছেন। বলেছেন, যাঁরা সকাম উপাসক, তাঁরা উপাসনার পরিণামে

উপরিউক্ত ফল লাভ করেন আর যাঁরা নিষ্কাম সাধনা করেন, তাঁদের চিত্তশুদ্ধি হয় এবং ক্রমে ব্রহ্মবিদ্যালাভের সামর্থ্য অর্জন করেন।

এই মহাসংহিতাগুলির বিজ্ঞান ও সাধনাই মানুষের সমস্ত পুরুষার্থের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের সাধক।

চতুর্থ অনুবাক

যঃ ছন্দসাম্ ঋষভঃ ৱিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যঃ অধি অমৃতাৎ সম্ বভূৱ। স মা ইন্দ্রঃ মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেৱ ধারণঃ ভূয়াসম্। শরীরং মে ৱিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি ৱিশ্রুৱম্। ব্রহ্মণঃ কোশঃ অসি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায়।। ১।৪।১

ছন্দসের মধ্যে—সমস্ত বেদের মধ্যে যিনি গোযূথের মধ্যে বৃষভের মত শ্রেষ্ঠ, যিনি বেদে এবং লোকে সর্বব্যাপী, অমৃতা বেদময়ী বাকের সাররূপে যাঁর সম্যক্ উদ্ভব হয়েছে, সেই ওঁঙ্কারস্বরূপ ইন্দ্র বা পুরুষোত্তম পরমেশ্বর আমাকে মেধা—প্রজ্ঞার দ্বারা আপূরিত করুন। আমার প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করুন। হে পরমেশ্বর, আমি যেন অমৃতের, বেদজ্ঞানের যোগ্য আধার হতে পারি, অমৃতকে ধারণ করতে পারি। আমার দেহ সমর্থ হোক। আমার জিহ্বা মধুময় হোক। আমার কর্ণ যেন বহু-শ্রবণ করে। হে দেব, তুমিই মেধা দ্বারা আবৃত ব্রহ্মের কোশ বা আধারস্বরূপ। আমার শ্রুত জ্ঞানকে রক্ষা করো। ১।৪।১

চতুর্থ অনুবাককে আচার্যের প্রস্তুতির পর্ব বলা যেতে পারে। আচার্য বেদের পরম দেবতা ইন্দ্রকে, ওঁকারকে প্রার্থনা জানাচ্ছেন। তাঁর শরীর প্রাণ, মন যেন বেদবিদ্যাকে ধারণ ও বিতরণ করার জন্য উপযুক্ত হয়। অনুবাকের এই প্রথম ভাগ আরেকটি শান্তিপাঠ মনে করিয়ে দেয়—ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রম্ অথো বলম্ ইন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি (কেন. উপ.)।

ছন্দঃসমূহের মধ্যে বৃষভ হলেন ওঁকার, যাঁকে ছান্দোগ্যে উদ্গীথ বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে সমস্ত চরাচর ভূতের রস পৃথিবী, পৃথিবীর রস জলরাশি, জলরাশির রস ওষধিসমূহ, ওষধিসমূহের রস মানবদেহ, মানবদেহের রস বাক্। ঋক্সমূহ বাকের রস, সাম ঋকের রস, আর উদ্গীথ বা ওঁকার সামের রস। এই ওঁকারই পরম বা শ্রেষ্ঠ।

বৈদিক দেবতাদের মধ্যে পরম দেবতা ইন্দ্র। গোযূথের মধ্যে যেমন বৃষভ, তেমনি

দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র। তাই ওঁকার আর ইন্দ্র সমার্থক। বেদময়ী বাক্ অমৃতসমা। ওঁকারের উদ্ভবও এই অমৃত থেকে। ত্রয়ী বিদ্যাকে অভিতপ্ত করে প্রজাপতি ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ—এই তিন ব্যাহৃতি বা লোকের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়েছিলেন। এই ব্যাহৃতি সকলকে অভিতপ্ত করে ওঁকারের উদ্ভব হল। দ্র. ছান্দোগ্য ২।২৩।২-৩। স্মরণীয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি—বেদের সার ভূর্ ভুবঃ স্বঃ এই তিনটি ব্যাহৃতি, তিন ব্যহৃতির সার ওঁকার, আর ওঁকারের সার তার টঙ্কার বা অর্ধমাত্রা ম্ এর অনুরণন, যেটা আকাশে মিলিয়ে যায়, যেখান থেকেই সব কিছুর উদ্ভব।

এইভাবে দেবতার ধ্যান বা ওঁকারের জপ বা অনুরণন আকাশবৎ চিত্তের মাঝে আবার স্পন্দ জাগায়। সেটি স্ফুরিত হয় বাক্‌রূপে। বাক্‌কে অভিব্যক্ত করার সময় আমার চেতনায় আকাশ যেন জাগ্রত থাকে। তাকে গ্রহণ করবো, শুনবো, কান দিয়ে। কর্ণ দ্বারা যেন দিব্যশ্রুতি শুনতে পাই এবং তাকেই অভিব্যক্ত করতে পারি।

এই শ্রুতি অর্থাৎ বেদবাণী দেবতা বলছেন আর আমি শুনছি। শুনে অন্তেবাসীকে শোনাচ্ছি। এটা যেন সর্বদাই সম্ভব হয়। কোনওদিন যেন সেটি নষ্ট না হয়। তাঁকে, হে দেব, রক্ষা করো।

হে ইন্দ্র, তুমি আকাশবৎ। তুমিই ব্রহ্মের কোশ—ব্রহ্মণঃ কোশঃ অসি। কোশ অর্থাৎ আধার, যার মধ্যে সব কিছু রাখা যায়। কোশ ব্রহ্মের মধ্যেই আছে, ইন্দ্র তাকে ধরে রেখেছেন। এই কোশ মেধার দ্বারা আবৃত— মেধয়া-অপিহিতঃ। এক অর্থে সেটি আবরণ। কারণ আধাররূপে তারি ভিতরে সত্য নিহিত আছে। সমুদ্রে ডোবানো কুম্ভের মতো। ঈশতে যেমন আছে হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্, (ঈশ. ১৫)। এখানে হিরণ্ময় পাত্রই আধার। সেই আধারের দ্বারা সত্য আবৃত আছে। রহস্যময় এক প্রকাশের আবরণ! তাই অন্যত্র ব্রহ্মকে বলা হয়েছে—সত্যস্য সত্যম্। যে-সত্য সত্য দিয়ে আবৃত আছে। একদিকে সেটি আচ্ছাদন করছে, অন্যদিকে আবাহনও করছে, দ্বারের মতো—আড়, বাধা এবং প্রবেশপথ দুই অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন বেদে বলা হয়েছে তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্, সূর্য বা সূর্যদ্বার ভেদ করেই তাঁর পরমধামে পৌঁছনো যায়। হে ইন্দ্র, তুমি ব্রহ্মের কোশ আকাশরূপে, তুমি মেধার দ্বারা অপিহিত। যেমন তোমার মেধার দ্বারা, তেমনি আমার মেধার দ্বারাও। তোমার মেধা হিরণ্ময় পাত্র, অমৃতে পূর্ণ। আমার মেধা হল অনুপ্রবেশের শক্তি। আগে বলা হয়েছিল, তোমার মেধার দ্বারা, তোমার আবেশ দ্বারা আমাকে পূর্ণ কর। তুমি তো পূর্ণ হয়েই আছ, আর আমার মধ্যে তুমি রেখেছ তোমাতে অনুপ্রবেশ করার শক্তি।

শরীরং মে বিচর্ষণম্। ঋ.খিল ১০।১৫১-র ৩১।৫-এ আছে শরীরং মে বিচক্ষণম্। √চর্ বিচরণ > বিচর্ষণ। √চর্য্ চাষ থেকেও বিচর্ষণ। আমার শরীর যেন সবল, strong

and supple, শক্তিমান্ কর্মক্ষম সমর্থ নমনীয় ও ঋজু হয়। জিহ্বা মে মধুমত্তমা—আমার জিহ্বা অর্থাৎ বাক্ যেন মধুর, অমৃতভাষিণী হয়। আমি যেন অপ্রিয় কথা না বলি। অন্যত্র আছে, সত্যং বদ প্রিয়ং বদ।

শ্রুতং মে গোপায়—তোমার কাছে আমি যা শুনছি, আর আমার দ্বারা যা কিছু উচ্চারিত হচ্ছে, সে সবই তুমি রক্ষা কর। সেটি যেন নিরন্তর থাকে, কখনও নষ্ট না হয়।

এটি আচার্যের প্রার্থনা, মেধা ও প্রজ্ঞার জন্য। এটি আচার্যের জপ ও ভাবনা মাত্র। এর মধ্যে কোনও ক্রিয়া নেই। এর পরের প্রার্থনা ক্রিয়া সহকারে অভ্যুদয়ের জন্য শ্রী-এর জন্য।

> **আৱহন্তী ৱিতন্ৱানা। কুর্ৱাণা অচীরম্ আত্মনঃ। বাসাংসি মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্ৱদা। ততঃ মে শ্রিয়ম্ আৱহ। লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা। আ মা য়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। ৱি মা আয়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্র মা আয়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।। ১।৪।২**

হে পরমেশ্বর, লোমশ পশু সহ সেই শ্রীকে আমার কাছে নিয়ে এস, যিনি সর্বদা আমাদের জন্য বস্ত্র, গোধন, বাসগৃহ, অন্নপানাদি প্রয়োজনীয় বস্তু আহরণ করবেন, বর্ধিত করবেন। আর এই সব বস্তুর দীর্ঘকালের জন্য সুব্যবস্থা করবেন, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ (বিদ্যাগ্রহণের জন্য) আমার কাছে সব দিক হতে আসুক, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ বিবিধরূপে আমার নিকট আগমন করুক, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ প্রকৃষ্টরূপে আমার নিকট আগমন করুক, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ দমযুক্ত হোক, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ শমযুক্ত হোক, স্বাহা। ১।৪।২

আগের প্রার্থনা নিঃশ্রেয়সের জন্য ছিল, এখন আচার্য অভ্যুদয়ের জন্য প্রার্থনা করছেন। অন্তেবাসী বা বিদ্যার্থীদের আশ্রয় ও অন্ন-বস্ত্রাদির ব্যবস্থা আচার্যই করতেন। গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করার সময়েই শিষ্যের দেহ প্রাণ ও মন—সবকিছুই যাতে পূর্ণরূপে বিকশিত হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় কোনও বস্তুরই অভাব যাতে না হয়, তার খেয়াল রাখা হোত। সেজন্যই শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর আবাহন করা হোত। উপনিষদে অন্যত্রও আছে, প্রজ্ঞা এবং শ্রী দুইই লাভ হোক। গুরু এই শ্রী লাভ করতেন যজন-যাজন করে। রাজা ও শ্রেষ্ঠীদের কাছ থেকে আশ্রম বা গুরুকুলের জন্য বিশেষ দান পেতেন। ঋগ্বেদে অনেক দানস্তুতি আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা তাকে কটাক্ষ করে বলেন এটা ঋষিদের লোভের পরিচয়। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। আচার্যদের পক্ষে বিদ্যাদান অবশ্যকর্তব্য বলে

গণ্য করা হোত। বিদ্যাদানের সময় বিদ্যার্থীদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তাঁরাই নিতেন। আচার্যরা নিঃস্ব হলেও দান গ্রহণ করে যা কিছু পেতেন, সবই আশ্রমের জন্য ব্যবহার করতেন। এ দানই সবচেয়ে সুপাত্রে দান। যোগ্যস্থানে-কালে-পাত্রে দানের মহিমা সর্বত্র কীর্তিত হয়েছে। আচার্য সেই দানকে সার্থক করছেন। দানের গ্রহীতা ব্রাহ্মণই হতে পারেন। বৃহ বা বৃংহ্ ধাতুর অর্থ বড় হওয়া, ব্যাপ্তি, expansion। তার থেকে ব্রহ্মন্। অর্থাৎ বিরাট্। ঐ বিরাটের একতান যিনি জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মন্ + অণ্।

শ্রী-এর আবাহন করার সময় ঋষি তিনটি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন (শ্রী আবহন্তী)। যা কিছু প্রয়োজনীয়—অন্ন-পান-বাস-পশু সব তিনি এনে দেবেন। ঋষিদের যে-পশুর বিশেষ প্রয়োজন সেটি গোধন। বেদে দুই পশুর বিশেষ উল্লেখ আছে—গো আর অশ্ব। গুরুকুলে অশ্বের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। গো কিন্তু অতি প্রয়োজনীয়—যজ্ঞ-হবি ও গোদুগ্ধের জন্য। লোমশ পশুর কথাও বলা হয়েছে পশমের জন্য। (ইয়াকের উল্লেখ?) এখানে সব কিছু (material needs) জাগতিক প্রয়োজনের জন্য বলা হয়েছে। প্রচুর গোধন যেন থাকে যাতে সুষ্ঠুভাবে যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করা যায় আর সকলের জন্য দুধের অভাব না হয়। পাঞ্জাবের স্বামী রামতীর্থ যখন লাহোরে অধ্যাপক ছিলেন শিষ্যরা তাঁর বাড়িতে পড়তে এলে নিজের খরচে দুধ পান করাতেন। এইভাবে তিনি বৈদিক ভাবনার অনুসরণ করতেন।

শ্রী শুধু এসব আনবেন তা নয়, এসব যেন সর্বদাই দেন। শ্রী হবেন বিতন্বানা। supply, যোগান পরিপূর্ণ থাকবে। সেটি যেন কখনো বন্ধ না হয়—বিতত থাকে। চীরম্ = চিরং কুর্বাণা—চিরস্থায়ী হয়। (কুর্বাণা অচীরম্ = কুর্বাণা অচিরম = চিরম্ অকুর্বাণা) শ্রী যাতে এইসব ধন-সামগ্রী প্রচুর আনেন, সর্বদাই আনেন, কোনওদিন যেন তার অভাব না হয়—এজন্য আচার্য প্রার্থনা করছেন।

পূর্বমন্ত্রে যে দেবতার কাছে মেধার জন্য, প্রজ্ঞার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে—সেই দেবতাই, 'ছন্দসাম্ ঋষভঃ' ইন্দ্রই শ্রীকে আনবেন। শ্রী-এর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করার সময় স্বাহা বলে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হত। আচার্যের বিদ্যাদানের জন্য প্রস্তুতি ও বিদ্যার্থীদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা দুটোই সম্পন্ন হবার পর বিদ্যার্থীদের তাঁর কাছে আসার জন্য আচার্য আবাহন করছেন—A great call– এ যুগে তার তুলনা করা যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে। তিনি যেমন পূর্ণ সিদ্ধি লাভের পর 'তোরা কে কোথায় আছিস, তোরা আয়'—বলে আকুল আহ্বান করতেন। তাঁর মধ্যে বেদের এই ভাব বাস্তবরূপ ধারণ করেছে।

আচার্য আহ্বান করছেন— *আ মা য়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা*। চারিদিক থেকে যেন বিদ্যার্থীরা আমার কাছে আসে। আচার্য যেন বলছেন, দেবার জন্য আমি প্রস্তুত, তোমরা

সবাই সব দিক থেকে আমার কাছে চলে এসো। *বি মা য়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা*—কোনও কোনও ভাষ্যকার অর্থ করেছেন, দূরদেশ থেকে আসুক। কিন্তু প্রকৃত অর্থ হবে, আসা এবং যাওয়া। বিদ্যার্থীরা যেমন আসবে, তেমনি তৈরি হয়ে চলে যাবে—সমাবর্তনও করবে, এ ভাবনাও আছে অর্থাৎ শিষ্যের যাতায়াত যেন অব্যাহত থাকে। শীক্ষাবল্লীর শেষে সমাবর্তনের উপদেশ আছে। *প্র মা য়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা*। প্র—প্রগতি অর্থে, প্রকৃতজ্ঞান লাভের জন্য তারা আসুক। বিদ্যাসাধনায় যেন সর্বদা তাদের প্রেতি সম্ভব হয়। *দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমাযন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা*—ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করেছেন, শিষ্যরা দম-সম্পন্ন হোক, শমসম্পন্ন হোক। বৃহ. উপনিষদে বিদ্যার্থীর গুণবর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—শান্ত, দান্ত, উপরত ইত্যাদি। পরে পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে যম-নিয়মাদিকে অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম দম, আর অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম শম।

এই দুই শব্দের অন্য এক সহজ অর্থও হতে পারে। এই অর্থ করতে গিয়ে স্বরচিহ্নের কোনও দোষ হবে না। ঋগ্বেদে এই দুটি শব্দ আছে। দম শব্দের অর্থ গৃহ > দম্পতী। ৱর্ধমানং স্বে দমে (ঋ. ১।১।৮)। দম আয়ন্তু—এর দ্বিতীয় অর্থ হবে বিদ্যার্থীরা যেন নিজের গৃহে আসছে, এই ভাব নিয়ে আচার্যের কাছে আসে। গুরুগৃহের অগ্নিশালাকেও দম বলা হত। বিদ্যার্থীর মধ্যে অগ্নির আবির্ভাব হোক, এটা দম-এর রহস্যার্থ। এইভাবে শমও একটা বীজমন্ত্র, যার অর্থ প্রশান্তি, সমস্ত প্রপঞ্চের উপশম। বিদ্যার্থী যেন প্রশান্তি লাভ করে, কৃতার্থ হয়। আচার্য বিদ্যার্থী সম্পর্কে এই রকম ভাবনা করছেন।

ব্রহ্মচারীর তিনটি লক্ষ্য—আত্মিক বা আধ্যাত্মিক, জাগতিক—জগতে তার প্রতিষ্ঠা, এবং পরম বস্তুর লাভ। তিনটিই যেন সিদ্ধ হয়। এরকম অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের জন্য প্রার্থনা করে আচার্য আহুতি দিচ্ছেন।

যশঃ জনে অসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ ৱস্যসঃ অসানি স্বাহা। ত্বং ত্বা ভগ প্রৱিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রৱিশ স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে। নি ভগ অহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা। যথা আপঃ প্রৱতা যন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ। ধাতঃ আয়ন্তু সর্ৱতঃ স্বাহা। প্রতিৱেশঃ অসি প্র মা ভাহি প্র মা পদ্যস্ব।। ১।৪।৩

সকল জনের মধ্যে আমি যেন যশস্বী হই, সমর্থ হই, স্বাহা। ধনীদের মধ্যে—জ্যোতিষ্মানদের মধ্যে যেন শ্রেষ্ঠ হই, স্বাহা। সেইরূপ তুমি হে ভগ, আমাতে প্রবেশ কর, স্বাহা। সেইরূপ সহস্রশাখ বনস্পতিরূপে তোমাতেই হে ভগ, আমিও

প্রবেশ করি। তোমার মধ্যে নিজেকে আহুতি দিয়ে আমি যেন পরিশুদ্ধ হই, স্বাহা। যেমন জলের ধারা নীচের দিকে প্রবাহিত হয়, মাসগুলি যেমন সম্বৎসরে আবর্তিত হয়, তেমনি হে ধাতা, ব্রহ্মচারিগণও সব দিক থেকে আমার কাছে চলে আসুক। তুমি সবার প্রতিবেশ, নিকটতম আশ্রয়স্বরূপ। আমার নিকট সর্বতোভাবে প্রতিভাত হও। আমাতে আবিষ্ট হও (আমি তোমাতে প্রপন্ন হচ্ছি) তুমিও আমাতে প্রপন্ন হও, আমাকে তোমার সঙ্গে এক করে নাও। ১।৪।৩

অগ্নিতে আহুতি দিয়ে, স্বাহা বলে আচার্য যশ আর বসু উভয়ার্থে প্রার্থনা করছেন। যশোজনেঽসানি স্বাহা। যশ দ্ব্যর্থক শব্দ, কীর্তি ও সামর্থ্য দুটিই বোঝায়। সকল জনের মধ্যে আমি যেন যশস্বী হই। আবার সকল আচার্যের মধ্যে আমি যেন ব্রহ্মচারীদের বিদ্যাদানে সমর্থতম হই। আমার বিদ্যাদান যেন অব্যাহত থাকে। কীর্তি ও সামর্থ্য, বিশেষ করে অভ্যুদয় ও প্রাণশক্তির উৎকর্ষের দৃষ্টিতে বলা হয়েছে।

শ্রেয়ান্—বস্যসঃ অসানি স্বাহা। এই প্রার্থনা প্রজ্ঞাশক্তির দৃষ্টিতে করা হয়েছে। বস্যস্—ঈয়সুন্ প্রত্যয়ান্ত বসু শব্দের বৈদিক রূপ। বসু-র একটি অর্থ ধন, ভাষ্যকার সেই অর্থই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বসু-র অন্য অর্থ জ্যোতি। বসীয়ান্ বসিষ্ঠ—ইত্যাদি শব্দে এই অর্থ আছে, যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি ব্রহ্মজ্যোতির আবির্ভাব হয়েছে। বসিষ্ঠদের মধ্যেও আমি যেন শ্রেষ্ঠ হই।

আমার মধ্যে প্রাণ ও প্রজ্ঞা দুইই পরিপূর্ণভাবে আবির্ভূত হোক।

আগের অনুবাকে মেধা ও শ্রী-এর জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল। এখানে নাম, যশ, সামর্থ্য ও বসু বা জ্যোতির জন্য প্রার্থনা করা হল।

এর পরের আহুতি ভগ দেবতার উদ্দেশে। এটা দেবোপাসনা। ত্বং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে। নি ভগ অহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা।

আচার্য বলছেন, হে ভগ, তুমি আমাতে প্রবেশ কর, আমি যেন তোমাতে প্রবেশ করি। তুমি সহস্রশাখ, তোমার মধ্যে নিজেকে আহুতি দিয়ে আমি যেন পরিশুদ্ধ হই—এই বলে আহুতি দিচ্ছেন।

এই ভগ দেবতা আদিত্যেরই এক নাম। সপ্ত আদিত্যের মধ্যে ভগ-এর স্থান আদিত্যের উদয় থেকে বুঝতে পারি। মধ্যরাত্রি থেকে মধ্যদিন পর্যন্ত সাতটি পর্বে সূর্যের উদয়ন ধরা যায়। প্রথম তিনটি পর্ব নেপথ্যে চলছে। তাদের দেবতা অশ্বিদ্বয়, উষা ও সবিতা। সবিতার পর্বে আকাশে সূর্যরশ্মি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সূর্য তখনো নেপথ্যে। প্রথম দৃষ্টিগোচর সূর্য হলেন ভগ। তারপরের তিনটি পর্বেও সূর্যের প্রকাশরূপ—সূর্য পূষা ও বিষ্ণু। ভগ অন্ধকারে প্রকাশের অভিযানের আরম্ভ ও সর্বোচ্চ

প্রকাশের মাঝখানে সেতুস্বরূপ। শব্দের মূল ধাতু ভজ্ বা ভঞ্জ্, ভাঙা, বিভাগ বা বিভক্ত করা > ভজন, ভক্তি শব্দ এসেছে। যা ভেঙে অন্তরে প্রবেশ করে, সেই হল ভগ[১]। ভগ-এর মূল শক্তি হল আবেশের শক্তি। সূর্যোদয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে অর্থটা স্পষ্ট হবে। সবিতা যখন নেপথ্যে, তখন আকাশ সূর্যরশ্মি দ্বারা আবিষ্ট হয়। কিন্তু পৃথিবীতে অন্ধকার থাকে। এই অন্ধকার দূর করেন ভগ। আমাদের অন্ধকারে আবিষ্ট চেতনাতে ভগ যখন প্রবেশ করেন, তখনি আমরা ভক্ত হই। ভগ শব্দের সঙ্গে বিশ্ ধাতুর প্রয়োগ লক্ষণীয়। তার অর্থও প্রবেশ করা। প্রথম আবেশের দেবতা হলেন ভগ। ভগ খুব প্রাচীন দেবতা। ইন্দো-ইউরোপীয়ানদের এক খুব প্রাচীন শাখা স্লাভদের ঈশ্বরের একটি নাম হল বব্, ইনি এই ভগ। পার্শীদের দেবতাদের মধ্যেও ভগ-এর উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে ভগ-এর উদ্দেশে কোনও আলাদা সূক্ত নেই কিন্তু তাঁর উল্লেখ নানা জায়গায় আছে। সবিতা ও ভগ-এর উল্লেখ একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। যিনি আমাদের প্রচোদিত করেন, তিনি সবিতা। আর যিনি আমাদের মধ্যে আবিষ্ট হন, তিনি ভগ।

আদিত্য-ভাবনাকে হঠযোগের দৃষ্টিতে স্থাপন করলে ভগ-এর স্থান হৃদয়ে—অনাহত চক্রে। পৌরাণিক দৃষ্টিতে ভগ বৈষ্ণবদের বালগোপাল। তিনি যখন কিশোর, তখন সূর্য। যখন তরুণ, তখন পূষা। আর যখন যুবা—অকুমার, তখন বিষ্ণু। এই ভগ-ই হলেন ভাগবত ধর্মের আদি দেবতা। বৈদিক ধর্মে তাঁর স্থান লুপ্তপ্রায়। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে সর্বত্র তাঁর স্থান মুখ্য হয়ে আছে। এই ভগ থেকেই ভগবান। ভগ-এর উপাসনা করেন যিনি, তিনি ভাগবত। খ্রিস্টধর্মের অনেক আগে থেকেই এই ভাগবত ধর্ম ভারতের জনসাধারণের সঙ্গে প্রচলিত ছিল। গোপা অদাভ্যঃ—যে ভগ প্রথম আবির্ভূত হন, dazzling orb—সূর্যগোলকরূপে, ঝকমকে চক্ররূপে। যাকে দমন করা যায় না।

এই ভগ-এর বিশেষ সম্পর্ক আছে গোপদের সঙ্গে। যারা গোপালন করে তারা বৈশ্য। তাদের দেবতাই হলেন ভগ। ভগ সম্পর্কে বলা হয়েছে—গোপালা অদৃশন্...। গোপালকরা আশ্চর্য হয়ে দেখছেন। ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণদের দেবোপাসনা আত্মবীর্যের দ্বারা। তাই তাদের দেবতা ঊর্ধ্বে দ্যুলোক পূষা বিষ্ণু মিত্র বরুণ ইত্যাদি। কিন্তু ভগ আমাদের নিকটতম দেবতা। যিনি ভগবান তিনি আমাদের নিকটে আছেন, আমাদের মাঝে এসে থাকেন। এর থেকেই অবতারবাদের ভাবনা এসেছে। ভাগবতধর্মের অতি উত্তম প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব, বসুদেবের পুত্র। ভাগবতদের মহামন্ত্র— ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়, দ্র. ধ্রুবোপাখ্যান[১]। গীতাতে

১। ভগ এব ভগবাঁ অস্তু দেবঃ/তেন বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম (ঋ ৭।৪১।৫)। দ্র. ঋ. ৭।৪১।২—৬
ভগভক্তস্য তে বয়ম্ উদশেম তবাবসা। মূর্ধাণং রায় আরভে।। ঋ. ১।২৪।৫

আছে—বাসুদেবঃ সর্বমিতি—৭।১৯। তাঁকে ভক্তি করার অধিকার স্ত্রী-বৈশ্য-শূদ্র সবার।

এই ভগকে প্রথম আবাহন করার উদ্দেশ্য হল, আচার্য যেন শিষ্যদের ভগরূপেই দেখছেন। ব্রহ্মচারী যেন বালসূর্য। বালসূর্যরূপে তোমরা আমাতে প্রবেশ কর। আচার্য নিজেও বালসূর্য হয়ে বালসূর্যদের আহ্বান করছেন।

তস্মিন্ সহস্রশাখে—ঋগ্বেদে সহস্রবল্‌শঃ শব্দটি বনস্পতি সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়েছে। বল্‌শঃ=শাখা। ত ইন্নিণ্যং হৃদয়স্য প্রকেতৈঃ। সহস্রবল্‌শমভি সংচরন্তি (৭।৩৩।৯)— সেই বসিষ্ঠগণ হৃদয়ের গভীর জ্ঞান দ্বারা সহস্রশাখ সংসারে বিচরণ করেন।

সহস্রশাখ শব্দ বনস্পতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বনস্পতির দুটি রূপ—এক, নীচে থেকে সোজা উপরে উঠছে। দুই, উপর থেকে নীচে নেমে আসছে, ঊর্ধ্বমূলো২বাক্‌শাখঃ অশ্বত্থের মতো, গীতা—১৫।১। একটা অগ্নির প্রতীক, অন্যটি সোমের। অগ্নি ঊর্ধ্বমুখী। তখন বনস্পতির শাখার বিস্তার উপরদিকে। যখন উপর থেকে নীচে নেমে আসছে, তখন তারা যেন দেবতার প্রসাদরূপে সোম হয়ে নেমে আসছে। তখন ধারা উল্টে যাচ্ছে। যোগীরা তার বর্ণনা দিয়েছেন—উল্টো বৃক্ষরূপে। মস্তিষ্ক যেন মূল। সুষুম্নাকাণ্ড হল মেরুদণ্ডের মধ্যে। তার থেকে নাড়ীগুলো বিস্তারিত হচ্ছে চারিদিকে, শাখাপ্রশাখারূপে, যেমন নীচে তেমন উপরদিকে। সুষুম্নাকাণ্ড যেন যূপের মত সমস্ত নাড়ীজালকে ধরে আছে। অগ্নিশিখা উপরের দিকে উঠে সোমের ধারা হয়ে নীচের দিকে নামছে।

যখন আমরা উপাসনা আরম্ভ করছি, তখন সূর্যোদয় হয়নি। তখন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে হবে। অগ্নির এক নাম উষর্বুধ্। উষা[২] বা সবিতার আবির্ভাব সময়ে কিরণরাশি উপরের দিকে উঠছে। যখন সূর্যোদয় হচ্ছে, তখন রশ্মিজাল পৃথিবীর দিকে নেমে আসছে।

নীচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এযামস্মে অন্তর্নিহিতাঃ কেতবঃ স্যুঃ—(১।২৪।৭)। তার মূল উপরে, শাখাগুলো নীচের দিকে নেমে আসে। ঊর্ধ্বমূল অবাক্‌শাখ অশ্বত্থ, আর সহস্রশাখ বনস্পতি-র নিদর্শন ন্যগ্রোধবৃক্ষ—বটবৃক্ষ। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভাগবতে ন্যগ্রোধবৃক্ষের রূপকল্পনা ধরা আছে। বুদ্ধদেবের বোধিবৃক্ষও ন্যগ্রোধবৃক্ষ ছিল। বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্যে এই ন্যগ্রোধবৃক্ষের প্রশংসা করা হয়েছে। যে মূল থেকে নেমে এসে রশ্মিগুলো আমাদের মধ্যে নিহিত হয়, সেই হল 'উপরিবুধ্ন'। সেখানে সূর্যের

১। ভা. ৪।৮।৫৪।

২। ভগস্য স্বসা উষা (দ্র. ঋ. ১।১২৩।৫)।

অনুপ্রবেশের বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্ণনা উল্টো বৃক্ষরূপে। ভগ যখন উদিত হন, তখন তার সহস্ররশ্মি উপর থেকে নীচে নেমে আসে। এইভাবে ভগই হলেন সহস্রশাখ। আলোকের এই ঝরণাধারায় ধুইয়ে দাও—রবির এই গানে এই ভাবের সুন্দর ছবি পাওয়া যায়।

নি মৃজে—নি ভিতরে, মৃজে শুদ্ধ করা, অন্তর পর্যন্ত যেন শুদ্ধ হয়ে যায়, এই ভাব। ভগ সহস্রশাখায় নীচে প্রসারিত হচ্ছেন, সেই সহস্রধারাতে অবগাহন করে আমরা যেন শুদ্ধ হই। কৈশোরের উপান্ত পর্যন্ত এই ভাবনা। ব্রহ্মচারীরা আসছেন, আচার্য নিজে যেন বালসূর্য হয়ে যাচ্ছেন। ঋগ্বেদে আছে—কুমারীকন্যাদের প্রিয় আর স্ত্রীদের পতি—জারঃ কনীনাম্, পতিঃ জনীনাম্ (ঋ.১।৬৬।৪)। কুমারীদের বঁধূ ভগ (?) এবং বিবাহিতা নারীদের দেবতা সূর্য। কেনোপনিষদে যাঁকে বন বলা হয়েছে—বন ইতি উপাসিতব্যম্ (কেন. ৪।৬)। এই ভাবনা থেকেই ভাগবতদের ব্রজের ভাবনা এসেছে।

এইভাবে ভগ হয়ে আচার্য ব্রহ্মচারীদের আহ্বান করছেন। চারিদিক থেকে ব্রহ্মচারীরা আমার কাছে আসুক, ভগস্বরূপ হয়ে।

যথা আপঃ প্রবতা যান্তি—জল সর্বদা নীচের দিকেই বয়ে যায়। নদীগুলি যেমন সমুদ্রের দিকে বয়ে চলে, তেমনি ব্রহ্মচারীরা আসুক। যথা মাসা অহর্জরম্—দিনের প্রকাশ যার মধ্যে জীর্ণ হয়ে যায়, মাসের পর মাস যেমন সম্বৎসরের মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি ব্রহ্মচারীরা আমার কাছে আসুক। সম্বৎসর আদিত্যস্বরূপ, প্রজাপতিস্বরূপ। প্রত্যেক দিন সূর্যের উদয়াস্ত হচ্ছে, দিনগুলির এই পরিক্রমা সম্পূর্ণ হচ্ছে সংবৎসরে। সমস্ত বছরের প্রকাশ যেন সম্বৎসরে সংগৃহীত হয়। সমুদ্র যেমন সমস্ত নদীর জল গ্রহণ করে, তেমনি সম্বৎসর সমস্ত দিনগুলির সূর্যের প্রকাশ গ্রহণ করে। ব্রহ্মচারীরা দিনের প্রকাশস্বরূপ এবং আচার্য সম্বৎসরের স্বরূপ। আচার্য যেন বলছেন—আমি যেন প্রাণের সমুদ্র, তোমরা নদীর প্রাণ-স্বরূপ। নদীও প্রাণের প্রতীক। তোমরা আমার মধ্যে প্রবেশ কর। যেমন প্রাণের, তেমনি আমি প্রজ্ঞারও সমুদ্র। জ্যোতি, প্রকাশ, সূর্যরশ্মি প্রজ্ঞার প্রতীক। তোমরা দিনের প্রকাশের মত, প্রজ্ঞার রশ্মির মত আমাতে প্রবেশ কর। অর্থাৎ যেন নদীর জল সমুদ্রে প্রবেশ করে, দিনের আলো সম্বৎসরে প্রবেশ করে, তেমনি ব্রহ্মচারীরা আমাতে প্রবেশ করুক। এই প্রার্থনা করে হোম করা হচ্ছে। এই হোমের দেবতা বিশেষ করে ধাতা।

ভগ-এর পরে যে দেবতাকে আচার্য আহ্বান করছেন, তিনি ধাতা। ধাতঃ আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা—ঋগ্বেদে দেবতারূপে ধাতা নেই, তার উল্লেখ আছে। সপ্ত আদিত্যের নামের মধ্যে ছয়টি নাম হল—মিত্র, বরুণ, অর্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ। সপ্তম আদিত্যের নাম নেই। বলা হয়েছে, তিনি তুবিজাত অর্থাৎ যিনি বীর্য হতে জাত। এখানে মনে হয়

ইন্দ্রেরই উল্লেখ আছে। নিরুক্তে যাস্ক, ইন্দ্রকে আদিত্যরূপে উল্লেখ করেছেন এবং 'তুবিজাত'কে তার বিশেষণরূপে গ্রহণ করেছেন। অন্যত্র যাস্ক বলেছেন, এই তুবিজাতই ধাতা (নি. ১০।৩।২৫,২৬)[১] ঋগ্বেদে ধাতা ইন্দ্রের প্রসঙ্গে পাওয়া যায়। তাই মনে হয় ইন্দ্রই ধাতা।[২] বিশ্বকর্মা-সূক্তে আছে—ধাতা বিধাতা পরমোতসংদৃক্ (ঋ. ১০।৮২।২)।[৩] তুমি ধাতা বিধাতা ও পরম সম্যক্ দর্শন। এখানে স্পষ্টভাবে আদিত্যেরই উল্লেখ করা হয়েছে। আদিত্যই বিশ্বকর্মা ধাতা ও বিধাতা। ধাতা আদিত্যের জ্যোতি। আদিত্যরশ্মি যখন আমাদের মধ্যে নিহিত হয়, তখন সে ধাতা। ছা. আছে— হৃদয় থেকে আদিত্য পর্যন্ত একটা নাড়ী আছে, সেই নাড়ী দ্বারা আদিত্য রশ্মি আমাদের হৃদয়ে নিহিত হয়। যেমনি নিহিত হয়, তেমনি প্রচোদিত হলে এই নাড়ীমার্গেই আদিত্যে পৌঁছয়। যোগে এর নাম হিতানাড়ী। এই আদিত্যরশ্মি যিনি নিহিত করেন, তিনি ধাতা। ধাতা যেমন আদিত্য-রশ্মি নিহিত করেন, তেমনি আমিও যেন ব্রহ্মচারীদের মধ্যে প্রজ্ঞা আহিত করতে পারি। আচার্য এই ধাতা হয়েই প্রজ্ঞা এবং বীর্য ব্রহ্মচারীদের মধ্যে আধান করবেন।

প্রতিবেশোঽসি— এই ধাতাকেই বলা হচ্ছে তুমি প্রতিবেশ—প্রতি = সামনে থেকে যিনি আবিষ্ট হন তিনি প্রতিবেশী। আচার্য যেন বলছেন, তোমরা সর্বদা আমার সমীপে—আশেপাশে থাক। ভাবটা এইরকম : সূর্যোদয় হচ্ছে, প্রথমে ভগরূপে সহস্ররশ্মিতে প্রসারিত হচ্ছে, একটু উপরে উঠলেই ধাতা হয়ে প্রকাশ বা জ্যোতিরূপে চারিদিকে সবকিছু ঘিরে রাখছে।

প্র মা ভাহি—প্রতিভাত হতে থাকো। পর্বে পর্বে যেন প্রজ্ঞার উন্মেষ হয়। প্র মা পদ্যস্ব—আমাতে আবিষ্ট হও, প্রপন্ন হও। আচার্যের চেতনা সূর্যবৎ হয়ে গেছে। এইভাবে আচার্য ব্রহ্মচারীদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যার আধাতা।

এইভাবে আচার্যের প্রস্তুতি পূর্ণ হল। মুখ্য তিন দেবতাকে উদ্দেশ করে আচার্য প্রার্থনা করছেন—১) ইন্দ্র, যিনি মেধা ও শ্রী দান করেন, ২) ভগ ও ৩) ধাতা। দেবতার বিন্যাসের পর্ব এইরকম—প্রথম ইন্দ্র, চেতনার অবরোধ দূর করছেন, তাঁর বীর্য ও ওজঃশক্তি দিয়ে। পরে ভগরূপে ঈশ্বরের শক্তির আবেশ হচ্ছে intuition বা প্রাতিভজ্ঞানরূপে। আর ধাতাতে পরিসমাপ্তি। তিন দেবতাই আদিত্যের স্বরূপ। তাঁদের উপাসনা দিয়ে আরম্ভ। তার সঙ্গে রয়েছে শ্রী-এর উপাসনা। শ্রী দেবতাদের শক্তি।

পঞ্চম অনুবাক

১। ধাতা উৎপাদয়িতা সর্বভূতানাং বিধাতা জীবনস্য (আজীবিকা অন্যাসাধুষু অসাধুষু কর্মসু প্রবর্তমানানাম্)
২। দ্র. তবাহমদ্য মঘবন্ উপস্তুতৌ ধাতর্ বিধাতঃ কলশাঁ অভক্ষয়ম্। (ঋ. ১০।১৬৭।৩)
৩। অঘমর্ষণ সূক্তে আছে—সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বম্ অকল্পয়ত্ (ঋগ্বেদ ১০।১৯০।৩)।

এই অনুবাকে ব্যাহৃতির বিবৃতি পাওয়া যায়। এই অনুবাকে ও পরের কয়েকটি অনুবাকে আচার্য ব্রহ্মচারীদের যে বিদ্যা দান করবেন, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। এই বিদ্যার বাক্‌রূপ ও প্রজ্ঞারূপ দুটোই আছে। বাক্‌রূপের কথা আগে বলা হয়েছে। এখন উপনিষদ বা রহস্য বলা হচ্ছে। প্রজ্ঞারূপে উপদেশ আরও পরে বলা হবে।

বেদমন্ত্র সংক্ষিপ্ত হয় নিবিদে। নিবিদ সংক্ষিপ্ত হয় ব্যাহৃতিতে। আর ব্যাহৃতি সংক্ষিপ্ত হয় প্রণবে। প্রণবকে বেদসার বলা হয়। আগে ব্যাহৃতির বিবৃতি দিয়ে পরে প্রণব বিষয়ে বলা হবে।

ব্যাহৃতি সমস্ত বেদমন্ত্রের সারস্বরূপ। বেদমন্ত্রের প্রতিপাদ্য কি? সংক্ষেপে বলা যায়, এক সর্বাত্মক সত্তাকে আমরা বেদের মধ্যেই প্রথম পাই। সেই সত্তাতে পাঁচটি সত্তার অধিষ্ঠানের কথা আগেই বলা হয়েছে। লোক-জ্যোতি-বিদ্যা-প্রজা ও আত্মা। এখানে ব্যাহৃতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রজা ছাড়া অন্য অধিষ্ঠানগুলিকে ব্যাহৃতির সঙ্গে এক করে দেখান হয়েছে। বেদভাবনাকে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পরম সত্তাকে আত্মা বিদ্যা জ্যোতি ও সর্বলোকে দেখতে হবে। অন্যদৃষ্টিতে আমাদের মধ্যে যখন প্রজ্ঞা, জ্যোতির উন্মেষ হবে, তখন সর্বলোকে এই জ্যোতির উদ্ভাস দেখতে পাব। তখনই বেদাভ্যাস সার্থক। ব্রহ্মচারীকে এই বিদ্যা দিতে হবে, যাতে সে জ্যোতির সাধনা—উপাসনা করতে পারে। জ্যোতিকে দেখতে পারে—অভয়ং জ্যোতিঃ, স্বর্জ্যোতিরূপে।

বলা হয়েছে, আর্যা জ্যোতিরগ্রাঃ। জ্যোতি যেন তাদের পথের দিশারী হয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এই ভাবনাকে যে মন্ত্রগুলি বহন করছে, সেগুলিই ব্যাহৃতি। ব্যাহৃতি = বিশেষ রূপে আহরণ করা। যা চারিদিকে বিকীর্ণ হয়ে আছে, তাকে সংহৃত করা। ব্যাহৃতি হল সংক্ষিপ্ত মন্ত্র, বীজমন্ত্র। বেদে যে বীজমন্ত্রগুলি বিক্ষিপ্তভাবে আছে, সেগুলির সংক্ষেপ হল ব্যাহৃতি। আবার ব্যাহৃতিতে আর এক ভাবনাও যুক্ত হয়ে আছে। এই ব্যাহৃতি মন্ত্রগুলি সৃষ্টির মন্ত্র। মন্ত্রের শক্তি দ্বারা প্রজাপতি সৃষ্টি করছেন। প্রজাপতি যেন ভূঃ বলছেন আর ভূলোকের সৃষ্টি হচ্ছে। এইভাবে তিনি বলছেন ভুবঃ, স্বঃ আর ভুবর্লোক ও স্বর্লোকের সৃষ্টি হচ্ছে। এভাবে এই বীজমন্ত্রগুলি লোকসৃষ্টির মন্ত্র।

বাক্ দ্বারা সৃষ্টির সংকেত ব্যাহৃতিতে রয়েছে, এই ছিল বৈদিক ঋষিদের সিদ্ধান্ত। বাক্ (শব্দ) আকাশের গুণ। মহাশূন্যের প্রথম স্পন্দ। ভাবদৃষ্টিতে এ যেন স্বয়ং চিৎসত্তার ঈক্ষা, কামনা বা তপঃ। সৃষ্টি সম্পর্কে এই তিন সংজ্ঞা উপনিষদগুলিতে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ঈক্ষা কাম বা তপ—এটাই তাঁর শক্তির স্পন্দন, এটাই বাক্। তার তুলনা করা হয়েছে গাভীর হাম্বারবের সঙ্গে। গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষতী (ঋ ১।১৬৪।৪১)। গৌরী-মৃগীর (গৌরমৃগ ভারতে, ব্রহ্মদেশে পাওয়া যায়) হাম্বারব

থেকেই সৃষ্টি। অক্ষর আকাশ থেকে ক্ষরিত হল, এটাই ভূতের উপজীব্য। সমুদ্রের তরঙ্গে যেমন জল ফুলে দুলে ওঠে, তেমনি যেন একটা আদি বাক্ বা প্রণব ফুটে উঠল। এই প্রণবের তিনটি ভাব হল ভূর্ভুবঃ স্বঃ। বিলোমক্রমে তিন সৃষ্টি বা লোক— দ্যৌ অন্তরিক্ষ আর পৃথিবী। ব্যাহৃতির এটাই মূল ভাব। তৈত্তিরীয় সংহিতায় এর বিশদ উল্লেখ আছে।

এখানে আমরা চারটি ব্যাহৃতির কথা পাই। পরবর্তী উপনিষদ ও পুরাণে সপ্ত ব্যাহৃতি ও সপ্ত লোকের কথা আছে। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ আর সত্যম্—এই সাতটি ব্যাহৃতির অনুরূপ সাতটি লোক হল ভূলোক অন্তরিক্ষলোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনঃ বা আনন্দলোক, চিৎ বা তপঃলোক ও সত্যলোক। সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলিতে সামান্যত তিনটি ব্যাহৃতি পাওয়া যায়। জৈমিনী-উপনিষদ-ব্রাহ্মণে পাঁচটি ব্যাহৃতির উল্লেখ আছে। কেউ কেউ তাকেই সাতটি ব্যাহৃতি বলেন। ব্যাহৃতির নামগুলি হল—প্র, অ কিম্বা আ, ৱা, ভূর্ভুবঃ স্বঃ ও মহঃ-কে একসঙ্গে নিয়ে চতুর্থ, ও পঞ্চম ব্যাহৃতি উৎ। এর ব্যাখ্যা হল—প্র=প্রাণ, অ = অপান, ৱা = ৱ্যান। ৱ্যান হল প্রাণ-অপানের সন্ধি। এই তিনটি অধ্যাত্ম। তারপর অধিলোক ভূর্ভুবঃ স্বঃ ও মহঃ আর উৎ=উৎক্রান্তি। সাধকেরা, প্রাণ-অপান-ব্যান ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হয়ে উৎক্রান্তি লাভ করবে। ব্রাহ্মণকার একেই পঞ্চ ব্যাহৃতি বলেছেন। ছান্দোগ্যে বলা হয়েছে, বেদমন্ত্র, উক্থ সাত প্রকার। সাত প্রকার উক্থের সঙ্গে সাতটি ব্যাহৃতির যোগ আছে। কিন্তু এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। সাতটি ব্যাহৃতির নামরূপের মূল ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় না। তার আভাস মাত্র পাওয়া যায়। পুরাণে এই ভাবনা পুষ্ট হয়েছে।

ভূর্ভুৱঃ সুৱঃ ইতি ৱা এতাঃ তিস্রঃ ৱ্যাহৃতয়ঃ। তাসাম্ উ হ স্ম চতুর্থীম্। মাহাচ মস্যঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি। তদ্ ব্রহ্ম। স আত্মা। অঙ্গানি অন্যাঃ দেৱতাঃ। ভূঃ ইতি বা অয়ং লোকঃ। ভুৱঃ ইতি অন্তরিক্ষম্। সুৱঃ ইতি অসৌ লোকঃ। ১।৫।১

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই তিনটি (সুপ্রসিদ্ধ) ব্যাহৃতি। তাদের মধ্যে মহঃ নামে চতুর্থ ব্যাহৃতি মহাচমসের পুত্র মাহাচমস্য জেনেছিলেন। এই মহই ব্রহ্ম এবং তিনিই আত্মা। অন্যান্য দেবতা তাঁর অঙ্গমাত্র। এই লোক (পৃথিবী) ভূঃ। অন্তরিক্ষলোক ভুবঃ। ঐ দ্যুলোক স্বঃ (স্বর্গলোক)।

এখানে তিনটি ব্যাহৃতির উল্লেখ করে চতুর্থ ব্যাহৃতি মহঃ যোগ করা হয়েছে।

প্রথম ভূঃ, ইহলোক, পৃথিবী। সমস্ত পৃথিবীকে ব্রহ্মরূপে দেখতে হবে। চতুর্থ ব্যাহৃতি বা তত্ত্বকে প্রথমতত্ত্বে অবতরণ করাতে হবে। দ্বিতীয় ব্যাহৃতি

ভুবঃ—অন্তরিক্ষলোক, বায়ুর স্থান। তাকেও ব্রহ্মরূপে জানতে হবে। তৃতীয় ব্যাহৃতি স্বঃ—আকাশ বা দ্যুলোক, প্রকাশ বা জ্যোতির্লোক, তাকেও ব্রহ্মরূপে জানতে হবে।

ভাবনাটি এরূপ—আমরা এই পৃথিবীতে আছি। এই জল মাটি অগ্নিতে গঠিত পৃথিবীও ব্রহ্ম বা বৃহৎ। তাকে বেষ্টিত করে রয়েছে বায়ু, অন্তরিক্ষলোক, সেটিও বৃহৎ ব্রহ্ম। আর এ সবের মধ্যে এবং সবাইকে ঘিরে চারিদিকে রয়েছে স্বর্লোক— আকাশ বা জ্যোতিঃ। সব কিছু জ্যোতিঃসমুদ্রে নিমজ্জিত। এই জ্যোতিও বৃহৎ বা ব্রহ্ম।

অন্য এক অর্থাৎ চতুর্থ ব্যাহৃতি হল মহঃ। বলা হয়েছে, ঋষি মাহাচমস্য সেটি আবিষ্কার করেছিলেন। এটা তাঁর কীর্তি। যখন নিজেকে এইভাবে বৃহতের দ্বারা আপূরিত ও পরিব্যাপ্ত বলে অনুভব করি, তখন আমরা যে আত্মার মহিমা অনুভব করি, তাই হল মহ। অর্থাৎ আত্মমহিমার বোধকে সর্বদা জাগ্রত রাখা। এই আত্মাই ব্রহ্ম। অয়মাত্মা ব্রহ্ম মাণ্ডূক্য উপ. ২। অন্য সব দেবতা এই মহ ব্রহ্ম বা আত্মার অঙ্গমাত্র।

এরপরে অধিলোক দৃষ্টিতে ব্যাহৃতির সাধনা। অধিলোকদৃষ্টিতে বিচার করলে মহ ঠিক কোন্ লোক? মহ আদিত্যলোক। আদিত্যকেই জ্যোতির সংহত রূপ বলে গ্রহণ করা হয়েছে, এটাই ব্রহ্মচৈতন্য। মাহাচমস্যের আবিষ্কারের পিছনে একটা গভীর সত্য রয়েছে। ব্যক্তিচৈতন্যের বিশ্বচৈতন্যে বিস্ফারণ। মহ-এর অর্থ হল মহান হওয়া, শক্তিমান হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া। বৃহৎ থেকে যেমন ব্রহ্ম, তেমনি মহৎ থেকে মহঃ। বেদ-উপনিষদে যেমন ঋতং বৃহতের কথা আছে, তেমনি ঋতং মহৎ, সত্যং মহৎ-এর কথাও আছে। বিশ্বব্যাপী চৈতন্যই মহঃ। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া, প্রসারিত হওয়া, জ্যোতি যেমন চারিদিকে প্রসারিত হয়ে যায়—তাই মহ = জ্যোতিও বটে। তাতেই যেন শক্তি প্রকট হচ্ছে। তাই মহ শক্তিও বটে। সুতরাং ব্যাপ্তি-জ্যোতি ও শক্তির সমাহারই মহ। মহ-এ আছে universalisation of consciousness এই ভাব-ভাবনাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ত্রিলোকে তাকে ছড়িয়ে দেওয়া, ব্যাপ্ত করা।

প্রথম মন্ত্রে তিনটি লোকের কথা বলা হয়েছে। ভূঃ এই লোক পৃথিবী, পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি যেখানে অগ্নিদেবতার প্রাধান্য। ভুবঃ অন্তরিক্ষলোক, যেখানে বায়ুদেবতার প্রাধান্য। আর তৃতীয় স্বঃ দ্যুলোক বা স্বর্লোক, যেখানে আকাশ বা জ্যোতির প্রাধান্য।

মহঃ ইতি আদিত্যঃ। আদিত্যেন ৰাৱ সর্বে লোকাঃ মহীয়ন্তে। ভূঃ ইতি ৰৈ অগ্নিঃ। ভুৱঃ ইতি ৰায়ুঃ। সুৱঃ ইতি আদিত্যঃ। মহঃ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা ৰাৱ সর্ৱাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে। ভূঃ ইতি ৰৈ ঋচঃ। ভুৱঃ ইতি সামানি। সুৱঃ ইতি যজূংষি।। ১।৫।২

মহই আদিত্য। আদিত্যের দ্বারাই সমস্ত লোক বৃদ্ধি লাভ করে। ভূঃ অগ্নি, ভুবঃ বায়ু, স্বঃ আদিত্য। আর মহঃ চন্দ্রমা। কেননা চন্দ্রের দ্বারাই সমস্ত জ্যোতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। (আবার) ভূঃ ঋক্ সমষ্টি, ভুবঃ সামগুলি, স্বঃ যজুঃ। ১।৫।২

লোক হল আধার ও অধিষ্ঠান। মহ যে আদিত্যলোক, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। এখন জ্যোতির্দৃষ্টিতে ব্যাহৃতির কথা বলা হচ্ছে। পৃথিবীর জ্যোতি অগ্নি। ভূ-কে অধিজ্যোতি-দৃষ্টিতে অনুভব করতে হবে অগ্নিরূপে। বায়ুও জ্যোতি, প্রাণের জ্যোতি। সাধারণত বায়ুকে আমরা জ্যোতিরূপে অনুভব করি না, কিন্তু বায়ুর যে উৎকৃষ্টরূপ মরুদ্‌গণ, তারা যেন আলোতেই ঝলমল করছে। বিদ্যুতের ভাবনাও অন্তরিক্ষেই করা হয়। এখানে বিদ্যুৎ না বলে বায়ু বলা হয়েছে। স্বঃ আদিত্য। লোক প্রসঙ্গে আদিত্যলোকের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু সেখানে আকাশকেই লোক হিসাবে ধরে নিতে হবে। এখানে আদিত্যের জ্যোতিকে উদ্দেশ্য করে সুবঃ ইতি আদিত্য বলা হয়েছে। মহ-ই হল চন্দ্রমা। সৌরজ্যোতির ঊর্ধ্বে চন্দ্রমা। চন্দ্রমা এক দৃষ্টিতে আদিত্যেরই মহিমা। অন্যত্র সংহিতাতে এই চন্দ্রমাকে সোম বলা হয়েছে। আদিত্যের ঊর্ধ্বে যে জ্যোতি, সেই হল এই সোম। সাধারণ চন্দ্রমা কিন্তু অন্তরিক্ষলোকের জ্যোতি। বেদ ও পুরাণে এই জাতীয় ভাবনা আছে। পৃথিবী থেকে দ্যুলোক পর্যন্ত জ্যোতির উৎকর্ষ। দিনের প্রকাশ বা জ্যোতি পর্যবসিত হয় আদিত্যদ্যুতিতে। তারপর রাত্রি। রাত্রির প্রকাশ চন্দ্রমা। বহির্দৃষ্টিতে চন্দ্রমা আদিত্য থেকে নিষ্প্রভ। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে তার জ্যোতি আদিত্য থেকে উৎকৃষ্ট। ঋষির লক্ষ্য হল আদিত্যেরও ঊর্ধ্বে পৌঁছানো। আদিত্যের নীচে আবর্তন গতি। আদিত্যের ঊর্ধ্বে অমৃতলোক। এর সমর্থন ঋক্ সংহিতাতেও আছে। সোমমণ্ডলে (ঋগ্বেদ নবম মণ্ডল) এই অমৃতলোকের বর্ণনা আছে— (ঋ. ৯।১১৩)। সোমলোক তিনলোকেরও ওপারে, সমস্ত প্রকাশ বা আলো যেখানে লোপ পায়, সেখানে। —যত্র জ্যোতিরজস্রম্ যস্মিন্ লোকে স্বর্হিতম্ (৯।১১৩।৭); যত্রাবরোধনম্ দিবঃ (ঐ. ৮); আবার যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে (ঐ, ১১)। এভাবে দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে চন্দ্রমাই উৎকৃষ্ট জ্যোতি।

অন্যভাবেও এই অর্থ গ্রহণ করা যায়। অমৃতত্বের সাধনার সঙ্গে অজর হবার সাধনা ওতপ্রোতভাবে রয়েছে। জরাগ্রস্ত অবস্থায় প্রাণশক্তির অবক্ষয় হয়, যেটা মৃত্যুতে পর্যবসিত হয়। মৃত্যুকে বাধা দেওয়া বা জয় করা যায় কিনা এ সম্পর্কে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। অহোরাত্রের সাধনায় তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অমৃতত্বের বোধ, অস্তিত্বের বোধ অহোরাত্র জাগ্রত রাখা যায় কিনা, অগ্নিহোত্রের

সাধনার পিছনেও এই রহস্য রয়েছে। বাইরের জ্যোতি নিভে গেল, কিন্তু বোধের ভিতর সেটা থেকে গেল, সোম্যজ্যোতির বোধ। বরুণ রাত্রির দেবতা। বাইরে চেতনা মৃতবৎ কিন্তু বোধে অমৃত। এই সোম্য জ্যোতিই অব্যক্তের জ্যোতি, চান্দ্রজ্যোতি। অমৃতত্বের ভাবনা বিশুদ্ধ তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত না হলে, জ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও অমৃতলাভ হয় না। এই ভাবনা নানাভাবে প্রকাশ পায় রাত্রির সাধনাতে, বীরভাবের সাধনায়। প্রাকৃত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হবার সাধনা। তাই বলা হয়েছে এই চান্দ্রজ্যোতির দ্বারাই সর্বজ্যোতি বৃদ্ধি পায়।

ব্যাহৃতির প্রয়োগ বিদ্যাতে অধিষ্ঠিত। বেদ পাঠ—ঋক্ সাম যজুঃ যখন পাঠ করা হবে, তখন ব্যাহৃতির ভাবনা সহ করতে হবে। তৈত্তিরীয় যজুর্বেদের উপনিষদ। তাই ক্রম উল্টে দিয়ে যজুঃকে উৎকৃষ্ট দেখানোর জন্য সুৱ ইতি যজূংষি বলা হয়েছে। ঋগ্বেদ পাঠের সময় ভূ-এর ভাবনা করতে হবে। ঋগ্বেদ অগ্নিজ্যোতির প্রতিপাদক। অগ্নি ভূলোকে ব্যাপ্ত। সামবেদ পাঠকালে ভুবঃ-কে বায়ুরূপে প্রত্যক্ষ করবে। আর যজুঃ-কে স্বঃরূপে অনুধ্যান করবে। স্বাধ্যায়ে স্ব-এর ভাবনা করতে হবে। তারপর সর্বত্র ব্রহ্মভাবনা করতে হবে, যার কথা পরের মন্ত্রে বলা হবে। ঋক্ সাম যজুঃ—সর্ববেদের মন্ত্রগুলি বৃহতের ভাবনায় রাঙিয়ে দিতে হবে।

মহঃ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা ৰাৱ সৰ্ব্বে ৰেদাঃ মহীয়ন্তে। ভূঃ ইতি ৰৈ প্রাণঃ। ভুৱঃ ইতি অপানঃ। সুৱঃ ইতি ৱ্যানঃ। মহঃ ইতি অন্নম্। অন্নেন ৰাৱ সৰ্ব্বে প্রাণাঃ মহীয়ন্তে। তা ৱা এতাঃ চতস্রঃ চতুর্ধা। চতস্রঃ চতস্রঃ ৱ্যাহৃতয়ঃ। তাঃ যঃ ৰেদ। স ৰেদ ব্রহ্ম। সৰ্ব্বে অস্মৈ দেৱাঃ বলিম্ আৱহন্তি।। ১।৫।৩

মহঃ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মের দ্বারাই সমস্ত বেদ মহিমা ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন। ভূঃ-ই প্রাণ। ভুবঃ অপান আর সুবঃ ব্যান। মহ অন্ন। অন্নের দ্বারা সমস্ত প্রাণ বৃদ্ধি পায়। এইভাবে এই চার ব্যাহৃতির প্রত্যেকটি চার চার ভাগে বিভক্ত। তাদের যিনি জানেন তিনি ব্রহ্মাকে জানেন। সমস্ত দেবতা তাঁর কাছে উপহার নিয়ে আসেন। ১।৫।৩

ঋক্ সাম যজুঃ যখন পাঠ করবে, তখন বিদ্যার মহিমাকে সেখানে আরোপ করতে হবে। প্রত্যেক বেদকে ব্রহ্মরূপে জানবে। এই সূত্রে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে অথর্ববেদকে ব্রহ্মবেদ বলা হয়। সোমযজ্ঞে এই ব্রহ্মবিদ্ ঋত্বিককে ব্রহ্মা বলা হয়, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই বলা যেতে পারে মহ ইতি ব্রহ্ম এই অংশে অথর্ববেদের কথাই বলা হয়েছে।

এরপর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ব্যাহৃতির ভাবনাকে জড়জগৎ পর্যন্ত physical level-এ নিয়ে আসতে হবে। অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহে। কিন্তু শুধুমাত্র জড়দেহকে বোঝানো হচ্ছে না। দেহের মধ্যে যে প্রাণ আছে, যিনি দেহ ও মনের মধ্যে সেতুস্বরূপ, তার ভাবনাই করা হয়েছে। ভূ-কে প্রাণরূপে ভুব-কে অপানরূপে, ও স্ব-কে ব্যান রূপে জানবে। বিশ্বব্যাপী প্রাণশক্তিকে যখন দেহে সংহত করছি, তখন অপানের ক্রিয়া। বলা হয়েছে, অস্য প্রাণাত্ অপানতি। প্রাণাপানের সন্ধি হল ব্যান, যা দেহের সর্বত্র ব্যাপ্ত বা প্রসারিত। শ্বাস নিচ্ছি এ হল অপাণ, শ্বাস ছাড়ছি তখন প্রাণের ক্রিয়া, দুয়ের সন্ধিতে ব্যান। শ্বাস-প্রশ্বাসের সন্ধিতে জ্যোতির, প্রকাশের ভাবনা করতে হবে। সেখানে ব্যানকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই জন্য ব্যানকে স্বঃ বলা হয়েছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দের পরিণামে দেহ জ্যোতির্ময় হয়ে যাবে, শক্তিমান হবে।

দেহের উপাদান হল অন্ন, তাই মহ-ই অন্ন। জ্যোতির শক্তির অনুভব হয় দেহে। এটা অন্নেরই মহিমা। যে জ্যোতি লোকে ও দেবতাতে অধিষ্ঠিত ছিল, তাকে দেহের মাঝে নামিয়ে আনা হল।

চারটি ব্যাহৃতিকে চার চার ভাগে বা ভাবে অর্থাৎ ষোল প্রকারে বলা হয়েছে। মূল তত্ত্ব একই। সেই মূল তত্ত্বকেই প্রথমে চারভাগে পরে ষোলভাগে দেখানো হয়েছে। বেদে পুরুষকে ষোড়শকল বলা হয়েছে। তন্ত্রেও ষোড়শী তত্ত্বের ভাবনা আছে। সাধক এইভাবে ষোড়শ ভাগে ভাবনা করে ষোড়শকল পুরুষ হয়ে যাবেন। সাধক নিজেই ব্রহ্ম—হিরণ্ময় পুরুষ হয়ে যাবে। এভাবে যিনি জেনেছেন তিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন। সমস্ত দেবতা এঁর মধ্যেই আছেন। যেমন ব্রহ্মকে তেমনি আত্মাকে মহ-রূপে আত্মব্রহ্মরূপে জানবে। তখন সমস্ত দিব্যভাব আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হবে। এইভাবে অধ্যাত্ম অধিভূত অধিজ্যোতি এবং অধিদৈবত এই চার দৃষ্টিতে ব্যাহৃতির ভাবনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অনুবাক

স যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ। তস্মিন্ অয়ং পুরুষঃ মনোময়ঃ। অমৃতঃ হিরণ্ময়ঃ। অন্তরেণ তালুকে। যঃ এষঃ স্তন ইব অবলম্বতে। সা ইন্দ্রযোনিঃ। যত্র অসৌ কেশান্তঃ বিবর্ততে। বি-অপোহ্য শীর্ষকপালে। ভূঃ ইতি অগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুবঃ ইতি বায়ৌ।। ১।৬।১

এই যে হৃদয়ের মধ্যে আকাশ আছে, তার মধ্যে এই জ্যোতির্ময় অমৃতময় মনোময় পুরুষ আছেন। দুই তালুর মধ্যে এই যে স্তনের মত (মাংসখণ্ড ঝুলছে) তার ভিতর

দিয়ে আর যেখানে কেশমূলগুলো বিভক্ত হয়ে আছে, তার ভিতর দিয়ে মস্তকের উপরিভাগে যেখানে দুটি কপাল যুক্ত হয়ে আছে, তাদের ভেদ করে (অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে যে সুষুম্না নাড়ী নির্গত হয়) যেটা যায়, সেটাই ইন্দ্রযোনি অর্থাৎ ইন্দ্র বা পরমাত্মা বা ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ। (উপাসক) ঐ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে ঐ পথে বেরিয়ে গিয়ে ঊর্ধ্বে ভূঃ ব্যাহৃতির ধ্যান করতে করতে তার দেবতা অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত হন। ভুবঃ—ব্যাহৃতির ধ্যান করতে করতে তার দেবতা বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হন। ১।৬।১

সুৱঃ ইতি আদিত্যে। মহঃ ইতি ব্রহ্মণি। আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসঃ পতিম্। ৱাক্‌পতিঃ চক্ষুঃপতিঃ। শ্রোত্রপতিঃ বিজ্ঞানপতিঃ। এতত্ ততঃ ভৱতি। আকাশশরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মন-আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধম্ অমৃতম্। ইতি প্রাচীনযোগ্য উপাস্স্ব।। ১।৬।২

সুবঃ-ব্যাহৃতির ধ্যান করতে করতে তার দেবতা আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত হন (অর্থাৎ স্বর্লোকে বা দ্যুলোকে ব্যাপ্ত হন।) মহঃব্যাহৃতির ধ্যান করতে করতে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন। (অর্থাৎ সর্বব্যাপী হন)। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলে উপাসক স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন। মনের পতি (আত্মা বা ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হন। অনন্তর তিনি বাক্‌পতি চক্ষুষ্পতি শ্রোত্রপতি এবং বিজ্ঞানপতি হন। এরপর তিনি এরূপ হন। তিনি হন আকাশশরীর, সত্যাত্মা, প্রাণারাম, মন-আনন্দ ও শান্তিসমৃদ্ধ অমৃতস্বরূপ (ব্রহ্ম)। হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি এইভাবে (সর্বাত্মক ব্রহ্মের) উপাসনা কর। ১।৬।২

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই তিন (অপরার্ধের) ব্যাহৃতি অর্থাৎ পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকের দেবতা আর লোক এবং (অপরার্ধ ও পরার্ধের সেতুস্বরূপ) মহরূপী চতুর্থ ব্যাহৃতির দেবতা ও লোক সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আগের অনুবাকে করা হয়েছে। এই অনুবাকে ব্যাহৃতির সাধনার দ্বারা উত্তরণের ascent-এর পথে তত্তৎ দেবতা ও লোকপ্রাপ্তি আর ব্রহ্মলাভের পর অবতরণ, descent-এর পথে এখানে (ইহ এব) এই জগতেই, আমাদের এই দেহ-প্রাণ-মনেই কিভাবে শান্তি-সমৃদ্ধ অমৃতময় ব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বারা স্বারাজ্য লাভ হয়, তার সংকেত দেওয়া হয়েছে। আর শিষ্যকে সেইভাবে উপাসনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আমাদের দেহে আত্মা বা পুরুষের স্থান হৃদয়ে। হৃদি হি এষ আত্মা—প্রশ্ন উ. ৩।৬। এই কথা উপনিষদগুলিতে নানা জায়গায় বলা হয়েছে। যেমন কঠে আছে—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃপুরুষো হন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ, ২।৩।১৭, অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো

মধ্যাত্মনি তিষ্ঠতি, ২।১।১২,১৩, বৃদ্ধাঙ্গুলির মত জ্যোতির্ময় আত্মা বা পুরুষ এ দেহের মাঝখানে, হৃদয়ের মধ্যেই রয়েছেন। সেই হৃদয় থেকে এক প্রধান নাড়ী যাকে হিতা নাড়ী (বা সুষুম্না) বলা হয়েছে, ঊর্ধ্বদিকে উঠে যায়, তার ভিতর দিয়ে উৎক্রমণ করতে পারলে সত্য ব্রহ্মে পৌঁছনো যায়, অমৃত লাভ হয়। শতম্ চৈকা হৃদয়স্য নাড্যঃ তাসাং মূর্ধানম্ অভিনিঃসৃতৈকা—তয়া ঊর্ধ্বম্ আয়ন্নমৃতত্বমেতি, কঠ— ২।৩।১৬। গীতাতেও বলা হয়েছে—ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি। গীতা ১৮।৬১

হৃৎকেন্দ্রই ঈশ্বরলাভের ডঙ্কামারা স্থান—বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তাই ইষ্টোপাসনা বা আরাধনার প্রধান স্থান হৃদয়। ভ্রূমধ্যে—আজ্ঞাচক্রে ও মস্তকোপরি সহস্রারে ধারণা-ধ্যান করার নির্দেশ পরে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য হৃদয়ে ধ্যান করাই সুলভ, সহজ ও নিরাপদ। (পুর্) পুরি শয়নাৎ পুরুষঃ—এই দেহরূপ পুরে যিনি শয়ন করে আছেন, তিনিই পুরুষ। পুর, পুরে উষঃ—এই শরীরের যে অগ্নি বা চিজ্জ্যোতি তিনিই পুরুষ। আবার ভূঃ ভুবঃ স্বঃ আদি আমার দেহের সর্বলোককে পূর্ণ করে, ব্যাপ্ত করে আছেন বলেও তিনি পুরুষ। পূর্ণাঃ ভুরাদয়ঃ লোকাঃ যেন ইতি পুরুষঃ (শঙ্করাচার্য)।

এই পুরুষ কী রকম? তিনি মনোময়। মনের মত সূক্ষ্ম আর হিরণ্ময় অর্থাৎ হিরণ্যের মতো জ্যোতির্ময় ও অমৃতস্বরূপ। উপনিষদে আছে "মনো বৈ অনন্তম্"—মনই অনন্ত অজর অমৃতময়। আমাদের যা কিছু উপলব্ধি সবই এই মনের দ্বারা, মনের মধ্যেই হয়। তাই বলা হয়েছে—মনঃ এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ=আমরা মনেই বাঁধা, মনেই মুক্ত।

এর পরে চেতনার যে পথে উৎক্রমণ হয়, সে পথের সুন্দর বর্ণনা ইঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে। তালুদ্বয়ের মধ্যে যে আলজিভ আছে, তার ভিতর সুষুম্না নাড়ী ভ্রূমধ্য ভেদ করে সহস্রারে উঠে যায়। তারপর সহস্রার (ব্রহ্মরন্ধ্র) ভেদ করে ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্—এই তিন ব্যাহৃতির দেবতা অগ্নি বায়ু ও আদিত্যকে ভেদ করে যোগী সেই পরম পদে পৌঁছন। বেদে উল্লিখিত—তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ (ঋ ১।২২।২০, বা. সং ৬।৫, তৈত্তি. সং ১।৩।৬।২, ৪।২।৯৩, সাম—১।৬।৭।২, অথর্ব—৭।২৬।৭)।

এই হৃদয় থেকে উত্থিত ভ্রূমধ্য, সহস্রার ও ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে যে পথ দিয়ে সুষুম্না নাড়ী পরম ব্রহ্মে উপনীত হয়, তাকে এখানে ইন্দ্রযোনি বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইন্দ্রদ্বার। ইন্দ্রে বা ব্রহ্মে পৌঁছানোর পথ। ঋগ্বেদে পরম দেবতা ইন্দ্র। পরে উপনিষদে সর্বোত্তম দেবতারূপে পরম তত্ত্ব ব্রহ্মের নীচে তাঁকে রাখা হয়েছে। ইন্দ্রই সেই দেবতা যিনি ব্রহ্মকে সবচেয়ে কাছে গিয়ে জেনেছেন। দ্র. কেনোপনিষৎ। কিন্তু সমন্বয়ী দৃষ্টিতে দেখলে আত্মা—পরমাত্মা— ঈশ্বর ও ব্রহ্ম একই তত্ত্ব। অয়মাত্মা ব্রহ্ম (মাণ্ডূক্য ২) যদি

সত্য হয়, তাহলে ঈশ্বর বা ইন্দ্রও ব্রহ্ম এটাও সত্য।

এইভাবে সাধকের চৈতন্য হার্দাকাশ থেকে উত্থিত হয়ে ইন্দ্রযোনির ভেতর দিয়ে আরও উর্ধ্বে উঠে মস্তকোপরি সহস্রার ভেদ করে ভূঃ ব্যাহৃতির ধ্যান করে তার দেবতা বা দিব্যজ্যোতি অগ্নিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অর্থাৎ সমস্ত ভূলোকে ব্যাপ্ত হন। তারপর যথাক্রমে ভুবঃ ও স্বঃ—ব্যাহৃতির ধ্যান করে তাদের দেবতা বা দিব্যজ্যোতি অন্তরিক্ষ স্থানীয় বায়ু ও দ্যুস্থানীয় আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত হন। অন্তে মহঃ—ব্যাহৃতির ধ্যান করে সাধক ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন। এইভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি করে সর্বব্যাপী, সর্বাত্মক হন। তিনি নিজে ব্রহ্মময়, সর্বময় হন।

এই ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফলে কি হয়, সেকথা পরের মন্ত্রে বলা হয়েছে। প্রথমত, সামান্যভাবে বলা হয়েছে—তিনি স্বারাজ্য লাভ করেন। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বারাজ্য হল তাঁর দেহ-প্রাণ-মন। অর্থাৎ তিনি তাঁর দেহ-প্রাণ-মনের উপর আধিপত্য লাভ করেন। অন্যত্র বলা হয়েছে, স্বরাট্ সম্রাড্ ভবতি। এই সামান্যভাবকে আরও বিশদভাবে বলা হয়েছে—সিদ্ধ, মনের পতি হন, বাকের পতি হন, আর বিজ্ঞানের পতি হন। অন্যত্র উপনিষদগুলিতে ব্রহ্মের দ্বারপাল রূপে মন প্রাণ বাক্ চক্ষু আর শ্রোত্রকে ধরা হয়েছে। এখানে প্রাণের স্থানে বিজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে আরেকটা সংকেত আছে। প্রাণ আমাদের মধ্যে সেই শক্তি যে সব ইন্দ্রিয়কে পরিচালিত করে। মনকে বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়দের রাজা। কোথাও বা একাদশ ইন্দ্রিয়। মনে হয়, এখানে ঋষির বক্তব্য—শ্রোত্র, চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়গুলি এবং তাদের সঙ্গে মনকেও বিজ্ঞানভূমিতে উজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় পুরুষ ও লোক. বিজ্ঞানময় পুরুষ ও লোকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। আমাদের চেতনায়, আমাদের এই দেহেই বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় পুরুষ চিদাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছেন—অন্তরতম হয়ে রয়েছেন। সেই চিদানন্দরূপ আত্মাকে পাওয়া সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে পাওয়া ও সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্মকে পাওয়া, একই কথা।

এইভাবে স্বারাজ্য প্রাপ্তি অর্থাৎ নিজের মন ও ইন্দ্রিয়দের ঈশ—master হয়ে যাবার পর তিনি আরও মহান হয়ে ওঠেন। তিনি বিশ্বেশ্বর বা ব্রহ্ম হয়ে যাওয়াতে (ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি) তাঁর দেহ আকাশের মত সর্বব্যাপী হয়ে যায়। তাঁর আত্মা সত্যস্বরূপ হয়ে যায়। সত্যই ঈশ্বরের পরম রূপ। তাই ভাগবতে প্রথমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে—সত্যং পরং ধীমহি। সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মাই তাঁর আত্মা— এই উপলব্ধি দৃঢ় হয়। তিনি প্রাণারাম ও মন-আনন্দ হয়ে যান। তাঁর সমস্ত কর্ম-ক্রীড়া আরামদায়ক সহজ সরল হয়ে যায়। আর মন সর্বদা আনন্দময়। কোথাও কোনও মালিন্য শোক স্পর্শ করে না। দুঃখ-শোক মোহের লেশমাত্র থাকে না। যস্ত

সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি..., যস্মিন্ সর্বানি ভূতানি আত্মৈবাভূত্ বিজানতঃ, তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ— ঈশ. ৬, ৭। অর্থাৎ তিনি এই দেহেই জীবন্মুক্ত হয়ে দিব্যজীবনের অনুভব করছেন। ব্রহ্মকে, ঈশ্বরকে, আত্মাকে এই দেহেই পেতে হবে, অনুভব করতে হবে, তন্ময় হয়ে যেতে হবে, —তবেই তো এই জীবনধারণ সার্থক— সত্য। ইহ চেদবেদীত্ অথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীত্ মহতী বিনষ্টিঃ। কেন. ২।৫।

পরে ব্রহ্মানন্দবল্লীতে এই কথা স্পষ্ট করে বলা হবে।

আর, শান্তি-সমৃদ্ধ অমৃত লাভ করেন। তিনি শান্তিতে সমৃদ্ধ, অমৃতলাভ করেন। ঈশ্বরভাবের পরমপ্রাপ্তি যেমন পরমানন্দ, তেমনি ব্রহ্মভাবের পরম প্রাপ্তি পরমা শান্তি। তাই পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে বলা হয়েছে আনন্দস্বরূপ। আর ব্রহ্ম শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্। সিদ্ধ এই পরম শান্তি দ্বারা সমৃদ্ধ অমৃতস্বরূপ হয়ে যান। তিনি অজর অমর হয়ে ওঠেন। তখন মৃত্যু তাঁর পায়ের ভৃত্য।

হে প্রাচীনযোগ্য, হে প্রিয় শিষ্য, তুমি এইভাবে উপাসনা করো, সাধনা করো। প্রাচীনযোগ্য শিষ্যের নামও হতে পারে, বিশেষণও হতে পারে। প্রাচীন = পূর্বাস্য হয়ে বসে শাস্ত্র বা বেদ অধ্যয়ন করতে যিনি যোগ্য হয়েছেন। যোগ্যের অর্থ fit for yoking, যাকে জোয়ালে জোড়া হয়েছে।

ছান্দোগ্য ২।২৪ মন্ত্রে অগ্নি বায়ু আর আদিত্যের উপাসনা দ্বারা কিভাবে বৈরাজ্য স্বারাজ্য ও সাম্রাজ্য লাভ করা যায়, তার বিশদ বর্ণনা আছে। ঐ ৩।৬ এ মধুভোজী বসুগণ (ভূঃ —পৃথিবীলোক ও অগ্নিদেবতা), রুদ্রগণ (ভুবঃ—অন্তরিক্ষলোক ও বায়ুদেবতা) ও আদিত্যগণ স্বঃ— দ্যুলোক ও আদিত্যদেবত। আরো দ্রষ্টব্য, ছান্দোগ্য ৭।২৫, ভূমা বা ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফলে স্বারাজ্য প্রাপ্তি।

সপ্তম অনুবাক

পৃথিৰী অন্তরিক্ষং দ্যৌঃ দিশঃ অৰান্তরদিশাঃ। অগ্নিঃ বায়ুঃ আদিত্যঃ চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি। আপঃ ওষধয়ঃ ৰনস্পতয়ঃ। আকাশ আত্মা। ইতি অধিভূতম্। ১।৭।১

পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যুলোক দিক্‌সমূহ ও অবান্তর দিক্‌সমূহ (এই পাঁচটি লোকপাঙ্‌ক্ত); অগ্নি, বায়ু (বিদ্যুৎ), আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ (এই পাঁচটি জ্যোতি বা দেবতাপাঙ্‌ক্ত); জল, ওষধিসমূহ, বনস্পতিসমূহ, আকাশ ও আত্মা বা বায়ু— (এই পাঁচটি ভূতপাঙ্‌ক্ত)। এই হল অধিভূত অর্থাৎ সবই মহাভূতের অন্তর্গত।

অথ অধ্যাত্মম্— প্রাণঃ ব্যানঃ অপানঃ উদানঃ সমানঃ। চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনঃ বাক্ ত্বক্। চর্ম মাংসং স্নায়ু অস্থি মজ্জা। এতদ্ অধিবিধায় ঋষিঃ অবোচত্। পাঙ্ক্তং বৈ ইদং সর্বম্। পাঙ্ক্তেন এব পাঙ্ক্তং স্পৃণোতি ইতি।। ১।৭।২

এরপর অধ্যাত্মপাঙ্ক্তের উপাসনার কথা বলা হচ্ছে— প্রাণ ব্যান অপান উদান ও সমান, (এই পাঁচটি প্রাণপাঙ্ক্ত); চক্ষু শ্রোত্র মন বাক্ ও ত্বক্— (এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়পাঙ্ক্ত); চর্ম মাংস স্নায়ু অস্থি মজ্জা (এই পাঁচটি ধাতুপাঙ্ক্ত)। এইভাবে (অন্তর ও বাহ্য) সবকিছুর পাঙ্ক্তভাবে উপাসনার বিধান দিয়ে ঋষি বলছেন— এই সমস্তই পঞ্চাত্মক। (এই আধ্যাত্মিক) পাঙ্ক্ত দ্বারাই উপাসক (বাহ্য বা বিশ্বাত্মক) পাঙ্ক্তকে পূর্ণ ও সমর্থ করছে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুবাকে চারটি ব্যাহৃতির অনুরূপ অধিলোক, অধিজ্যোতি, অধিদেব ও অধিপ্রাণ— এরূপ চার চার বিভাগ করে চতুর্ধা ব্রহ্মের উপদেশ ও উপাসনার কথা বলা হয়েছিল। ষষ্ঠ অনুবাকে বিশেষ করে উপাসনা ও তার সিদ্ধির কথা ব্যাখ্যাত হয়েছিল। সপ্তম অনুবাকে পাঙ্ক্তভাবে ব্রহ্মের উপদেশ ও উপাসনাবিধি নির্দেশ করা হচ্ছে। বেদের পঙ্ক্তি ছন্দে পাঁচটি করে চরণ থাকে। এখানে লোক দেবতা বা জ্যোতি ও ভূতবর্গ— এই তিন বহির্বিশ্বের অঙ্গগুলি এবং প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও ধাতু— এই তিন অধ্যাত্ম অঙ্গগুলিকে পঙ্ক্তি ছন্দের মত পঞ্চধা পদে বিভক্ত করে দেখান হয়েছে। এইভাবে পাঙ্ক্ত ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হয়েছে।

পৃথিবী আদি পঞ্চ লোক, অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চ জ্যোতি বা দেবতা ও অপাদি পঞ্চ ভূত— এই তিন পঞ্চকেই অধিভূতরূপে ধরা হয়েছে, এই বিশ্ব জগৎ যাদের দ্বারা আপূরিত। প্রাণাদি পঞ্চপ্রাণ, চক্ষু-আদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও চর্মাদি পঞ্চ ধাতুকে অধ্যাত্মরূপে ধরা হয়েছে, যাদের দ্বারা আমাদের এই দেহ আপূরিত।

পঞ্চলোকের মধ্যে দিক্সমূহ ও অবান্তর দিক্সমূহকে লোক হিসাবে ধরা হয়েছে। তার দ্বারা সর্বব্যাপী আকাশকেই উদ্দেশ করা হয়েছে। Total Space, যার মধ্যেই সমস্ত লোকের অবস্থান সম্ভব।

পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে ভূমি ও অগ্নিকে স্পষ্টত বলা হয়নি। কিন্তু ওষধি ও বনস্পতির মধ্যে ভূমি ও অগ্নির ব্যঞ্জনা লুকিয়ে আছে। বস্তুত কাঠ জ্বালালেই বা জলের তলায় মাটির ভিতর থেকে তেল বার করেই বা বনস্পতিকে পিষে তেল বার করে তাকে জ্বালিয়ে আমরা অগ্নিকে পাই।

পঞ্চ জ্যোতির মধ্যে বায়ুর উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যত্র বায়ুর স্থানে বিদ্যুৎকে (যার

প্রকাশ অন্তরিক্ষলোকে) ধরা হয়। যেমন, ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্, নেমা ৱিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ—কঠ ২।২।১৫, মুণ্ডক ২।২।১০, শ্বেতাশ্বেতর ৬।১৪।

পঞ্চ প্রাণের স্পষ্ট উল্লেখ বোধ হয় এখানেই প্রথম পাওয়া যায়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রাণের স্থানে ত্বক্-কে ধরা হয়েছে। ত্বক্ স্পর্শেন্দ্রিয়। বায়ু অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণ। তার গুণ স্পর্শ। স্পর্শের অনুভব ত্বকের দ্বারাই হয়।

অধিভূত তিনটি পঞ্চকের পনেরটি বিষয়, অধ্যাত্ম তিনটি পঞ্চকেরও পনেরটি বিষয়— তাদের অধিষ্ঠাতৃ চৈতন্য বা পুরুষকে যোগ করলে অধিভূত ও অধ্যাত্ম দুইরকম ষোড়শকল পুরুষকে পাওয়া যায়। অধ্যাত্ম পিণ্ড ও অধিভূত ব্রহ্মাণ্ড— দুটোই তাঁর— ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের বিভূতি। যা পিণ্ডে তা ব্রহ্মাণ্ডে, যো পিণ্ডে সো ব্রহ্মাণ্ডে। পাঙ্‌ক্ত-পিণ্ড ও পাঙ্‌ক্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভাবনা ও উপাসনা একসঙ্গে করলে সেই সর্বাত্মক ব্রহ্মকেই পাওয়া যায়।

শেষে আকাশের পরে বায়ুর স্থানে আত্মা বলা হয়েছে। আমাদের দৃষ্টিতে সূর্যই আকাশের আত্মা। সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ (ঋ. ১।১১৫।১)। ঘনীভূত বায়ুই সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি। বায়ু অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণ। প্রশ্নোপনিষদে (১।৮) বলা হয়েছে— প্রাণঃ প্রজানামুদয়তি এষ সূর্যঃ। আবার আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ। (প্রশ্ন ৩।৮) সূর্যই সমস্ত প্রজার সমস্ত কিছুর প্রাণস্বরূপ। এইভাবে আকারে ইঙ্গিতে এখানে ভূমি জল অগ্নি বায়ু ও আকাশ— এই পঞ্চ মহাভূতেরই কথা বলা হয়েছে।

অষ্টম অনুবাক

ওম্ ইতি ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ইদং সর্ৱম্। ওম্ ইতি এতদ্ অনুকৃতিঃ হ স্ম ৱৈ অপি ওম্ শ্রাৱয় ইতি আশ্রাৱয়ন্তি। ওম্ ইতি সামানি গায়ন্তি। ওম্ শোম্ ইতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওম্ ইতি অধ্বর্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওম্ ইতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওম্ ইতি অগ্নিহোত্রম্ অনুজানাতি। ওম্ ইতি ব্রাহ্মণঃ প্রৱক্ষ্যন্ আহ ব্রহ্ম উপাপ্নৱানি ইতি। ব্রহ্ম এৱ উপাপ্নোতি।। ১।৮।১

ওম্ই ব্রহ্ম। ওম্ই এই সমস্ত। ওম্ এই শব্দটি সম্মতিজ্ঞাপক বলে প্রসিদ্ধ। উপরন্তু ওম্ বলেই যাজ্ঞিককে (দেবগণকে) মন্ত্র শোনাতে বলা হয় এবং ওম্ বলেই মন্ত্রগুলি দেবগণকে শ্রবণ করানো হয়। ওম্ উচ্চারণ করেই সামগান গাওয়া হয়। ওম্ শোম্ বলে শস্ত্র নামক স্তোত্রসমূহ পাঠ করা হয়। অধ্বর্যু ওম্ উচ্চারণ করেই (হোতার প্রতি) প্রতিগর উচ্চারণ করেন। ওম্ উচ্চারণ করেই ব্রহ্মা অনুজ্ঞা (অনুমতি) দেন। ওম্

উচ্চারণ করে অগ্নিহোত্রের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ, যিনি বেদাধ্যয়ন করান, বা ব্রহ্মের উপদেশ দেন, তিনি ব্রহ্মকে পাবই বলে ওম্ উচ্চারণ করেই অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তাই তিনি অবশ্যই বেদ বা ব্রহ্ম লাভ করেন। ১।৮।১

ব্যাহৃতিরূপ ব্রহ্মোপাসনার উপদেশের পরে সপ্তম অনুবাকে পাঙ্‌ক্তরূপে ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হয়েছে। এখন সর্বোপাসনার অঙ্গভূত, সর্বোপাসনার রাজা সমস্ত বেদের সারভূত ওঙ্কারের উপাসনার কথা বলা হচ্ছে। সংহিতাগুলিতে ওম্ শব্দ ব্রহ্মকে বোঝায়। কিন্তু প্রায় সমস্ত উপনিষদগুলি ওঙ্কার বা প্রণবের স্তুতিতে ভরা। 'পরম্ চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম যদ্ ওঙ্কারঃ— প্রশ্ন ৫।২। ওঙ্কার পর ও অপর ব্রহ্ম দুইই। এতদ্ধি এরাক্ষরং ব্রহ্ম—কঠ ১।২।১৬। গীতাও বলছেন— ওমিতি একাক্ষরং ব্রহ্ম— গীতা ৮।১৩।

ওমিত্যেৱম্ ধ্যায়থ আত্মানম্— মুণ্ডক ২।২।৬। ব্রহ্মপ্রাপ্তির মুখ্য সাধনই ওঙ্কার। প্রণৱো ধনুঃ শরো হি আত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে— মুণ্ডক ২।২।৪। ওঙ্কারই ধনু, শর হৃদয়স্থিত চিদাত্মা আর ব্রহ্মই লক্ষ্য। অপ্রমত্ত হয়ে প্রণবরূপ ধনুতে আত্মারূপ শরসন্ধান করে শর যেমন তার লক্ষ্যকে ভেদ করে, তেমনি আত্মাকে ব্রহ্মে তন্ময় করতে হবে। অর্থাৎ আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব ও একাত্মতা সিদ্ধ করতে হবে— অয়মাত্মা ব্রহ্ম।

ছান্দোগ্যের তো আরম্ভেই ওঙ্কার বা উদ্‌গীথ-উপাসনার কথা আছে। ওম্ ইত্যেতদ্ অক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত— ছা. ১।১। ওঙ্কারই সবকিছু। সর্বভূত, সর্বলোক, এই পৃথিবী, ওষধি, বনস্পতি, মানুষ —সর্ববেদের essence রসই এই উদ্‌গীথ বা ওঙ্কার। ছান্দোগ্যের ঋষি বলছেন— এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ। পৃথিব্যা আপো রসঃ, অপাম্ ওষধয়ো রসঃ, ওষধীনাং পুরুষো রসঃ, পুরুষস্য বাগ্ রসঃ, বাচঃ ঋগ্ রসঃ, ঋচঃ সাম রসঃ সাম্ন উদগীথো রসঃ— ১।২। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাঁর সহজ সরল ভাষাতে বলেছেন— সব বেদ সংহত হয় গায়ত্রীতে, গায়ত্রী সংহত হয় তিন ব্যাহৃতিতে, তিন ব্যাহৃতি সংহত হয় ওঙ্কারে, আবার ওঙ্কারও মিলে যায় তাঁর অর্ধব্যাহৃতিরূপী টঙ্কারের অনুরণনে। যেখান থেকে শব্দ ওঠে, আর সমস্ত বিশ্বজগতের সৃষ্টি হয় সেই মহাকাশে পরম শূন্যে পরম অব্যক্তে মিলিয়ে যায়।

মাণ্ডূক্য উপনিষদে আছে— ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্— মা. ১। এখানে যা আছে, সমস্তই ওম্ অক্ষর। ওম্‌ই আকাশের প্রথম স্পন্দ, প্রথম শব্দ। শব্দ থেকেই সৃষ্টি। এখানে যা হচ্ছে, সবই শব্দের বিকার। আদি শব্দ ওঙ্কার। ওমের সাধনার দ্বারাই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। নাম-নামী অভিন্ন এই ন্যায়ে ওঙ্কারই ব্রহ্ম।

এখানে যজ্ঞসাধনাতে ওঙ্কারের প্রয়োগ এবং তার দ্বারা সিদ্ধিলাভ ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

ওঙ্কারই অনুকৃতি অর্থাৎ অনুকরণ বা সম্মতিজ্ঞাপক শব্দ। যজ্ঞের সময় এবং সাধারণভাবেও সম্মতি জানাতে ওম্ শব্দের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ। উপরন্তু যখন যজুর্বেদী অধ্বর্যু হোতাকে বলেন— 'ওম্ দেবগণকে এগুলো শ্রবণ করাও' তখনই তাঁরা দেবগণকে মন্ত্র শ্রবণ করান। সোমযজ্ঞে বিশেষ করে সামগান করা হয়। ওম্ উচ্চারণ পূর্বকই উদ্‌গাতা— সামগায়ী প্রধান ঋত্বিক সামগান করেন। ওম্ শোম্ উচ্চারণপূর্বক শস্ত্র অর্থাৎ গানরহিত ঋগ্বেদের বিশেষ বিশেষ ঋক্‌সমূহ হোতারা যজ্ঞে পাঠ করেন। হোতৃগণ আবার অধ্বর্যুর অনুমতি নেন শস্ত্রপাঠ করার জন্য। তখন অধ্বর্যু ওম্ ইতি প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি— প্রতিগর অর্থাৎ শোংসামোদৈবোম্— তাতে আমাদের আনন্দ হবে, এইরূপ উৎসাহবাণী। প্রতি কর্মে অধ্বর্যু এই উৎসাহবাণী উচ্চারণ করেন। প্রতিগর—শস্ত্রপাঠের পূর্বে আহাবের প্রত্যুত্তর। আহাব হল শস্ত্রপাঠের আরম্ভে শস্ত্রপাঠক শোংসাবোম্ এই মন্ত্রে অধ্বর্যুকে আহ্বান করেন। অধ্বর্যু তদুত্তরে শোম্‌সামোদৈবোম্ বলে প্রতিগর করেন। শস্ত্র— দেবতার প্রশংসা বা স্তুতি। 'সোমযাগের সময় সবনত্রয়ের হোতা ও হোত্রকত্রয় আপন আপন ধিষণ্যে (আসনে) বসিয়া শস্ত্রপাঠ করেন। ঋক্‌মন্ত্র গান করলে সাম হয়। উদ্‌গাতা ও তাঁর সহকারী প্রস্তোতা ও প্রতিহর্তা সামগান করেন। উদগাতার গেয় অংশ উদ্গীথ। প্রস্তোতার প্রস্তাব। প্রতিহর্তার প্রতিহার। এই তিনজনের একসঙ্গে গেয় অংশ নিধন। ব্রহ্মা = চতুর্বেদী ঋত্বিক্— সর্বকর্মের পরিদর্শক।' যজ্ঞকথা, রামেন্দ্রসুন্দর।

ব্রহ্মা সর্ববেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক্। তিনিই যজ্ঞের পরিচালক। তিনি অনুজ্ঞা দান করেন যজ্ঞের সর্বকর্মে।

যজমান অধ্বর্যুকে ওম্ বলেই অগ্নিহোত্র-হবনীতে হবিঃ ঢালার অনুমতি দেন।

ব্রাহ্মণই আচার্য হন। ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মকে যিনি জেনেছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। আচার্য যখন বেদের প্রবচন করেন অথবা ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দেন, তখন তিনিও 'আমরা বেদ বা ব্রহ্মকে লাভ করতে সমর্থ হব'— এইভাবে ওম্ উচ্চারণ করেই প্রবচন বা উপদেশ আরম্ভ করেন।

ব্রহ্ম উপাপ্নবানি ইতি। এটা ফলশ্রুতি। এইভাবে যিনি যজ্ঞ করেন বা প্রবচন করেন তিনি অবশ্যই ব্রহ্মলাভ করেন।

নবম অনুবাক

ঋতম্ চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যম্ চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপঃ চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমঃ চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমঃ চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়ঃ চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রম্ চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়ঃ চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। মানুষং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনঃ চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিঃ চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যম্ ইতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপ ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এব ইতি নাকঃ মৌদ্গল্যঃ। তদ্ হি তপঃ তদ্ হি তপঃ।। ১।৯

ঋত ও স্বাধ্যায়-প্রবচন। সত্য ও স্বাধ্যায়-প্রবচন। দম ও স্বাধ্যায়-প্রবচন। শম ও স্বাধ্যায়-প্রবচন। অগ্ন্যাধান ও স্বাধ্যায়-প্রবচন। অগ্নিহোত্র ও স্বাধ্যায়-প্রবচন। অতিথি সৎকার ও স্বাধ্যায়-প্রবচন। মানুষের সহজ সাধারণ জীবন ও স্বাধ্যায়-প্রবচন। প্রজা—সন্তান-উৎপাদন ও স্বাধ্যায়-প্রবচন। প্রজন ঋতুকালে ভার্যায় গমন ও স্বাধ্যায়-প্রবচন। প্রজাতি—পৌত্র ও স্বাধ্যায়-প্রবচন। (এই সবকিছুর মধ্যে) সত্যবাদী রাথীতর সত্যকেই প্রধান বলেছিলেন। তপোনিষ্ঠ পুরুশিষ্টের পুত্র পৌরুশিষ্টি বলেছিলেন— তপই প্রধান। আর মুদগলের পুত্র নাক মৌদ্গল্য স্বাধ্যায় ও প্রবচনকেই মুখ্য বা প্রধান বলেছেন। (কারণ তিনি মনে করতেন) এটাই (স্বাধ্যায়-প্রবচনই) তপ, এটাই তপ। ১।৯

ব্যাহৃতির উপাসনা, ওঙ্কারের সাধনা, বা পাঙ্ক্ত-ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারাই যদি ব্রহ্ম-উপলব্ধি হতে পারে, তাহলে অন্যশাস্ত্র বিহিত যজ্ঞাদিকর্ম, শম-দমাদি তপ, বা স্বাধ্যায় ও প্রবচনাদির কি প্রয়োজন? সামান্য জীবনের অন্যবৃত্তির কর্ম বা গৃহস্থ জীবনযাপন করার কি প্রয়োজন? অন্তেবাসীর মনে, ব্রহ্মচারীর মনে এই জাতীয় সন্দেহের অবকাশ যাতে না থাকে তার জন্য এই অনুবাকে বিশেষ করে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ-জীবনের আদর্শকে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। একাদশ অনুবাকে সমাবর্তনের সময় আচার্য যে উপদেশ দিচ্ছেন তাতেও সামাজিক গৃহস্থ-জীবনের কথা বলা হবে।

আত্মা পরমাত্মা বা ব্রহ্মের প্রাপ্তি, সত্য উত্তমজ্যোতি বা অমৃতের প্রাপ্তি বৈদিক জীবনের প্রধান আদর্শ ছিল। গৃহস্থ জীবনে তা সম্ভব নয়, একথা বেদে বা প্রাচীন উপনিষদগুলিতে কোথাও বলা হয়নি। অবৈদিক দুঃখবাদী মুনিপন্থীদের প্রভাবেই পরবর্তী উপনিষদগুলিতেও যজ্ঞকর্ম বা সাধারণ গৃহস্থজীবনকে হেয় করা হয়েছে। এই দুঃখময় সংসার থেকে যেন তেন প্রকারেণ যথাসম্ভব দ্রুত মুক্তি বা মোক্ষপ্রাপ্তি তাঁদের পরম পুরুষার্থ হয়ে উঠেছিল। তাঁদের প্রভাবে, এই জীবন-বিমুখীনতার ফলে পরবর্তী

ভারতীয় সাধারণ জীবনে সর্বপ্রকার দৈন্য এসেছিল।

শীক্ষাবল্লীর এই অনুবাকে সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে স্বাধ্যায় ও প্রবচনের উপর। জীবনের সর্বস্তরে স্বাধ্যায় প্রবচনের সর্বদা অনুসরণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাধ্যায়—শাখা অনুসারে বেদ অধ্যয়ন। প্রবচন— অন্তেবাসী যে জ্ঞান আচার্যের কাছে লাভ করেছেন, অন্যের কাছে সে বিষয়ে অধ্যাপনা বা বেদপাঠরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ।

ঋতম্ ও সত্যম্— এখানে সত্যম্কে আগে স্থান দেওয়া উচিত ছিল। অবশ্য ঋতং চ সত্যং চ— বেদের প্রসিদ্ধ উক্তি। সত্যম্ Truth ই পরমপদ, পরমধাম, এবং পরম ধ্যেয়। সত্যম্ ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সমার্থক। সত্যকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় সৎ চ ত্যৎ চ। যা আছে এখানে— ইদং সর্বম্ ও যা আছে ওখানে— অদঃ। This and That —দুই মিলে সত্য। পরে মন, বচন ও কর্মে সত্য পালন, সত্যকে ধরে রাখা জীবনের উদ্দেশ্য বা কর্তব্য বলা হয়েছে। সত্যনিষ্ঠাই কলিযুগের পরম তপ বা সাধনা— বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

ঋতম্— √ঋ-চলা, গতি অর্থে। যা সর্বদা যাথাতথ্যত— যথা পূর্বম্ চলেছে, তাই ঋতম্। এর থেকেই ঋতু। সৃষ্টির মূলে আছে এই সত্য ও ঋত। তাই ঋগ্বেদের অঘমর্ষণ সূক্তে (শেষের আগের সূক্তে) বলা হয়েছে— ঋতং চ সত্যং চ অভীদ্ধাত্ তপসোঽধ্যজায়ত ঋ. ১০।১৯০।১ (অপ্রকেত সলিল থেকে) অভিতপ্ত তপের আধারে জন্মাল ঋত ও সত্য— Truth & Harmony. এই ঋত ও সত্যের সাধনা করার সময়ে স্বাধ্যায় ও প্রবচন করতে হবে।

তারপর তপ দম ও শম। তপ তপস্যা কৃচ্ছ্রাদি ব্রতপালন। জপধ্যানাদিও তপস্যা। দম বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম। শম অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম। তপ দম ও শম— যা করবে, তখনও স্বাধ্যায় ও প্রবচনে যেন ছেদ না পড়ে।

অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্র। যজ্ঞে নানা প্রকারের অগ্নির আধান— প্রজ্বলন করা হোত। অগ্নিহোত্র দ্বিজমাত্রেরই নিত্য সকাল-সন্ধ্যা করণীয় সহজ-সরল হোম। এই অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্র করার সময় স্বাধ্যায় ও প্রবচন করতে হবে।

মানুষম্ চ। অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্রের দ্বারা যজ্ঞকর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে। মানুষম্ বলতে মানুষের সাধারণ সমাজজীবনের অন্য সব কর্ম বৃত্তি অনুসারী কর্ম ইত্যাদি। তখনো যেন স্বাধ্যায় ও প্রবচন করা হয়।

প্রজা প্রজন ও প্রজাতি— প্রজা অর্থাৎ সন্তান। প্রজন— ঋতুকালে ভার্যা-গমন। প্রজাতি— সন্তানেরও সন্তান। বৈদিক ঋষিরা প্রজননকে হেয় বা ঘৃণ্য দৃষ্টিতে দেখতেন না। খ্রীষ্টানদের মত 'we are born in sin' মানতেন না। বরঞ্চ সন্তান-উৎপত্তি গৃহস্থের অবশ্যকরণীয় ধর্ম ছিল। পরে আমরা সমাবর্তন অনুবাকে দেখব, আচার্য বিশেষ

করে অন্তেবাসীকে আদেশ দিচ্ছেন— প্রজাতন্তুম্ মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সন্তানধারা বিচ্ছিন্ন করো না।

পিতা-পুত্রীয় সম্প্রদান— মৃত্যুর সময়ে পিতা পুত্রকে তাঁর জীবনের সাধনাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার উপদেশ দিতেন, সেকথা উপনিষদে বিশদভাবে বলা হয়েছে।

সন্তানের সন্তান গৃহস্থকে দেখে যেতে হবে। ততদিন পর্যন্ত গৃহস্থজীবনের ত্যাগ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস গ্রহণ বৈদিক গৃহস্থের পক্ষে অধর্মেরই সামিল ছিল। বৌদ্ধ জৈন মুনিপন্থীদের প্রভাবে পরে 'যদহরেব বিরজেত্ তদহরেব প্রব্রজেত্'— যেদিন বৈরাগ্য সেদিনই প্রব্রজ্যা। এই উপদেশ বৈদিক জীবনধারাতেও গ্রহণ করা হয়েছিল।

সংক্ষেপে বলা হল যে, সারা জীবনই স্বাধ্যায় ও প্রবচন করতে হবে।

রথীতরের পুত্র রাথীতর সত্যবচন ও সত্যসাধনার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন সত্যের সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা।

ঋষি পুরুশিষ্টের পুত্র পৌরুশিষ্টি, যিনি নিত্য তপস্যামগ্ন থাকতেন, তাঁর মতে তপই শ্রেষ্ঠ সাধন সম্পদ।

মুদ্গল ঋষির পুত্র মৌদ্গল্য, যাঁর নাম ছিল নাক, তাঁর মতে স্বাধ্যায়-প্রবচনই লক্ষ্যপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। 'নাক' নামের মধ্যেও একটি সুন্দর ইঙ্গিত আছে। কঃ ইতি সুখনাম। 'অকঃ' দুঃখ। ন অক নাক। যার কোন দুঃখ নেই অর্থাৎ— যিনি সকল সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে বা যিনি দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে পরম সুখ বা মহাসুখ লাভ করেছেন। স্বর্গের সুবর্গের উপরে নাকের স্থান। ইঙ্গিতে বলা হয়েছে, কেবল স্বাধ্যায় প্রবচনের দ্বারাই ঋষি মৌদ্গল্য 'নাক' লাভ করেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন— স্বাধ্যায় প্রবচনই তপ বলে জেনো। সেটাই তপ। এভাবে স্বাধ্যায়-প্রবচনের মহিমা খ্যাপন বা গুণকীর্তন করে অনুবাকটি শেষ করা হয়েছে।

দশম অনুবাক

অহং বৃক্ষস্য রেরিৱা। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেঃ ইৱ। ঊর্দ্ধপৱিত্রঃ বাজিনী ইৱ সুঅমৃতম্ অস্তি। দ্রবিণং সৱর্চসম্। সুমেধাঃ অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোঃ ৱেদানুবচনম্। ১।১০

আমি এই (সংসাররূপী অশ্বত্থ)) বৃক্ষের রস বা প্রেরয়িতা। (আমার) যশ কীর্তি পর্বতের পৃষ্ঠের মত সমুচ্চ। ঊর্ধ্বে স্থিত বজ্রতেজ ও সোম্য আনন্দের আধার, উত্তম অমৃতের স্বরূপ (সূর্যের মত) আমি। (আমি) ব্রহ্মতেজে দীপ্তধন। (আমি) শ্রেষ্ঠ

মেধাসম্পন্ন, আমি সর্বদা অমৃতের দ্বারাই সিক্ত। অর্থাৎ আমি অজর অমর। (ব্রহ্মোপলব্ধির পরে) ঋষি ত্রিশঙ্কু এই গাথা উচ্চারণ করেছিলেন।

অহম্ বৃক্ষস্য রেরিৱা— ব্রহ্মবৃক্ষ বা ঊর্ধ্বমূল অবাক্‌শাখরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা বেদে উপনিষদে এবং গীতাতেও আমরা পাই। ৱৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিৱি তিষ্ঠত্যেকঃ— শ্বেতা. ৩।৯। ঊর্ধ্বমূলম্ অধঃশাখম্ অশ্বত্থম্ প্রাহুঃ অৱ্যয়ম্— গীতা ১৫।১। সেই বৃক্ষের রস (sap) আমি। রস— রি, রী, বা রৈ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। চলা, বয়ে চলা, to flow, to blow, to increase। বৃক্ষকে যে বাড়িয়ে তুলছে, তার অন্তরাত্মা আমি।

কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিৱ। সহ নৌ ব্রহ্মৱর্চস— এই কথাগুলি তৃতীয় অনুবাকে পেয়েছি। গগনচুম্বী পর্বতের উচ্চতম শিখরের মত আমার কীর্তি, সবাই যাকে দেখতে পায়।

ঊর্ধ্বপৱিত্রো বাজিনী ইৱ স্বমৃতম্ অস্মি। ঊর্ধ্ব উপরে আকশে ‘পবিত্র’— সোমরস ছাঁকার ছাঁকনী দশাপবিত্র। যা অন্ধ অশুদ্ধ সোমকে শুদ্ধ করে দিব্য সোমে পরিণত করে। পবিত্র শুদ্ধ আধার। ধাতু পূ, পব্ to flow, বওয়ান>পবন, যা বয়ে চলেছে। ‘বহতা নীর্ রমতা সাধু’। যারা সর্বদা শুদ্ধ থাকে।

ৱাজিনী ইৱ— বজ্ ধাতু থেকে বাজ, বাজিন বাজিনী। ওজস্ vigor energy spirit speed। যার তেজ, ওজস্ ও বেগ আছে, তা থেকে বাজী = অশ্ব, বাজিনী = অশ্বী। যা খেয়ে গায়ে জোর হয়, শক্তি ও তেজ বাড়ে, সে অন্নকেও বাজ বলা হয়। তীব্রগতিতে নদীও বাজিনী। তাই সরস্বতী নদীকে বলা হয়েছে— ৱাজেভিঃ ৱাজিনীৱতী। নদীর জল অন্ন উৎপাদন করে, তাই তিনি অন্নপ্রদানকারীও বটে। আকাশের বজ্রতেজ ও তীব্র গতিমান (সপ্ত অশ্ববাহী) সূর্যই ঊর্ধ্ব পবিত্র বাজী। তাঁর তেজই মেঘ উৎপন্ন করে বারিবর্ষণ করায়। আর প্রচুর অন্ন উৎপাদনের কারণ হয়। সেই আকাশের সূর্য যেমন সু অমৃত— উত্তম অমৃতরসের আধার, আমিও তেমন।

দ্রৱিণং সৱর্চসম্। দ্রবিণ ধনসম্পত্তি, বিশেষ করে movable property সচল ধন-সম্পত্তি। দ্রু ধাতু থেকে উৎপন্ন। dripping (দ্রপ্‌স =drops) moving, running, বয়ে চলা, দ্রবতি। অগ্নির এক নাম দ্রবিণোদা, যার লেলিহমান শিখাগুলি ঊর্ধ্বদিকে উঠে যায়। শিখাগুলির পীত রঙ থেকে সুবর্ণং দ্রবিণম্। সূর্যকিরণের মত দীপ্তিমান তেজস্বী। তাই সবর্চসম্। আমি সেই দীপ্তিমান ধন। মনে পড়ে মীরার ভজন— পায়োজি ম্যয়নে রামরতনধন পায়ো। পরশমণি, যা লোহাকেও কাঞ্চনে পরিণত করে।

সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। আমি সুন্দর উত্তম মেধাসম্পন্ন ও অমৃত দ্বারা সিঞ্চিত। আমার মেধা প্রায়শই ঊর্ধ্বের অমৃতরসের দ্বারা সিক্ত হয়। অক্ষয় অজর অমর আমি।

ঋষি বলছেন— ত্রিশঙ্কু নামে রাজর্ষি বেদদিৎ ব্রহ্মবিৎ হবার পর এইরকম গাথা— ব্রহ্মঘোষ উচ্চারণ করেছিলেন। ত্রিশঙ্কুর এই বেদানুবচনের স্বাধ্যায় জপ ধ্যান করতে হবে। মন্ত্রসিদ্ধি হলে শিষ্য ঋষির মতন ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করবে।

একাদশ অনুবাক

ৱেদম্ অনূচ্য আচার্যঃ অন্তেৱাসিনম্ অনুশাস্তি— সত্যং ৱদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়াত্ মা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনম্ আহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ৱ্যৱচ্ছেত্সীঃ। সত্যাত্ ন প্রমদিতৱ্যম্। ধর্মাত্ ন প্রমদিতৱ্যম্। কুশলাত্ ন প্রমদিতৱ্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতৱ্যম্। স্বাধ্যায়প্রৱচনাভ্যাং ন প্রমদিতৱ্যম্।। ১।১১।১

বেদ অধ্যয়নের শেষে আচার্য অন্তেবাসী শিষ্যকে সমাবর্তনের সময় অন্তিম অনুশাসন (শিক্ষা) দিচ্ছেন (সদা) সত্য কথা বলবে। (জীবনে সর্বদা) ধর্ম আচরণ করবে। স্বাধ্যায় বিষয়ে অপ্রমত্ত থাকবে। আচার্যের জন্য (তাঁর) প্রিয় অভীপ্সিত ধন আহরণ করে তাঁকে প্রদান করবে। (গৃহে ফিরে গিয়ে) গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করবে। প্রজা— সন্তানের ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখবে। (বারংবার জোর দিয়ে বলছেন) (জীবনে কোনদিন) সত্যনিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত হয়ো না। ধর্মের ব্যাপারে সর্বদা অপ্রমত্ত থাকবে— (স্বধর্ম পালনে কখনো প্রমাদ করবে না)। কুশল কর্মে (আত্মরক্ষার্থে প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পর্কে) সর্বদা অপ্রমত্ত থাকবে। ভূতির (বিভূতিঃ অর্থোন্নতি ইত্যাদি গার্হস্থ্য জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও) প্রমাদগ্রস্ত হয়ো না। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা থেকেও কখনো বিরত হবে না, প্রমাদ করবে না। ১।১১।১

গুরুগৃহে অধ্যয়ন শেষ হল। গুরুকুল থেকে বাড়ী ফেরার সময়ে আচার্য শিষ্যকে অন্তিম অনুশাসন— উপদেশ দিচ্ছেন, এটা একটা অপূর্ব সমাবর্তন শিক্ষা ও দীক্ষা।

আগের অনুবাকে ঋত ও সত্যের কথা বলা হয়েছিল। এখানে ঋতের স্থানে ধর্মের কথা বলা হয়েছে। জীবনে সত্য ও ঋতকে Truth & Harmony-কে প্রতিষ্ঠিত করা, তার অনুকূল— অনুরূপ আচরণ করা জীবনের শ্রেয়। সত্যময়, ধর্মময় জীবনই দেশে সমাজে শান্তি, সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবে, এই জগতে স্বর্গকে নামিয়ে আনবে।

আচার্য বিশেষ করে সর্ব বিষয়ে অপ্রমত্ত থাকতে বলছেন। প্রমাদ-অজ্ঞান, আলস্য, অবিবেকী মানুষের উন্নতির ঊর্ধ্বগতির প্রধান শত্রু। জীবনে এই তামসিকতা দূর করতে হবে। সর্বদা সতর্ক সাবধান বিবেকবান্ থাকতে হবে।

বেদাভ্যাসের সময় শিষ্যকে গুরুগৃহে প্রয়োজনীয় সেবার অতিরিক্ত কিছুই দিতে হত না। তার নির্বাহের সমস্ত ভার আচার্যই বহন করতেন। কিন্তু অধ্যয়নের সমাপ্তি হলে যথাশক্তি গুরুদক্ষিণা অবশ্য দেয় ছিল। এখানে বিশেষ করে গুরু কী চান, গুরুর কী প্রয়োজন, তাঁর কী প্রিয় বা অভীপ্সিত বিষয় সেটি জেনে আচার্যকে দেওয়া উচিত— একথা বলা হয়েছে। কৃষ্ণের কাছে গুরুদক্ষিণারূপে তাঁর গুরু ঋষি সন্দীপন তাঁর হারানো পুত্রকে ফিরিয়ে এনে দেবার কথা বলেছিলেন। সমুদ্রে আত্মগোপনকারী শঙ্খাসুরকে হত্যা করে কৃষ্ণ গুরুপুত্রকে এনে দিয়েছিলেন। এইরকম গুরুদক্ষিণার নানা কাহিনী ইতিহাস-পুরাণে ছড়িয়ে আছে।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শেষে গৃহাস্থাশ্রমে প্রবেশ করে প্রজা— সন্তানোৎপত্তি বৈদিক জীবনের অবশ্যপালনীয় ধর্ম ছিল। সুষ্ঠু স্বচ্ছ গৃহস্থাশ্রমই সর্ব আশ্রমের আধার। বিবাহ প্রজনন অন্য সব যজ্ঞের মতই অতি পবিত্র কর্ম ছিল। জীবনের প্রত্যেক কর্মকে যজ্ঞে পরিণত করা, ঈশ্বর-উপাসনা, দেবত্বের সাধনায় উত্তীর্ণ করা বৈদিক জীবনের লক্ষ্য ছিল। কোন কর্মই হেয় নয়। প্রত্যেক কর্মকে দিব্য কর্মে রূপান্তরিত করতে হবে। মানবজীবনকে দিব্যজীবনে উত্তীর্ণ করতে হবে— এটাই বৈদিক জীবনের আদর্শ ছিল। তাই আচার্য উপদেশ দিচ্ছেন— কি কুশল কর্মে, কি ভূতি কর্মে শিষ্য সর্বদা অপ্রমত্ত থাকবে। কখনো প্রমাদের বশীভূত হবে না। অপ্রমত্ততা জীবনের সাধনার এক অতি আবশ্যক গুণ। বুদ্ধদেব তাঁর ভিক্ষুদের সর্বদা অপ্রমত্ত থাকার উপদেশ দিতেন। 'অপ্পমাদো অমতপদম্ পমাদো মচ্চুনো পদম্'— ধম্মপদ অপ্পমাদ বগ্‌গো, ১। অপ্রমাদ— অমৃতপদের, নির্বাণপদের প্রাপক; আর প্রমাদ মৃত্যুর রাস্তায় নিয়ে যায়।

'কুশলতা'— কুশল কর্ম সাধারণত শুভকর্ম বা পুণ্যকর্ম, মঙ্গলকর্ম, good works বোঝায়। বৌদ্ধশাস্ত্রে এটা একটা পারিভাষিক শব্দ হয়ে উঠেছিল। সর্বকুশল কর্ম অপ্রমাদ দ্বারাই সাধিত হয়। সুতরাং সমস্ত সৎকর্মে উৎসাহী ও নিষ্ঠাবান হওয়া অতি আবশ্যক। অপ্রমত্ত যারা, তারা অমৃত— সামরস্য, নির্বাণ লাভ করেন। প্রমাদ মৃত্যুতুল্য।

বুদ্ধ আরো বলছেন— সব্ব পাপস্‌স অকরণম্ কুসলস্‌স উপসম্পদা সচিত্তপরিয়োদপনম্ এতম্ বুদ্ধানুসাসনম্—সর্ব পাপ থেকে বিরতি, সর্ব পুণ্য কর্ম শুভকর্মের সঞ্চয়, নিজের চিত্তশুদ্ধি— চিত্তকে নির্মল করা, এটাই বুদ্ধের অনুশাসন। গীতাতেও আছে, যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ (গীতা, ২।৫০)। সর্বকর্মের মধ্যে কুশল কর্ম যোগ।

ভূতি—বিভূতি। জীবনের সর্বস্তরে বিভূতিমান, শক্তিমান হওয়া। অন্ন ধননাম যশ সবকিছু পর্যাপ্তভাবে লাভ করা। ভূতি, কর্ম ইহজীবনকে সমৃদ্ধ করে, জীবনে অভ্যুদয়ের

কারণ হয়। কুশল কর্ম শ্রেয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। জীবনে নিঃশ্রেয়সের কারণ হয়। অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সৌ ধর্মঃ— কণাদ। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স ধর্ম। আচার্য উভয়ের সুষ্ঠু আচরণ করার উপদেশ দিচ্ছেন আর বলছেন— সবকিছু করবে কিন্তু জীবনে স্বাধ্যায় ও প্রবচন অপ্রমত্তভাবে করে যাবে। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যেন সারাজীবন চলতে থাকে। এটাই ব্রাহ্মণের মুখ্য কর্ম ও তপস্যা।

দেৱপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেৱঃ ভব। পিতৃদেৱঃ ভৱ। আচার্যদেৱঃ ভৱ। অতিথিদেৱঃ ভৱ। যানি অনৱদ্যানি কর্মাণি। তানি সেৱিতব্যানি। ন ইতরাণি। যানি অস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়া উপাস্যানি। ১।১১।২

দেবতা ও পিতৃদের জন্য কার্য-কর্ম হতে বিচ্যুত হয়ো না। মাতাই তোমায় দেবতা হোন। পিতাই তোমার দেব হোন। আচার্যকেও দেব বলে মানবে। অতিথিকেও দেব বলে জানবে। যে সব কর্ম অনিন্দনীয়, সেসব কর্মই করা উচিত। অন্যগুলি (নিন্দনীয় বা দুষ্ট কর্ম কখনো) করবে না। আমাদের যেগুলি সদাচার, সেগুলির উপাসনা করবে (শ্রেয় মনে করে আচরণ করবে)। ১।১১।২

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ আচার্য জীবনে সবার সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, তার উপদেশ দিচ্ছেন। দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মানুষ জন্মমাত্রেই তিনটি ঋণে বদ্ধ হয়— দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ। যজ্ঞ-পূজা-উপাসনার দ্বারা দেবঋণ, সন্তান-উৎপত্তির দ্বারা বংশের ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখা ও শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃ-ঋণ, এবং নিত্য স্বাধ্যায় ও প্রবচন দ্বারা ঋষিঋণ পরিশোধ হয়। স্বাধ্যায়-প্রবচনে অপ্রমত্ত থাকার কথা আগের অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। দেবপিতৃকর্ম সম্পর্কেও অপ্রমত্ত থাকার কথা এখানে বলা হল।

এরপরে সেই প্রসিদ্ধ উপদেশ— মাতৃদেৱো ভব। পিতৃদেৱো ভৱ। আচার্যদেৱো ভৱ। অতিথিদেৱো ভৱ। মাতা পিতা ও আচার্যকে দেবতুল্য জ্ঞান করবে। তাঁদের সৎকার ও সেবা করবে। আজকের যুগে, মাতা-পিতা আচার্যকে অবজ্ঞার যুগে এই উপদেশ বিশেষ করে অনুধাবনযোগ্য। সুস্থ সমাজের এটাই মাপকাঠি। মাতা পিতা ও আচার্য দেবতুল্য গণ্য হবেন, একথা মানা সহজ, কিন্তু অতিথিকেও দেবতুল্য সৎকার সম্মান করার কথা অভিনব। অতিথি হলেন যাঁর কোন স্থিতি— আসার স্থিরতা নেই, কোন নিশ্চিত তিথি বা দিনক্ষণ নেই। হঠাৎ এসে উপস্থিত হন। সাধু-সন্তরা পরিব্রাজক হয়ে এক তীর্থ থেকে অন্য তীর্থে পর্যটন করতেন। তাঁদের মতো হঠাৎ উপস্থিত

অতিথিদের দেবতুল্য মনে করে অভ্যর্থনা সেবা করতে হবে। একসময় ছিল, যখন গ্রামে সজ্জন-মহাজনরা, বিশেষ করে মধ্যাহ্নকালে অভ্যাগত অতিথিদের জন্য অপেক্ষা করতেন। সাধু অতিথি গ্রামে এসেছেন কিনা, তার খোঁজেও বেরোতেন এবং তাঁদের ভোজনাদি ব্যবস্থার পর নিজেরা ভোজন করতেন। সাধুরাও বিশেষ করে অসময়ে গ্রামে প্রবেশ করতেন না। অতিথি সৎকার তাই আমাদের দেশের এক বৈশিষ্ট।

এরপর আচার্য বলছেন— অনিন্দ্য, শুভ-কর্মই সর্বদা করণীয়; নিন্দনীয় কর্ম করবে না। শুধু তাই নয়, আমাদের যা সুচরিত, ভাল কাজ তাকেই শিষ্য অনুসরণ করবে। অন্য অর্থাৎ আমাদের কিছু অনুচিত কর্মের অনুসরণ করবে না। আচার্যের কি বিনয়, কি নম্রতা। কাম-ক্রোধের বশে ঋষি, আচার্য, গুরুজনেরাও তো অনুচিত কর্ম করেন। সেইসব কর্ম শিষ্য যেন উপেক্ষা করে। তাই বলা হয়ে থাকে—গুরু যা উপদেশ দেন, তাই কর্তব্য। গুরু যা করেন, তা নয়। আমাদেরও ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে, হয়— তা কজন গুরু বলতে পারেন!

ন ইতরাণি। যে কে চ অস্মত্-শ্রেয়াংসঃ ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়া আসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাত্— ১।১১।৩

অন্যটা নয়। আমাদের থেকে শ্রেষ্ঠতর ব্রাহ্মণদের তুমি সম্মান করবে, সেবা করবে। তাঁদের আসনাদি দিয়ে তাঁদের শ্রম দূর করবে। (যা দান করবে) শ্রদ্ধা সহকারে দেওয়া উচিত, অশ্রদ্ধায় দেওয়া অনুচিত। শ্রীপূর্বক— যথা সামর্থ্য দান করা উচিত। নম্রতা সহকারে সবিনয়ে দেওয়া উচিত। সভয়ে দান করবে। সংবিৎ সহকারে, বিবেচনা পূর্বক দান করবে। যদি কোন কর্ম বা আচার ব্যাপারে তোমার মনে সংশয় বা সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহলে— ১।১১।৩

আচার্য আরো বলছেন, শিষ্য যেখানে থাকবে, সেখানে আচার্যের থেকে শ্রেষ্ঠতর ব্রাহ্মণ থাকতে পারেন, শিষ্য যেন তাঁদেরও সেবা ও সম্মান করেন। অর্থাৎ যেখানেই গুণী ও মহৎ ব্যক্তিদের সন্ধান পাওয়া যাবে, সেখানে তাঁদেরও সেবা ও সম্মান করবে। তাঁদের সবাইকে দানও করবে। যাঁকেই দান করবে, শ্রদ্ধাপূর্বক দেবে, অশ্রদ্ধা বা তাচ্ছিল্যভাবে কাউকে দান করা উচিত নয়। নিজের সামর্থ্যানুসারে দান করা উচিত। অতি দান বা অতি অল্প দান দুটোই গর্হিত। আমি কত বড় দানী— এই অভিমানে সর্বস্বান্ত হয়ে দান করে নিজের আশ্রিতদের বঞ্চিত করা উচিত নয়। এটা সংসারধর্ম-

বিরোধী। দান কিভাবে করা উচিত, সে সম্বন্ধেও আচার্য বিশদভাবে বলছেন— দান করতে হবে সবিনয়ে, নম্রতা সহকারে। দান যেন সাত্ত্বিক হয়। রাজসিক বা তামসিকভাবে দেওয়া না হয়। তাই বলা হয়েছে— সংবিদা দেয়ম্। সংবিৎ সহকারে সবদিক বিবেচনা করে দান করবে। কোন প্রত্যাশা রেখে বা কামনার বশীভূত হয়ে দান করবে না। তাই দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ যার তার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারতেন না। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেন— সাধুর তপস্যার কিছু ফল দাতার নিকট চলে যায়। তাই শিষ্যদের বলতেন— পারলে, কোন বন্ধু বা সজ্জনের কাছে দান গ্রহণ করে জীবন নির্বাহ করবে। অন্নসত্রাদি এড়িয়ে চলবে।

দান সম্পর্কে গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের তিনটি শ্লোক অনুধ্যেয়।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।।২০
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্।। ২১
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতম্ তৎ তামসমুদাহৃতম্।।২২

তারপরে শিষ্যের কোন কর্ম বিষয়ে— যজ্ঞ বা বৃত্তি, যে কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হলে, কোন যোগ্য, যথার্থ ব্রাহ্মণের কাছে সেই বিষয়ে সমাধান চাইবে।

যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তাঃ আযুক্তাঃ। অরুক্ষাঃ ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। অথ অভি-আখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তাঃ আযুক্তাঃ। অরুক্ষাঃ ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তেষু বর্ত্তেরন্। তথা তেষু বর্ত্তেথাঃ। এষঃ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষদ্। এতত্ অনুশাসনম্। এবম্ উপাসিতব্যম্। এবম্ উ চ এতত্ উপাস্যম্।। ১।১১।৪

(কর্ম বা আচরণের ব্যাপারে কোন সংশয় উপস্থিত হলে) সেই সময় বা স্থানে যেসব বিদ্বান, বিচারপরায়ণ, কর্মে নিযুক্ত বা স্বতঃপ্রবৃত্ত, অরুক্ষ, সরলস্বভাব, ধর্মপরায়ণ নিষ্কাম ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকেন, তাঁরা সেইসব কর্ম বা আচার বিষয়ে যেভাবে আচরণ করেন, তুমিও সেইমত আচরণ করবে। আবার, পূর্বোক্তদের মধ্যেও অথবা অন্য যাদের সেই কর্মের জন্য আহ্বান করা হয়েছে, তাদের কারুর আচরণ বিষয়ে যদি কেউ সংশয়

প্রকাশ করেন, তাহলে সেই সেই কালে বা স্থানে যে সব আরো অন্য বিদ্বান, কর্মকুশল কর্মাদিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত, অরুক্ষ অকঠোর অক্রূরমতি ধার্মিক ব্রাহ্মণেরা থাকেন, তাঁরা যেমন আচরণ করেন তুমিও সেইরকম আচরণ করবে।

এটাই আদেশ। এই উপদেশ। এই হল বেদের রহস্য। এই হল আমাদের অনুশাসন। এইভাবেই সমস্ত কর্তব্যের অনুষ্ঠান করবে। এইভাবেই সবকিছু করবে। ১।১১।৪

আচার্য বলছেন— শিষ্যের কোন কর্মে, সেটা যজ্ঞবিষয় বা বৃত্তিবিষয় হোক— আমি এটা ঠিক করছি কিনা অথবা অন্য ব্রাহ্মণরাও যা করছেন, তা ঠিক হচ্ছে কি না— এরূপ সংশয় তোমার মধ্যে উপস্থিত হলে, বিদ্বান বিচক্ষণ ধার্মিক অরুক্ষ অক্রূর নির্লোভ নিষ্কাম ব্রাহ্মণরা যেভাবে আচরণ করেন বা তাঁরা যে রকম বলেন, সেইভাবেই যেন শিষ্য তাঁদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে সব কাজ করে। শিষ্যের সমস্ত কর্ম যেন সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়, তার চেষ্টা করবে।

এই আচার্যের আদেশ। এটাই অনুশাসন। এটাই সৎ-জীবনের রহস্য। এটাই বেদ অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুজ্ঞা। এভাবেই শিষ্য সব কিছু করবেন। শেষের পুনরাবৃত্তি সমাপ্তিসূচক।

দ্বাদশ অনুবাক

শং নঃ মিত্রঃ শং ৱরুণঃ। শং নঃ ভৱতু অর্যমা। শং নঃ ইন্দ্রঃ বৃহস্পতিঃ। শং নঃ ৱিষ্ণুঃ উরুক্রমঃ। নমঃ ব্রহ্মণে। নমঃ তে ৱায়ো। ত্বম্ এৱ প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম অসি। ত্বাম্ এৱ প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম অৱাদিষম্। ঋতম্ অৱাদিষম্। সত্যম্ অৱাদিষম্। তত্ মাম্ আৱীত্। তদ্ ৱক্তারম্ আৱীত্। আৱীত্ মাম্। আৱীত্ বক্তারম্। ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওম্।। ১।১২

শীক্ষাবল্লীর দ্বাদশ ও শেষ অনুবাক উপনিষদের শান্তিপাঠ ও প্রথম অনুবাকের অনুরূপ। কেবলমাত্র ক্রিয়াপদের প্রয়োগে অতীতকাল ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- ত্বামেৱ প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম অৱদিষম্...=তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলেছি, ঋত বলেছি, সত্য বলেছি। তিনিই আমাকে রক্ষা করেছেন। তিনি বক্তাকেও রক্ষা করেছেন। তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন। বক্তাকে রক্ষা করেছেন। সর্বত্র অতীতকাল ব্যবহার করা হয়েছে।

ওম্ শান্তি শান্তি শান্তি— ভূলোকে শান্তি হোক, অন্তরিক্ষলোকে শান্তি হোক, দ্যুলোকে শান্তি হোক। এখানে শান্তি হোক, ওখানে শান্তি হোক, সর্বত্র শান্তি হোক।

প্রথম অধ্যায় শীক্ষাবল্লী সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রহ্মানন্দবল্লী

প্রথম অনুবাক

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং ৰরুণঃ। শং নো ভৱতু-অর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো ৱিষ্ণুর্ উরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্ তে ৱায়ো। ত্বম্ এৱ প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম-অসি। ত্বাম্ এৱ প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম ৱদিষ্যামি। ঋতং ৱদিষ্যামি। সত্যং ৱদিষ্যামি। তত্-মাম্ অৱতু। তত্-ৱক্তারম্ অৱতু। অৱতু মাম্। অৱতু ৱক্তারম্। ২।১।১

এই শান্তিমন্ত্রের অনুবাদ ও ভাষ্যের জন্য দ্র. শীক্ষাবল্লীর শান্তিমন্ত্র।

সহ নৌ অৱতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করৱাৱহৈ। তেজস্বি নৌ অধীতম্ অস্তু। মা ৱিদ্বিষাৱহৈ।। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।। ২।১।২

ওঁ (ব্রহ্ম বা পরমাত্মা) আমাদের গুরু ও শিষ্য উভয়কে সমানভাবে রক্ষা করুন। আমরা উভয়েই যেন সমভাবে বিদ্যার ফল ভোগ করতে পারি। আমরা উভয়ে যেন সমানভাবে সমর্থ হই— সমান শক্তি অর্জন করতে পারি। আমরা যে বিদ্যা লাভ করব সেটি যেন তেজস্বী হয়। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি। ২।১।২

শীক্ষাবল্লীর আরম্ভে বিদ্যা-অধ্যয়নে কোন বিঘ্ন যাতে না ঘটে সেজন্য শং নো মিত্রঃ শং ৱরুণঃ ইত্যাদি শান্তিমন্ত্র পাঠ করা হয়েছিল। আবার শীক্ষাবল্লীর অন্তে নির্বিঘ্নে বিদ্যা-অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়েছে বলে পরমাত্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের জন্য একই শান্তিমন্ত্র পাঠ করা হয়েছিল। তৈত্তিরীয় উপনিষদের কোন কোন সংস্করণে ব্রহ্মানন্দবল্লীর আরম্ভেও সেই একই শান্তিমন্ত্র রাখা হয়েছে। তার পরে যজুর্বেদের প্রধান শান্তিমন্ত্র ওঁ সহনাৱৱতু ইত্যাদি।

শীক্ষাবল্লীতে বেদাধ্যয়নের একটি পর্ব শেষ হল গুরুগৃহে। এবারে আচার্য শুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করবেন। তার আগে শান্তিপাঠ। এটা যজুর্বেদের সাধারণ শান্তিমন্ত্র। এই শান্তিপাঠ গুরু-শিষ্য উভয়েরই উচ্চার্য ও পাঠ্য। আচার্য ও অন্তেবাসীর মধ্যে যে সম্পর্ক হবে, সেটা উভয়ের মুখে ঘোষিত হচ্ছে, পরমাত্মার প্রতি প্রার্থনার মতো। এই ভাব অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। এখানে কোন তর্কের স্থান নেই। গুরু-শিষ্য দুজনের একভাব, একমন। ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণে তর্কের অবকাশ নেই। নৈষা মতিস্তর্কেণাপনীয়া। বৈদিক সাধনাতে যজ্ঞাদি কর্মবিষয়েও এই ভাব ছিল। সোমযাগে 'তনূনপাত্' অগ্নির কথা আছে। তিনি আমার ভিতরেই আছেন, দেহকে চিন্ময় করছেন। তাঁকে স্মরণ করে ঋত্বিক্‌মণ্ডলী শপথ গ্রহণ করতেন— একমনা হয়ে আমরা কর্মানুষ্ঠান করব। প্রপত্তি শরণাগতি দিয়ে কর্ম করব। এইরকম একটা আবহের মধ্যে থেকে তত্ত্ব গ্রহণ করতে হবে। ব্রহ্মচর্যের মূলেও এই একই ভাব ছিল। অন্তেবাসীকে বলা হত 'ব্রস ব্রহ্মচর্যম্'।

প্রার্থনা করা হচ্ছে ব্রহ্ম— পরমাত্মার নিকট, 'সহ নৌ অৱতু'। কর্তৃপদ নেই, ঊহ্য। এটা mystic touch । যিনি অবন বা রক্ষা করবেন, তিনি অনির্বচনীয়, অনিরুক্ত। এই ভাব যাজ্ঞিকদের মধ্যে ছিল। 'অনিরুক্তো ৱৈ প্রজাপতিঃ'। এই প্রজাপতি কিন্তু ব্রহ্ম নয়। তিনি পরমপুরুষের বিভাব। যিনি প্রজাসৃষ্টিতে ব্যাপৃত, তিনিই প্রজাপতি। কিন্তু বস্তুত তিনি 'কঃ'—কস্মৈ দেৱায় হৱিষা ৱিধেম। যার উদ্দেশে চলব, তিনি অনিরুক্ত। তিনিই হিরণ্যগর্ভ, তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত অন্তরে বাহিরে। শাঙ্করভাষ্যে হিরণ্যগর্ভকে নামিয়ে আনা হয়েছে। আসল কথা তা নয়। তিনি পরমেশ্বরের একটি বিভাব। তার পিছনে রহস্য আছে। একটা বিস্ময়ের বোধ আছে। সেজন্য এখানে কর্তারূপে কারুর উল্লেখ নেই।

'অৱতু'— ধাতুপাঠে √অৱ এর উনিশ অর্থ আছে। অৱ > উম > ওম > ওম্। সব দেবতা— ওমাসঃ। অব্-এর বিশেষ অর্থ আগলে থাকা, ঘিরে থাকা, রক্ষা করা। বায়ুমণ্ডলে যেমন আমরা আছি। অদৃশ্য বায়ুমণ্ডল, চিন্ময় আবহ। অন্তরে প্রত্যক্ষ, কিন্তু বাইরে দেখতে পাই না। তিনি আমাদের আগলে রাখুন, আমাদের রক্ষা করুন। 'নৌ'— আমাদের উভয়কে। সেই চিন্ময় প্রাণ, যিনি অনিরুক্ত, তাঁর অদৃশ্য প্রভাব দিয়ে আমাদের আবিষ্ট করবেন। দেবতার সেই আবেশ থেকে বাক্-এর যে স্ফুরণ, তাই উপনিষদ। 'সহ'—দুজনকে এক করে। উভয়ের সম্পর্ক অতি গভীর। প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত নচিকেতা ও যমের। বৈদিক আচার্য বা গুরু আদর্শ। কিশোর নচিকেতা, যার মধ্যে বিদ্যার অভীপ্সা জেগেছে, তিনি বিদ্যালাভের জন্য সবকিছু প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। তিনি অত্যস্রাক্ষীঃ সব কিছু ছেড়ে দিলেন বা অতিক্রম করলেন। নচিকেতা শ্রদ্ধা দিয়ে আরম্ভ করছেন।

তাঁর মধ্যে 'শ্রদ্ধা আৱিৱেশ'। সেই আবেশ থেকেই অনমনীয় দৃঢ়তা। যমের মুখোমুখি হয়েও। এটাই যথার্থ শিষ্যের প্রধান লক্ষণ। গুরুর লক্ষণ হল— তিনি প্রেষ্ঠ, তাঁর প্রিয়তা। একদিকে শিষ্যের শ্রদ্ধা ও অভীপ্সা, আর অন্যদিকে গুরুর ভালবাসা। তখন 'ৱিৱৃতং সদ্ম'। তোমার সামনে দ্বার খুলে গেছে। তারপরে দীক্ষা। তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রৱীমি— ওমিত্যেতত্ (কঠ ১।২।১৫)।

উভয়ের সম্পর্ক— আশ্চর্য বক্তা, কুশল শিষ্য; আশ্চর্য জ্ঞাতা, কুশল অনুশিষ্ট। দ্র. কঠ ১।২।৭। এক, আশ্চর্যভাব, দুই, কৌশল। কুশল >কৌশল। কুশং লাতি। যে কুশ ছেদন করে। সাবধানে না করলে, হাত কেটে যাবার ভয় আছে। এই কুশলতাকেই পরে বলা হয়েছে বিবেক। বিবেক সাধনাই কৌশল। অন্তেবাসী হবে বিবেকবান। আরেকটি প্রয়োগ আছে বৌদ্ধশাস্ত্রে, উপায় কৌশল। এটা আচার্যের কৌশল। বিদ্যাদানের উপায় বিষয়ে কুশলতা। এইভাব পরে তন্ত্রে বিস্তারিত হয়েছে। তিনটি উপায়ের কথা বলা হয়েছে— (১) আণব (২) শাক্ত (৩) শাম্ভব। তারপরেও আছে— অনুপায়। বেদান্তে এগুলি হল—শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন। যার তিনটিরই প্রয়োজন, সে কনিষ্ঠ সাধক। যার দুটি দরকার সে মধ্যম। শুধু শ্রবণমাত্রেই যার সিদ্ধিলাভ হয়, সে উত্তম। যেমন নচিকেতা। যে কিছুই জানে না, কিন্তু যার উদগ্র আগ্রহ আছে, শ্রদ্ধা-বিবেক-বৈরাগ্য আছে, তখন যমের মত আচার্যও বিস্মিত হন এরূপ শিষ্য পাওয়াতে। যিনি আচার্য হবেন, তিনিও আশ্চর্য বক্তা হবেন— যমের মত। কিভাবে তিনি উপদেশ দেন, দক্ষিণামূর্তির ছবিতে তার আভাস পাওয়া যায়। হৃৎকমল প্রস্ফুটিত করার মত ভাব। এই আশ্চর্য বক্তা, তাঁর অনুশাসন বাণীরূপে প্রকাশ করেন, সেটাও একটা কৌশল। শক্তিপাতের দ্বারা মন্ত্রের জাগরণ। আচার্য তাঁর শক্তি দিয়ে মন্ত্রকে শিষ্যের হৃদয়ে জাগ্রত করেন। আরেক গুরু-শিষ্যের দৃষ্টান্ত আছে গীতাতে—কৃষ্ণার্জুন।

সহ নৌ ভুনক্তু— আবেশের পরে সেই শক্তি— বায়ব্যশক্তি— চিন্ময় প্রাণ আবিষ্ট হয়। তিনি আচার্য এবং অন্তেবাসী উভয়কে সম্ভোগ করেন। ইষ্টদেবতাই সম্ভোগ করেন। তিনি আবিষ্ট হয়ে আমাদের স্বীকার করেন। এই স্বীকৃতিই তাঁর অনিরাকরণ। ছা. উ. শান্তিপাঠে যার কথা বলা হয়েছে— মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোত্ ইত্যাদি। শ্রী অরবিন্দ বলেছেন, 'opening of the heart to the Divine'। এটা যখন হয় তখন তিনি নন্দিত হয়ে আবিষ্ট হন। আমাদের 'তনু-মন' তিনি স্বদন— আস্বাদন করেন, তারা অগ্নিষ্বাত্ত হন, অগ্নি আমাদের আস্বাদন করেন। সম্ভুক্ত হয়ে দেবতার আনন্দ ও আমাদের আনন্দ এক হয়ে যায়। অগ্নির মত বায়ুও আবিষ্ট হয়ে নন্দিত হন। তাঁর নন্দন স্ফুরিত হয় আমাদের প্রাণে। প্রাণ স্ফুরিত হয় মন্ত্ররূপে— উপনিষৎ স্ফুরিত হয় দেবতা আবিষ্ট হয়ে নন্দিত হওয়াতে।

সহ ৱীর্যং করৱাৱহৈ— আনন্দের পরে বীর্য। বীর্য, শক্তি ও প্রজ্ঞা প্রকৃতির অধিকারে। প্রজ্ঞা উন্মেষিত হলে আধার নন্দিত হয়। দেবতা আমাদের সম্ভোগ করেন। তাঁর দ্বারা সম্ভুক্ত হয়েই আমাদের সম্ভোগের আনন্দ এবং তার দ্বারাই বীর্যের প্রকাশ। এটা বেদে সমীকৃত করা হয়েছে কর্মের সঙ্গে। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, ব্রহ্মচারী গুরুর জন্য যে কর্ম করেন, সেটাই তাঁর বীর্যের প্রকাশ। গুরু যে ভার-ভাব দেবেন, তাকে বহন করব, এটাও বীর্য। এই বীর্য জাগে কর্ম থেকে, বা বীর্য থেকে কর্ম জাগে। বীর্যকে বেদে বিষ্ণুর শক্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বিষ্ণুর বীর্য, যা তিনি সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। অগ্নির বীর্য হল সকল বাধা দহন করে আধারকে শুদ্ধ করা। ইন্দ্রবীর্যের কথাও বেদে আছে, কিন্তু তাকে বলা হয় শৌর্য। বীর-শূর-ধীর, তিনটি লক্ষণ ব্যবহার করা হয়। উপনিষদে ধীর শব্দ খুব পাওয়া যায়। বীর্য দেহগত ও প্রাণগত। আধার প্রস্তুত হলে অগ্নির শক্তি কাজ করে। আধারের মধ্যে ইন্দ্রের শক্তি প্রকাশ পেলে সেটা শৌর্য, সেটা প্রাণের শক্তি। সাবিত্রীশক্তির প্রকাশ ধীরতা— ধৈর্য। ধীর—ধী দিয়ে সবকিছুকে যে ধারণা করছে। এটা সাবিত্রীশক্তি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াত্। পতঞ্জলিতে শ্রদ্ধার পরেই বীর্যের স্থান। শ্রদ্ধা-বীর্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞা, পতঞ্জলি ১।২০। বুদ্ধদেবও বীর্যকে বড় স্থান দিয়েছেন। তিনি বলতেন— বীর্যহীন হবে না। উপনিষদেও আছে নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ মু. উ. ৩।২।৪। পতঞ্জলিতে আছে— ব্রহ্মচর্য-প্রতিষ্ঠায়াং ৱীর্যলাভঃ, ২।৩৮। যিনি ব্রহ্মে বিচরণ করেন, তাঁর দেহ-প্রাণ-মন বৃহৎকে ধারণা করার যোগ্যতা লাভ করে। বীর্য জাগলে বিদ্যাগ্রহণ ও বিদ্যাসঞ্চারে কার্যকরী হয়। এরই ফলশ্রুতি পতঞ্জলির ব্যাসভাষ্যে বলা হয়েছে, সমস্ত বাধা অপসারিত করে শক্তির আবির্ভাব হয়। তখন আচার্য অন্তেবাসীকে বিদ্যা দিতে পারেন এবং অন্তেবাসীও সেই বিদ্যা গ্রহণ করতে পারেন। তার ফলে, 'তেজস্বি নৌ অধীতমস্তু'— যা অধীত করেছি, যা পেয়েছি আচার্যের কাছ থেকে, সেই অধীত বিদ্যা যেন সিদ্ধ হয়। অন্তেবাসী অধ্যয়ন করেন এবং তার ফলে সে 'অধীতী' হবে, অধীতিন্ > অধীতী— অধ্যয়ন বিদ্যা যার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তেজস্বিন্ ক্লীবলিঙ্গ প্রথমার একবচনে তেজস্বি। তেজ হল শক্তির পুঞ্জভাব। নানাদিক থেকে বিদ্যার প্রবাহ বা রশ্মিগুলি এসে আচার্য ও অন্তেবাসীর মধ্যে মিলিত হয়েছে। আচার্যের কাছে আসছে অনির্বচনীয় থেকে এবং তাঁর থেকে অন্তেবাসীতে মিলিত হচ্ছে, একটা তেজঃপুঞ্জে পরিবর্তিত হচ্ছে— convergence। তখন বিদ্যার সামর্থ্য জন্মায়, অবিদ্যা দূর হয়। এটা অধীতের তেজস্বিতা। এটা যাঁর মধ্যে হয়েছে তিনি অধীতী।

মা ৱিদ্বিষাৱহৈ— কখনো যেন বিদ্বেষের ভাব না আসে, বিদ্বেষের কোন অবকাশ যেন না থাকে। সহ-ভাবের কথা। অনির্বচনীয় তৎস্বরূপ, আচার্য ও অন্তেবাসী তখন সেই তত্ত্বে এক হয়ে যাবেন। বিদ্বেষের কথা অনির্বচনীয়ের দিক দিয়ে আসে না, কিন্তু

মর্ত্য-আধারে প্রমাদ ঘটতে পারে। তার সম্পর্কে সতর্ক থাকা, সাবধান থাকা। যে বিদ্যা লাভ করেছি, সে যেন সম্পূর্ণরূপে প্রদ্যোতিত হতে পারে। আবার প্রকাশ পেয়ে চলেও যেতে পারে বিদ্যুতের মত। তখন প্রমাদের অবকাশ উভয়ত ঘটতে পারে। তার মূল কারণ কিন্তু অহমিকা। আচার্য বা অন্তেবাসী দুজনের মধ্যেই অহমিকা থাকতে পারে। আচার্য প্রাণ খুলে সব দিতে চান না। অন্তেবাসীও ঠিক করে নিচ্ছে না। তখন বিদ্বেষ উৎপন্ন হতে পারে উভয়ত। উভয়ে যদি আত্মসমর্পণ করতে পারেন পরমের প্রতি, তাহলে বিদ্বেষের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু কোনরূপে যদি হয়, তাহলে যেন সতর্ক থাকি। বিদ্বেষের আরেক নাম শঠতা। সম্পূর্ণ openness of mind, মনের উদারতা থাকা চাই। ওম্ শান্তি শান্তি শান্তি।

শান্তিপাঠ শেষ হল। এবার উপনিষদের আরম্ভ।

> **ওঁ ব্রহ্মৱিদ্ আপ্নোতি পরম্। তদ্ এষা অভি-উক্তা। সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম। যঃ ৱেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ৱ্যোমন্। সঃ অশ্নুতে সর্ৱান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ইতি।**

ওম্। ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি পরম ব্রহ্ম— পরমাত্মাকে লাভ করেন। তার জন্যে এই ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে—

ব্রহ্ম হলেন সত্য জ্ঞান অনন্তস্বরূপ। যিনি তাঁকে হৃদিস্থিত গুহার মধ্যে ও পরম আকাশে আছেন বলে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের দ্বারা সর্বপ্রকার কাম্য বিষয় উপভোগ করেন।

এই অংশ দুই ভাগ আছে। প্রথম যজুঃ, ওঁ ব্রহ্মৱিদ্ আপ্নোতি পরম্। ব্রহ্মবিদ্, যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন, তিনি পরমকে পান। পরে ঋক্। এই ঋক্ যথাযথ ছন্দে নেই। অনুষ্টুপ্ হত, কিন্তু সম্পূর্ণ নেই। ঋক্ তত্ত্বের স্থাপনা করে, আর ব্রাহ্মণে ফলশ্রুতি বলা হয়। আবার উল্টোও হয়। আগে ফলশ্রুতি, পরে ঋক্। ব্রাহ্মণ হল মীমাংসা বা অর্থবাদ। আর সংহিতা, মন্ত্র হল শ্রুতি। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। মন্ত্রের নিজস্ব স্বাভাবিক শক্তি আছে, যা তত্ত্বকে আলোর মত উদ্ভাসিত করবে। সবার ভিতরে নাও হতে পারে। আমার শ্রদ্ধার ওপর নির্ভর করে। বেদান্তে আগম, শ্রুতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে গণ্য করা হয়। তর্ক হলে সেটি হবে নৈয়ায়িক প্রস্থান। শ্রুতির পরে বিশদভাবে বোঝাবার জন্য স্মৃতিপ্রস্থান। সেটি কিন্তু শ্রুতিতে পৌঁছয়নি। অধিকার-ভেদ আছে। উত্তমাধিকারীর শ্রবণমাত্রেই জ্ঞানলাভ হয়। আগমই চরম প্রমাণ। বেদান্তের ভাষ্য হতে পারে। অনেক ভাষ্যও হয়েছে। সমস্ত শেষ হবে যখন মন্ত্র সহজে স্ফুরিত

হবে। এই মন্ত্র— এই দিব্য বাকের উপরেই উপনিষদের ভিত্তি। এখানে যুক্তি পাব না। গীতা স্মৃতিপ্রস্থান। বেদান্তসূত্রে অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রে যুক্তি পাব। সত্যিকার বেদান্ত হল উপনিষৎ। এটা মন্ত্রের অংশ। ব্রাহ্মণে অর্থবাদ ও ফলশ্রুতি থাকে মন্ত্রে প্রবৃত্তি দেবার জন্য, যেমন ছোট ছেলেকে তেতো ওষুধ খাওয়াবার সময় বলা হয়, এই পাবে, ওই পাবে। ব্রাহ্মণে বিধি অংশও আছে, সেটা কিন্তু স্বতঃপ্রমাণ। তার সঙ্গেও যুক্ত থাকে অর্থবাদ ও ফলশ্রুতি। ব্রহ্ম বিষয়ে প্রবৃত্তি করাবার জন্য এখানে মন্ত্র ও অর্থবাদ দুটোই বলা হয়েছে। তবে এটা অনুভূতির জন্য। ব্রহ্মৱিদ্ আপ্নোতি পরম্। ব্রহ্মকে যে জেনেছে সে পরমকে পায়। পরম হল অখণ্ড ও সমগ্রের বোধ। প্রাপ্তির মধ্যে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স দুটোই থাকবে। শঙ্করাচার্য কেবল নিঃশ্রেয়সকে গ্রহণ করেছেন।

পরের দুটি ঋকে সাধনা ও সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

প্রথম বাক্যে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলা হল। দ্বিতীয়ে সাধনার কথা। যঃ ৱেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ৱ্যোমন্। তৃতীয়ে সিদ্ধির কথা। সঃ অশ্নুতে সর্ৱান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা ৱিপশ্চিতা ইতি। এই তিনটি বাক্যে মন্ত্র পূর্ণ।

প্রথম মন্ত্রটি এক মহাবাক্য। তার মননের বিধান আছে। শঙ্করাচার্য তাঁর চারটি মঠের জন্য চারটি মহাবাক্য নির্বাচিত করেছেন। তার মধ্যে এটা একটা।

বেদান্তে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষশ বলা হয়েছে— সৎ চিৎ আনন্দ। সেজন্য কেউ কেউ পাঠভেদ কল্পনা করেছেন। তাঁরা বলেন, অনন্তের পরিবর্তে আনন্দ হওয়া উচিত। এটা ঠিক নয়। সমস্ত বল্লীর নামই ব্রহ্মানন্দবল্লী। এই উপনিষদে বলা হবে ব্রহ্মের তিন বিভাবের কথা। এক, সৃষ্টিক্রম। দুই, ব্রহ্মকে স্বরূপে দেখা। তিন, ব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপ। এই বল্লীর শেষে আছে ব্রহ্মের আনন্দের মীমাংসা। এখানে এই মন্ত্রে আনন্দের কথা নেই। আসল কথা হল, সত্যকে অনন্ত করতে না পারলে ব্রহ্মবোধ জাগে না। ঐ. উ. আছে প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, ৩।১।৩। এই উপনিষদের অন্যত্র আছে— আনন্দং ব্রহ্মণো ৱিদ্ৱান্ ন বিভেতি কদাচন, কুতশ্চন। বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মকে সত্য বলা হয়েছে এবং 'সৎ চ ত্যত্ চ' বলে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই উপনিষদে আনন্দকেই মুখ্যভাবে ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ব্রহ্মলাভ হলে আনন্দ পাওয়া যায়। অর্থাৎ আনন্দ ব্রহ্মলাভের ফল। শঙ্করাচার্য আনন্দবাদী ছিলেন না। তিনি যে মহাবাক্যগুলি চয়ন করেছেন, সেখানে আনন্দ নেই, তত্ত্বমসি, অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি ও প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। অবশ্য তার কারণ আছে। আনন্দের পেছনে ছুটলে ব্রহ্মকে নাও পেতে পারি। There is a psychological fallacy in Hedonism. সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হলে আনন্দ আপনা হতে আসবে। আমরা সুখলোলুপ, তাই গোড়াতেই আনন্দ স্থাপন করতে চাই। গৌড়পাদ ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য চারটি জিনিস বর্জন করতে বলেছেন, সেখানে

রসাস্বাদ বর্জনের কথা আছে। গীতাতেও বলা হয়েছে— রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে, ২।৫৯। পরমকে পেলে রস আপনিই জাগবে। এই উপনিষদেও পরে বলা হয়েছে— রসো বৈ সঃ, ২।৭। রস, আনন্দ আসবে, কিন্তু গোড়াতে তাকে চাইতে গেলে প্রমাদ হতে পারে। এই ভাবই শঙ্করাচার্যকে অনুপ্রাণিত করেছে।

সত্যের লক্ষণ নানাভাবে বলা যেতে পারে। যেমন, নৈয়ায়িকের ভাব। যেটা পর-সামান্য সেটাই সত্য। General concept– বস্তুর মূলে যে ভাব, সেটা সামান্য। পর-সামান্য হল অস্তিত্বমাত্র। যেমন আত্মবিচারে প্রথমে আমরা সবকিছু দেখি মন বুদ্ধি শরীর প্রাণ ইত্যাদি দিয়ে। পরে এক এক করে ছাড়ছি অন্ন প্রাণ মন ইত্যাদি। শেষে বোধের ভিত্তি হল কেবল অস্তিত্বের বোধ, কেবল আছি এইমাত্র। এটা অজ্ঞান নয়, পরম জ্ঞান। সেখানে চৈতন্য ও সত্তা অবিনাভূত। Objectively পরাক্ দৃষ্টিতে চেয়ার টেবিল ইত্যাদি সবই আছে, কিন্তু সব কিছুর অস্তিত্ব নির্ভর করছে আমার বোধের উপর। আমিই প্রত্যক্ষ করছি। আমি প্রত্যক্ষত আমাকেই জানি। বাকি সব অনুভব উল্টোদিক থেকে, জগৎ থেকেই আমার বোধে জাগছে। পৃথিবী আমার মাতা, কিন্তু দ্যৌ আমার পিতা। মাতৃঘাতী পরশুরাম হয়ে সত্যকে জানতে হবে। মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং-এর দর্শনে তার সমর্থন রয়েছে। বোধের শেষ পর্যন্ত থাকে অস্তিত্ববোধ মাত্র। কঠ উপ.-এ আছে, অস্তি ইতি এব উপলব্ধব্যঃ, ২।৩।১৩। এখানে সত্য ও জ্ঞান এক হয়ে যায়। তার মধ্যে moral নৈতিক ও spiritual motive আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য আছে। Ontological base তাত্ত্বিক ভিত্তিও আছে। আমি আছি— অস্তিত্বের এই বোধমাত্রে নিবিষ্ট হতে পারলে, ভাবনার সমন্বয়ে— সৌষম্য আসে। এটাই সত্যং জ্ঞানম্। তারপরে আত্মচৈতন্যের ব্যাপ্তি ঘটে। কঠ-এ আছে— যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসি প্রাজ্ঞঃ তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানম্ আত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি।। ১।৩।১৩। বহিরিন্দ্রিয়কে মনে, মনকে প্রকাশাত্মক বুদ্ধিতে, জ্ঞানাত্মাতে, জ্ঞানাত্মাকে মহত্ আত্মাতে অর্থাৎ বৃহতে, আর বৃহৎকেও শূন্য আত্মাতে অর্পণ করতে হবে। এই শূন্য আত্মাই অনন্ত। জ্ঞান-আত্মায় অর্থাৎ আমি-বোধে চিত্তকে নিয়ে গেলেই সেটা আপনি ছড়িয়ে পড়বে মহতে, বৃহতে। আমি সবার আত্মায় ছড়িয়ে পড়ব। প্রথমে বোধকে গুটিয়ে এনে সত্যে বা বিন্দুতে সংহত করতে হবে। পরে ছড়িয়ে পড়লাম মহান্ আত্মাতে, পরে শান্ত আত্মাতে। তাই সত্য ও জ্ঞানের পর অপরিহার্যরূপে অনন্তের ভাব আসে। আত্মা ও ব্রহ্ম একাকার হয়ে যায়।

যঃ বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। যিনি জেনেছেন, ব্রহ্ম তার মধ্যে গুহাহিত হয়ে আছেন। আবৃত্তচক্ষু হয়ে, অন্তরাবৃত্তির বোধে যে সত্য পাওয়া যায়। বহু থেকে একে পৌঁছতে হবে। 'যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবম্ একস্থমনুপশ্যতি। ততঃ এব চ

বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।। গীতা-১৩।৩০। গুহা— শঙ্কর বলেছেন বুদ্ধিগুহা। এটাই বিজ্ঞানতত্ত্ব। মন দিয়ে তাকে পাওয়া যায় না। তার উপরে উঠতে হবে। বিজ্ঞানভূমি হল যোগের একাগ্রভূমি— অন্তরভূমি। ভিতরে তিনি রয়েছেন— গুহাতে। সেই ভিতরের গুহাই আবার হয়ে যাবে পরম ব্যোম। সেখানে সব ফাঁকা— পরম শূন্য। এটাই চিদাকাশ, মহাকাশ, অনন্ত। ঋগ্বেদের ভাষায়, এই উপনিষদেও শীক্ষাবল্লীর ষষ্ঠ অনুবাকে আমরা পেয়েছি নিহিতং গুহায়াম্— সেখানে যা ছিল, সেখান থেকে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে পরম ব্যোমে উঠে যাচ্ছে। রন্ধ্র— বিন্দু, তাই আবার সিন্ধু। বিন্দুই সিন্ধু হয়ে যায়। তার ফলে আনন্দ লাভ হয়।

সঃ অশ্নুতে সর্বান্ কামান্— ঐ পরম ব্যোমে পৌঁছলে ঐ আকাশভাবনা থেকে, ভূতাকাশ থেকে হার্দাকাশে, তার থেকে মহাকাশে, পরম ব্যোমে অর্থাৎ মহান্ আত্মা থেকে শান্ত আত্মাতে পৌঁছে, তার থেকে সম্ভূতির দিকে ঝোঁক এলে তখন চেতনা আবার হার্দাকাশে নেমে আসে ও তার ফলে আনন্দ উৎসারিত হয়। একথা পরে আসবে। আকাশো বৈ আনন্দঃ। তখন উপাসক সমস্ত কামনা সম্ভোগ করেন। জীবনের পরিপূর্ণতা আসে। এটাই অমৃতের সম্ভোগ— যার কথা ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে — ৱিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে, ঈশ-১১।

সর্বান্ কামান্ অমৃত করে, তার সম্ভোগের একটা technique বা কৌশল আছে। কামনা সবার মধ্যেই আছে। বাইরে চাইছি কিন্তু পাচ্ছি না। অন্তরাবৃত্ত হলেই সত্য করে তাকে পাওয়া যায়। যেমন ভগবানকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা, এটা একটা দুঃখজনক অবস্থা। কিন্তু তারই ভিতরে পরম সান্ত্বনা রয়েছে। এই ব্যাকুলতা তাঁরই ভিতর থেকে ফুটছে। কামনার সঙ্গে আমরা আমিকে যোগ করি। এই আমিটাই সর্বনাশের মূল। বৃহতের কামনাকেই যদি ধরে রাখি, তখন শ্রদ্ধা আসে। শ্রদ্ধা থেকে আশ্বাস, সান্ত্বনা পাই। যখন গাছে ফুল ফুটছে, তখন ফল পাবই, এই আশ্বাস। শেষ পর্যন্ত এটাই সত্য। শক্তি এবং আনন্দ সহজে স্ফুরিত হবে। চাইতে গিয়ে আমরা নিজেরাই বাধার সৃষ্টি করি। আনন্দের জন্য বাইরে ছুটতে গিয়ে আত্মবিলাসে বহুদিন কেটে যায়। তাই এখানে বলা হয়েছে, আগে অন্তরে, হৃদয়ে গুহাতে প্রবেশ কর। তারপর পরম ব্যোমে ছড়িয়ে পড়। তখন তার থেকে আনন্দ আপনি উৎসারিত হবে। তাই ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে— তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ঈশ-১।

সহ ব্রহ্মণা ৱিপশ্চিতেতি —ব্রহ্মকে পেয়েছি। যিনি বিপশ্চিত্, তিনি সঙ্গে রয়েছেন, আর তাঁর প্রসাদরূপে সব আনন্দ ভোগ করছি। তাঁর সম্ভোগ। তাঁর সঙ্গে আমিও করছি। এই ব্রহ্মই সব হয়ে সবার ভিতর দিয়ে পরম স্বরূপকে আস্বাদন করছেন। তাঁর সঙ্গে এক হয়ে আমিও তাঁর আস্বাদন করছি। 'বিপশ্চিত' পারিভাষিক

শব্দ। √বিপ্ = হৃদয়ের কম্পন, আন্দোলন। ভাবের প্রকম্পনই বিপ্। √চি = to perceive, জানা, সচেতন হওয়া। ব্রহ্মই বিপশ্চিত্— তাঁকে পেয়ে আমার হৃদয়ে যে কম্পন, তাকে তিনি জানছেন। আমার এই উল্লাসকে তিনি আস্বাদন করছেন। তিনি নন্দিত হচ্ছেন। আমার পক্ষে এটা যেন নববধূর আনন্দ— 'সাধ্বস্'। ভয়-লজ্জা মিশ্রিত আনন্দ, দুরু দুরু হিয়া।

তস্মাত্ বৈ এতস্মাত্ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাত্ ৰায়ুঃ। ৰায়োঃ অগ্নিঃ। অগ্নেঃ আপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিৰী। পৃথিৰ্যাঃ ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যঃ অন্নম্। অন্নাত্ পুরুষঃ। সঃ বৈ এষঃ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ। তস্য ইদম্ এৰ শিরঃ। অয়ম্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়ম্ উত্তরঃ পক্ষঃ। অয়ম্ আত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তত্ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি। ২।১।৩

ঐ ব্রহ্ম, যিনি এই আত্মাই, তাঁর থেকেই আকাশ উৎপন্ন হল। আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী। পৃথিবী থেকে ওষধিসমূহ, ওষধি থেকে অন্ন। অন্ন থেকে পুরুষ। উক্ত সেই পুরুষ হলেন অন্নরসময়। এই হল তার মস্তক। এই তার দক্ষিণ পক্ষ। এই উত্তর বা বামই তার বাম পক্ষ। এই হল তার আত্মা (দেহের মধ্যভাগ)। আর এই হল তার পুচ্ছস্বরূপ প্রতিষ্ঠা। সেই বিষয়েও একটি শ্লোক (কথা) আছে। ২।১।৩

ব্রহ্মের কথা হচ্ছিল। হঠাৎ আত্মার কথা বলা হচ্ছে। সেই পরমে ব্যোম্নি যে ব্রহ্ম— সেই হৃদয়গুহাতে নিহিত যে ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা। এই ব্রহ্মই আত্মা। সমস্ত সৃষ্টিই ব্রহ্ম থেকে। এখানে বলা হয়েছে, এই আত্মা থেকে সৃষ্টি। তাই আত্মা, সৃষ্টি ও ব্রহ্ম একাত্ম হয়ে যাচ্ছে। আত্মা শব্দের বিন্যাস করে তিনটিকে এক করা হয়েছে। অয়মাত্মা ব্রহ্ম— এই ভাব সামনে রেখে সব দেখে যাব। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যেমন আমার ভিতরে, তেমনি অধিদৈবত দৃষ্টিতে বিশ্বের সর্বত্র। স্বরূপে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্। সান্ত হলেই জীব; অনন্ত হলে ব্রহ্ম। তাঁর দুটি বিভাব। এক আনন্দ, দুই সিসৃক্ষা— সৃষ্টির ইচ্ছা। তাঁর আনন্দ থেকে সৃষ্টির উল্লাস। যেমন ব্রহ্ম থেকে, তেমন আত্মা থেকেও। যখন আমি এইভাবে তাঁকে অন্তরে পাব, তখন বাইরেও দেখব সমস্ত বিশ্ব আমার থেকে, আত্মা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সব সময়ে সর্বত্র দেখব বিপশ্চিত্ আনন্দব্রহ্মকে।

বৈদিকরা প্রত্যক্ষবাদী— চিন্ময়প্রত্যক্ষবাদী—ইন্দ্রিয়বাদী। অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত দুটি দৃষ্টিতে সবকিছু দেখেন। সাংখ্যের ধারা analytical বিশ্লেষণবাদী। এটা মুনিধারা।

এটাও বেদে আছে, ছড়ানো ভাবে। তাকে রূপ দিয়েছেন তার্কিকরা— সাংখ্যের পঞ্চভূতবাদ evolution of soul—প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের উৎক্রান্তি। অন্নময় পুরুষ থেকে আনন্দময় পুরুষ পর্যন্ত।

পঞ্চমহাভূতকে পঞ্চপুরুষকে শঙ্কর পঞ্চকোষে পরিণত করেছেন। পঞ্চদশীতেও পঞ্চকোষবিবেকের কথা আছে। এখানে উপনিষদে কিন্তু পঞ্চকোষের কথা বলা হচ্ছে না। পঞ্চ আত্মা বা পুরুষের কথা বলা হচ্ছে। এই সবের বিস্তৃত ব্যাখ্যা সাংখ্যদর্শনে আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ বেদান্ত আর সাংখ্যকে মিলিয়ে দিয়েছেন, যেমন পরে গীতাতেও করা হয়েছে। ব্রহ্ম শুধু অনন্ত সত্য, অনন্ত জ্ঞান নয়, তিনি অনন্ত আনন্দও বটে। সর্বান্ কামান্ অশ্নুতে, সেখান থেকে একথা এসেছে। এটাকেই পরে আনন্দ বলা হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ প্রসঙ্গে আনন্দের কথা নেই। বলা হয়েছে অনন্ত। শঙ্করের দৃষ্টিতে নির্গুণ ব্রহ্মই পরব্রহ্ম। ব্রহ্ম সগুণ বা নির্গুণ এসব কথা পরে উঠেছে। এখানে স্পষ্টত বলা হয়েছে— এই ব্রহ্ম বা আত্মা থেকেই সৃষ্টি। সৃষ্টি শক্তির ব্যাপার। প্রশ্ন করা হয়েছে— কুত ইয়ং ৱিসৃষ্টিঃ। যত আ বভূৱ যদি ৱা দধে যদি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ৱ্যোমন্ত্ সো অঙ্গ ৱেদ যদি ৱা ন ৱেদ।। ঋ. ১০।১২৯।৬, ৭। এই বিসৃষ্টি কোথা থেকে, যার থেকে এসব হয়েছে? তিনিই এসব করেছেন বা করেননি? যিনি এ সবার অধ্যক্ষ হয়ে পরম ব্যোমে রয়েছেন? তিনি সত্যিই এটা জানেন অথবা হয়তো তিনিও জানেন না! সমস্ত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ যেন সংহিতার এই প্রশ্নের ভাষ্য। তার প্রারম্ভেও এই প্রশ্নমালা— কিং কারণং ব্রহ্ম, কুতঃ স্ম জাতা, জীৱাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ ইত্যাদি ১।১। এই সৃষ্টির কারণ কি? ব্রহ্ম? আমরা কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছি? কি করে বা কার দ্বারা জীবিত আছি আর কোথায় বা আমাদের প্রতিষ্ঠা? তাঁর বিসৃষ্টির পরেই দেবলোক, ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোক ইত্যাদি।

এই অনন্ত সত্য আর জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে যখন হৃদয়ে অনুভব করি, তখন আমার সমস্ত কামনা তৃপ্ত হয়, আমি আনন্দিত হই এবং তখন দেখি সেই সৎ-চিৎ-আনন্দ থেকেই সৃষ্টির উল্লাস। তাহলে ব্রহ্মের চারটি লক্ষণ পাচ্ছি— সৎ চিৎ আনন্দ ও শক্তি। মূলে এক—একং স্বৎ থেকেই যাচ্ছে। পরে অসতের কথা আসবে। অসদ্ ৱৈ ইদম্ অগ্রে আসীত্। ততো ৱৈ সদ্ অজায়ত। তৈ. উ. ২।৭। অনন্ত বিশেষণটি সব লক্ষণের সঙ্গে থাকবে। তখন অসৎ থেকে শক্তি পর্যন্ত ব্রহ্ম চতুর্লক্ষণ থেকে পঞ্চলক্ষণ হল।

তস্মাদ্ ৱৈ এতস্মাদ্ আত্মনঃ —বলা উচিত ছিল তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ। ব্রহ্ম না বলে নিজেকে, আত্মাকে নির্দেশ করে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম আত্মা হয়ে গেলেন। আত্মা থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে। দৃষ্টি প্রত্যক্ হয়ে গেল, পরাক্ নয়। আত্মা থেকে সৃষ্টি কি করে হয়? ঈশ্বর থেকে সৃষ্টি বোঝা সহজ। তাই এখানে বিশেষভাবে বলা হচ্ছে তস্মাত্।

তৎ অনির্বচনীয় ব্রহ্ম। তার কথা বলে অনির্বচনীয় অর্থেই এতৎ আত্মাকে বোঝানো হয়েছে। কঠ. উ. ২।২·তে বলা হয়েছে এতদ্বৈ তৎ। অন্যত্র বলা হয়েছে অয়মাত্মা ব্রহ্ম। এসব কথাই এখানে কৌশলে বলা হল। 'ব্রহ্মে'র বোধ 'আত্মা' বা আমি থেকেই বুঝতে হয়। এই কথা ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। এই ভাব বেদেও আছে। ঈশ্বর সবার কাছে পরাক্ objective। আমি আর উনি এক, এটা শুধু এখানেই। I and He are one এটা প্রত্যক্ দৃষ্টি। পরাক্ দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান কখনো হতে পারে না। একথা বার্গসঁও বলেছেন। হৃদয় দিয়ে, অন্তর দিয়ে জানাই আসল জানা। শুধু মন দিয়ে জানা হলে কিছুই হয় না। আত্মোপলব্ধিই ঈশ্বরকে জানার একমাত্র উপায়। কিন্তু আত্মা থেকে তো সৃষ্টি হতে দেখি না। তাই ঋষিরা তিন তত্ত্ব ধরেছেন। আমি আছি, ভুবনানি— সাত বা চোদ্দ লোক এবং একো দেবঃ আছেন। দেবতাই সব হয়েছেন। দেবতাই আমি হয়েছি— এটা বুঝি। কিন্তু আমি কোথায় বহু হয়েছি? তার সমাধান হল, যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈব্বাভূত্ ৱিজানতঃ (ঈশ.৭)। আত্মাই তখন পরিব্যাপ্ত চৈতন্য। নিজেকে নিজের ভিতর আবদ্ধ দেখছি না, সর্বত্র ব্যাপ্ত দেখছি। অনন্তের সঙ্গে একাকার হচ্ছি। আমার চিত্ত উদ্দীপ্ত হচ্ছে। রামকৃষ্ণ বলতেন, বাইরে যা দেখছি, তার প্রতিবিম্ব আমার ভিতরে পড়ে, আর আমি তাতে তন্ময় হয়ে যাই। বৃহদারণ্যকেও এই কথা আছে। যখন মনের উপর অনন্তের ছাপ পড়ে, তখন মনোময় চৈতন্য অনন্ত হয়ে যায়। একেই রামকৃষ্ণ সহজ ভাষায় উদ্দীপন বলেছেন। ভিতরে উদ্দীপন হয় আর আমি অনন্তে ছড়িয়ে পড়ি। আত্মচৈতন্য বিস্ফারিত হচ্ছে, বৃহৎ হচ্ছে, তাতে দুয়ের মধ্যে সাযুজ্য হচ্ছে। এটাই প্রথম উপলব্ধি। যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি— এই বোধ গভীর হলেই সাধক সর্ব্বভূতেষু চাত্মানম্— সর্বভূতকে আত্মস্বরূপ বলে দেখেন। তারপরে আসে আত্মৈব্বাভূত্ ৱিজানতঃ— এটাই উপনিষদের অনুভূতির ধারা।

আত্মবিস্ফারণের আরেক ধারা হল প্রেমের ধারা, ভালবাসার ধারা। ভালবাসায় সব এক হয়ে যায়। Mysitic Participation. ঈশ্বর বা মা তাঁর মায়ায় সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্ট্বা তদেৱানুপ্রাবিশত্। আমি যদি তিনি হয়ে যাই তাহলে আমিই সব হয়ে যাই। তার প্রথম প্রতিধ্বনি পাই আমার ভালবাসায়। প্রেম বা ভালবাসা যেটা সমাজে বন্ধনের হেতু, সেটাই যদি সর্বব্যাপী হয়ে যায়, 'সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ' হয়, তাহলে সবাই আপন হয়ে যায়। তখন যেন আত্মা থেকেই সর্বভূতের সৃষ্টি। তখন ব্রহ্মই আত্মা, আত্মাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আত্মারূপে আত্মচৈতন্যরূপে উল্লসিত হচ্ছেন। এই কথা ঋগ্বেদে ঋষি নাভানেদিষ্ঠ মানব-এর (ঋষির নাম লক্ষণীয়) ব্রহ্মঘোষে প্রকাশিত হয়েছে। ইয়ং মে নাভির্ ইহ মে সধস্থম্। **ইমে মে দেৱা অয়মস্মি সর্ব্বঃ।।** ঋ. ১০।৬১।১৯। আমিই এইসব কিছু হয়েছি। সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম আর অয়ম্ অস্মি সর্ব্বঃ— একই ভাব, একই কথা। অগ্নি হল

আত্মচৈতন্য। আমার মধ্যে যে তাপ আর আলো, heat and light, সেই অগ্নি। আত্মাই অগ্নি এটা দার্শনিক ভাষা। এই অগ্নিই সব আর আত্মাই সব, একই কথা। Androgynous conception বৃষভ-ধেনু অর্থাৎ অর্ধনারীশ্বর ভাব। অগ্নি সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হল তিনি বৈশ্বানর। আত্মা যখন অগ্নি, আমি যখন অগ্নি, তখন বিশ্বনরে সমস্ত বিশ্বের নরেও অগ্নি, তখন আমার আত্মাই সব হয়েছে। প্রত্যেক ভাবনার মূল রয়েছে সংহিতাতে।

সৃষ্টির ধারা দুটো দিক। প্রথমটা হল এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ থেকে অদ্ভ্যঃ পৃথিবী পর্যন্ত, পরপর পাঁচটি মহাভূত। আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী। আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি ইত্যাদি যেন প্রলাপের মত। বাইরে তো সেইরকম দেখতে পাই না। এইসব শব্দ, নামগুলো বৈদিক দেবতাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। আকাশ শব্দ ঋগ্বেদে নেই, কিন্তু প্রকাশ আছে। আকাশের স্থানে সবচেয়ে পুরাতন শব্দ হল ব্যোমন্—পরমে ব্যোমন্। অথর্বসংহিতায় আকাশ শব্দের ব্যবহার আছে। তার মূলে রয়েছে দেব এবং লোকের ভাবনা। দুটি অন্বিত ভাবনা। দেবতা চৈতন্য ও আলো ছড়ান। যেখানে ছড়ান, সেই space দেশ হল লোক। সূর্য ওঠে আকাশে। 'আপ্রা দ্যাবা পৃথিবী অন্তরিক্ষম্।' সূর্যের আলো যাকে আপূরিত করল, সেটাই লোক। পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যৌ তিনটি লোক। তিনটি লোকের পিছনে মূল এক তত্ত্ব— এক আকাশ। আলো ব্যাপ্ত হয়, ছড়িয়ে পড়ে— এটাই মূল ভাবনা। সমস্তই আলোকিত হচ্ছে। চৈতন্য যেখানে ব্যাপ্ত হয় সেটা লোক— ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ। একদিকের লোক ভূঃ, আমরা, আমাদের আধার। আরেকদিকে দ্যৌঃ। ভূঃ পৃথিবী, আধার, আমাদের মা। দ্যৌঃ পিতা, তিনটি লোকের মধ্যে দুটি— ভূঃ আর দ্যৌঃ-কে দেবতা বলা হয়েছে। ভুবঃ অন্তরিক্ষ লোক, কিন্তু তাকে দেবতা বলা হয়নি। দ্যাবাপৃথিবী একাধারে লোক এবং দেবতা। পৃথিবী-প্রথিত-পৃথা—বিস্তৃত। একদিকে পৃথিবী মা-টি। আমাদের মা। সেই মায়ের বুকেই আমরা চলছি, কিন্তু মাথা তুলছি দ্যৌঃ পিতার দিকে। আলো ছড়িয়ে পড়ছে লোকে। লোক আবার দেবতার সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে। √লুক্ বা রুক্ >Lat. lucere lucent, Germ. licht Eng. light, অর্থ to shine < দিব ধাতুর অর্থও তাই, ঝলমল করা। একদিকে দেবতা আরেকদিকে লোক। ক্ষেত্র হচ্ছে লোক। দেবতা তাকে প্রকাশ করছেন। দেবতাই সব হয়েছেন, আত্মাই সব হয়েছেন। আকাশ লোক হিসাবে পরম ব্যোম। আবার দ্যৌস্ পিতাও। এর থেকে রোমকদের জুপিটার, গ্রীকদের জিউস্, য়ুরোপীয়দের আদিদেবতা।

ব্রহ্ম থেকে আকাশ— একথা উপনিষদে আছে। কিন্তু বেদে আছে দ্যৌ। উপনিষদে আকাশ। আকাশ থেকে বায়ু। বায়ুও বেদের আরেক দেবতা। বায়ুকে বলা হয় কেশী।

ত্রয়ঃ কেশিনঃ ঋতুথা ৱি চক্ষতে সংৱত্সরে ৱপত এক এষাম্ ঋ. ১।১৬৪।৪৪। প্রথম কেশী অগ্নি, তাঁর শিখায়। আদিত্য কেশী তাঁর আলোয়, যা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। মাঝখানে বায়ু, যাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা দেখি ঝড়কে, যা মেঘগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটা বায়ুর কেশ। বায়ু তখন রুদ্ররূপের মধ্যস্থান দেবতা। বায়ুতেই ব্রহ্মসংস্পর্শ হয়। মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও। এই উপনিষদের শান্তিপাঠে তাই বলা হয়েছে— নমস্তে ৱায়ো ত্বমেৱ প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। অন্তরিক্ষের দেবতা বায়ু। পৃথিবী থেকে দ্যুলোকে চৈতন্য ঊর্ধ্বায়িত হচ্ছে, মাঝখানে যেন এলোমেলো। সেজন্য মাঝখানে বহু দেবতার প্রকাশ। বহু দেবতারূপেই তার উল্লেখ আছে যাগযজ্ঞের মধ্যে। স্বিষ্টকৃৎ— সু ইষ্টকৃৎ, রুদ্ররূপে। একদিকে পৃথিবী, অন্যদিকে দ্যৌ— দুদিকেই যেন এক, অদ্বৈত। অন্তরিক্ষ বিলাসের স্থান। সেখানে বহু দেবতা। অন্তরিক্ষ দেবতাধীষ্ট, কিন্তু দেবতা নয়। পৃথিবী দেবী, কিন্তু দ্যৌ দেব। তাঁরাই আমাদের মাতা পিতা। অন্তরিক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু। নিরুক্তে অন্তরিক্ষস্থানীয় দেবতার নিরূপণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— প্রথমগামী ৱায়ুর্বা ইন্দ্রো ৱা। বায়ুর বর্ণনা প্রথমে, পরে ইন্দ্রের। বায়ু ও ইন্দ্র অন্তরিক্ষের দুই প্রান্তে। পৃথিবীর কাছে বায়ু, দ্যুলোকের কাছে,উপান্তে ইন্দ্র। তাই ইন্দ্রের সঙ্গে সূর্যের, বিষ্ণুর যোগ। বায়ুর সঙ্গে পৃথিবীর যোগ। এই বায়ু কেশী। এইভাবে তিন কেশী হলেন অগ্নি, বায়ু, আদিত্য।

বায়ুর পরের দেবতা অগ্নি। বায়ু থেকে অগ্নি। অগ্নি থেকে জল। অপ্-এরা ঋগ্বেদের দেবতা। দেৱীর্ আপঃ। দিব্য সলিল। অদ্ভ্যঃ পৃথিৱী। জল থেকে পৃথিবী। তিনিও দেবতা। সংহিতার ভাবে বুঝলে পঞ্চভূতের কথা আসে না। সেদিক থেকে দেখলে ব্রহ্ম বা আত্মা বা দ্যৌঃ থেকে প্রথম উৎপন্ন হয় আলোঝলমল আকাশ। তার থেকে বায়ু। তাঁরই সত্তা ঝড়ের মতো বয়ে চলেছে। 'আ রভমানা ভুৱনানি ৱিশ্বা' দেবীসূক্ত, ঋ. ১০।১২৫।৮। এই ঝড়কে বৈদিকরা বলতেন মরুদ্গণ। √মৃজ্ = to shine, to dazzle, ঝলমল করা। মরুদ্গণও দেবতা। শুধু আকাশ হলে প্রশান্ত আলোর ব্যাপ্তি। সেটা শান্তি। আকাশ স্পন্দিত হলে বায়ু— মরুদ্গণ। বায়ুকেই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণ বলা হয়েছে। আকাশ চৈতন্য, মরুদ্গণ বায়ু-প্রাণ, আকাশে স্পন্দিত শক্তি। দৌস্পিতা থেকে আকাশ। সেই আকাশের শক্তি— স্পন্দ বায়ু। তার থেকে অগ্নি। এই অগ্নি; বৈশ্বানর। ঋগ্বেদে কিছু সূক্ত আছে, যেখানে দেবতা হচ্ছেন অগ্নির্বা বৈশ্বানরো বা সূর্যো বা। এই অগ্নিই বৈস্বানর অগ্নি; সর্বব্যাপী তিনিই সূর্য। অগ্নিই সূর্য হওয়ার অর্থ হল আত্মাই ব্রহ্ম। জ্যোতির্ময় বায়ু, প্রাণ হতে হল অগ্নি। অর্থাৎ সূর্য থেকেই অগ্নি। ছবিটা হল এইরকম। জ্যোতিতে ঝলমল আকাশ, আকাশ স্পন্দিত হলে বায়ু, প্রাণ। সে বায়ু বা প্রাণ 'বৃহরশ্মীন্', 'সমূহ তেজ' (ঈশ) হলে তখন হবে সূর্যবিম্ব।

এই সূর্যবিন্দু থেকে আলোর ঝড়— আলো-জল-ঝড় সবই যেন বেরিয়ে আসছে। এটাই দেবীঃ আপঃ। সোজা কথা হল, আদিত্য থেকে বায়ুর ভিতর দিয়ে বৃষ্টি হয়। তার বর্ষণই দেবীরাপঃ। এটা সৃষ্টির চতুর্থ স্তর। এই আপঃ সংহত হলে তখন অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে— পৃথিবী কিরকম? জ্যোতির্ময় জলের উপর দেবীর্ আপের উপর সরের মত পড়ে রয়েছে।

সংহিতার ভাব, দেখার দৃষ্টি অন্যরকম। দেবতাতত্ত্ব না বুঝলে পঞ্চভূতবাদ বোঝা যাবে না।

এটাকেই বিশ্লেষণী (analytical) দৃষ্টিতে দেখি পঞ্চমহাভূতের মূলে। বিশ্লেষণ ভিতরের অনুভূতি থেকে আসে। প্রথমে নিরুপাধিক চৈতন্যের অনুভব হয়। সেটাই সাংখ্যের ভাব— সৃষ্টি আমার মধ্যে কিভাবে হয়। প্রথম আকাশ-চেতনা জাগে। আকাশশরীরং ব্রহ্ম। শুধু সত্তাতেই সন্মাত্রেই থাকা। আমার চৈতন্য শুধু অনন্ত সত্তামাত্র। এটা আকাশবৎ। এই ভাবনা পরে এই উপনিষদে পাব। উপনিষদ যেন সাংখ্যের মত কথা বলছেন। নিস্পন্দ চৈতন্যের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল। এখানেই সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে পার্থক্য। বেদান্ত বলছেন, এগুলো linked পরস্পরযুক্ত। আকাশ থেকেই বায়ু যখন হচ্ছে, তখন একটা তত্ত্ব আরেকটাতে পরিণত হচ্ছে— আকাশাত্ বায়ুঃ। সাংখ্য এই মত গ্রহণ করে না। তাঁরা গোড়াতেই আত্মাকে পৃথক্‌ভাবে রাখেন— পুরুষরূপে। পুরুষের কোন পরিণাম হয় না। পুরুষ প্রকৃতিতে পরিণত হয় না। পরিণাম শুধু প্রকৃতিরই হয়। প্রকৃতিই সবকিছুতে পরিণত হন। বেদান্ত মতে একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। ব্রহ্মই সবকিছুতে পরিণত হন। সাংখ্যমতে আকাশ বা পুরুষ পরিণত হয় না, প্রকৃতি হয়। এটা একটা সাধনার ধারা— বিবেক ধারা। বিবিক্ত না হলে সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝা যায় না। অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্— তিনি প্রকৃতি বা জগৎকে ছাপিয়ে, অতিক্রম করে আছেন। আলাদা না হলে আবার জড়িয়ে যাবে। তাই একটা incision (চিড়) দেখা দিল। ফলে সাংখ্যে দ্বৈতবাদ দেখা দিল। নির্বাণ-প্রলয়, ন পুনরাবর্ততে। এটাই তাদের লক্ষ্য। অসম্ভূতি-অসৎ, এটা মুনিপন্থার লক্ষ্য। অসম্ভূতি, অসৎ থেকেই সম্ভূতি, সৎ হচ্ছে, এটা ঋষিধারা। সাংখ্যের সাধনা হল আকাশবৎ থাকা। তখন দেখি পুরুষের সন্নিকর্ষে, তাঁর দৃষ্টিতে প্রকৃতি কাজ করছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন— কাছিম ডিম পেড়ে আসে চড়াতে, দৃষ্টি দিয়েই ডিম ফুটিয়ে দেয়— এটা একটা গোঁজামিল। সাংখ্যের বিবেক দিয়ে শঙ্করের বিবর্তবাদের সৃষ্টি হয়েছে। আচার্য শঙ্কর ঋষিদের ব্রহ্মবাদ আর সাংখ্যের বিবেক দুটোই মিলিয়ে দিয়েছেন। সাংখ্যধারায় যে অনুভব, সেটা প্রাচীন সাংখ্য বা গীতার সাংখ্যের মত। চেতনা নিস্পন্দ সমাধিস্থ, তাতে প্রস্পন্দ হল। অস্পন্দে প্রথমঃ স্পন্দঃ। কি করে হল কেউ বলতে পারে না। আদিত্যের ক্ষোভের মত— প্রাণ এজতি

নিঃসৃতম্। এটা তাঁর কাম বা ইচ্ছা। ইচ্ছাই স্পন্দ। তাতেই প্র-জাতি, সব কিছু হচ্ছে। স্পন্দ হল বায়ু। সেটিই প্রকৃতি, শক্তি। প্রকৃতি নিত্য পরিণামিণী। বায়ু সব সময় প্রবাহিত। তাই আকাশ পুরুষ, বায়ু প্রকৃতি।

বায়ু থেকে অগ্নি। এটা সাংখ্য মানবে না। তারপরে সবই প্রকৃতির পরিণাম। অগ্নি যদি আদিত্য বা সূর্যবিম্ব হয়, তাহলে সেটা সাংখ্যের মহত্ তত্ত্ব— beyond evolution. প্রকৃতি তখন ঋতং বৃহৎ। যখন পরিণাম শুরু হবে তখন ঋতং মহৎ concentrated consciousness সমূহিত চেতনা। শূন্যবৎ চেতনা। তাতে সূক্ষ্মতম প্রাণস্পন্দ— এটা বায়ুর ক্রিয়া। তার পরিণামে চেতনা সংহত হলে এটা জ্যোতির্ময় পিণ্ডে luminous orb-এ পরিণত হয়। এটাই আদিত্য—অগ্নি। এটাকেই অনেকে আত্মা বলে মনে করেন। এটাই সাংখ্যের মহত্তত্ত্ব। তার থেকে উৎপন্ন হল আপঃ। সাংখ্যমতে প্রাণন মহতের প্রথম পরিণাম। সেজন্য মহৎ থেকে bodily —সশরীরে সোজাসুজি বেরিয়ে এল প্রাণ। অহম্ থেকে আরম্ভ করে ভূতসূক্ষ্ম পর্যন্ত বেদে বর্ণিত হয়েছে প্রাণরূপে। সাংখ্যে মহৎ হল বেদের হিরণ্যগর্ভ। এটা সমষ্টিপ্রাণ। তার মধ্যে তিনটি গুণের বিক্ষোভ— সত্ত্ব রজঃ তমঃ। সত্ত্ব হল প্রকাশ, light, রজঃ চাঞ্চল্য, movement, action. তমঃ জড়তা ঘনতা স্থিতি স্থিরতা— তার দ্বারাই বস্তুর পরিণাম। সাংখ্যে বলা হয়— মহতে দেখা দিল যে অহম্, মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, তারা সব প্রাণের সাত্ত্বিক অংশে প্রকট হয়। এইসব দার্শনিক বিচার পুরাণেও পাওয়া যায়া। প্রাণ যখন জ্যোতিঃ স্বরূপ তখন আমার অহং শুদ্ধ সাত্ত্বিক। তারপর প্রাণের বিকার উপস্থিত হলে তার থেকে মন, আর মন থেকে জ্ঞানেন্দ্রিয়। সবই আলোর ধর্ম। আমি আলো দেখছি। আমিই অহংতত্ত্ব। দেখা জ্ঞানের কাজ। বোধ হল মনের কাজ। এ পর্যন্ত সাত্ত্বিক প্রাণের প্রকাশ। তারপরে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সেটা রজোগুণের ব্যাপার। রজোগুণ থেকে আসে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। পরে ভূতবর্গ। এটা তমোগুণের ব্যাপার। আলো সেখানে distorted । বাইরে যেটা দেখছি সেটাই সব নয়। ভূতসূক্ষ্মের কথা বলা হয়। এটা খুব বড় কথা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের মূলে অতীন্দ্রিয় কিছু ধরা হয়েছে। যেমন-জল। তার উপাদান দ্বিবিধ। গ্যাস বা বায়ু। জল solid, ঘন। এটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আরেকটা অতীন্দ্রিয়। এগুলো ভূতসূক্ষ্ম। কিন্তু রজঃ-অংশ। এটাই আপঃ। তাই বেদে বলা হয়েছে— আপো বৈ প্রাণাঃ। অপ্ থেকে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবী। যেখানে তমোগুণের প্রকাশ স্পষ্ট। এটাই সাংখ্যধারা। এভাবে বেদান্ত ও সাংখ্যধারা মিলিয়ে পঞ্চ মহাভূতবাদের সৃষ্টি।

এতক্ষণ পর্যন্ত আকাশাদি সম্পর্কে অধিদৈবত ও অধ্যাত্মভাবে আলোচনা করা হল। এখন অধিভূতভাবে করা হচ্ছে।

তস্মাদ্বা এতস্মাত্ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ —সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্ স্বরূপ ব্রহ্মের দ্বারা অথবা এই আত্মার দ্বারা— ব্রহ্ম আর আত্মার একাত্মতা 'অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম' 'তত্ সত্যং স আত্মা' (ছা ৬।৮।১৬) ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। সেই সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্মাত্মার দ্বারা অথবা তার মধ্যেই প্রথম সম্ভূতি বা সৃষ্টি হল আকাশ। আকাশ, যা সব মূর্ত পদার্থকে স্থান (space) অবকাশ দিচ্ছে। আকাশের গুণ শব্দ। এই আকাশ থেকে এল বায়ু, নিজের গুণ স্পর্শের সঙ্গে আকাশের গুণ শব্দকে যুক্ত করে। বায়ুর অনুভব স্পর্শে। আর বায়ুর তরঙ্গই শব্দের প্রসার ঘটায়। এই বায়ু থেকে অগ্নি সম্ভূত হল— নিজের গুণ রূপ ও আগের দুটি গুণ শব্দ ও স্পর্শকে নিয়ে। বেদে অগ্নিকে রূপকৃৎ বলা হয়েছে। অগ্নি থেকে জলের সৃষ্টি হল। তার নিজের গুণ রস আর আগের রূপ-স্পর্শ-শব্দ এই তিন গুণ নিয়ে। শেষে জল থেকে সৃষ্টি হল পৃথিবীর— নিজের গুণ গন্ধ সহ অন্য রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দ এই চার গুণ নিয়ে। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রাই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্মরূপ। আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা এই পঞ্চ তন্মাত্রকে অনুভব করি। এইভাবে সূক্ষ্ম থেকে স্থূল পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দর্শন বলে চৈতন্য, সূক্ষ্ম ভাব থেকেই স্থূলের সৃষ্টি। পাশ্চাত্ত্য দর্শন তার বিপরীত। স্থূল থেকেই সূক্ষ্ম। তারপর—

পৃথিব্যা ওষধয়... ... ... স বা এষ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ। সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম বা আত্মা থেকে সৃষ্টি বা আত্মসৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এই সৃষ্টি কিন্তু মিথ্যা বা অসত্য নয়। সম্পূর্ণভাবে সত্য ও চৈতন্যময়। কেননা, তিনি নিজেই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন, প্রত্যেক বস্তু বা জীবের রসরূপে (sap)। এই উপনিষদেই পরে ঋষি বলছেন— রসো বৈ সঃ, ২।৭। এখানে কেবল অন্নময় পুরুষ না বলে অন্নরসময় পুরুষ বলা হয়েছে। অন্য দৃষ্টিতে দেখলে তিনি যেমন স্বরূপে পূর্ণ, তেমনি তাঁর সৃষ্টিতেও পূর্ণ। পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাত্ পূর্ণমুদচ্যতে ইত্যাদি শ্রুতির প্রমাণে বলা যায়— সৃষ্টির প্রত্যেক কণা পর্যন্ত সব কিছুই সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম বা আত্মাই। অবশ্য বলতে পারি তা latent বা অব্যক্তভাবে। আকাশ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই অনন্ত চৈতন্যময় কণার সৃষ্টি হল। কবে সেটা হল কেউ তা বলতে পারবে না কোনদিন। কণা-অণুর অমরত্বের indestructibility of matter-এর কথা আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে। তারপরে combination and recombination-সতত সংঘটন, বিঘটন আর পুনর্ঘটন প্রক্রিয়াই চলছে— কেবল নামরূপ পাল্টাচ্ছে। এই নামরূপের সৃষ্টিই তাঁর মায়া— অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি। সান্ত, কিন্তু মিথ্যা নয়। এই মায়ার খেলা খেলতে তিনি কবে শুরু করেছেন, কেউ জানে না। শুধু বাইরের নামরূপ থেকে আমরা চোখের সামনে যা কিছু দেখছি তার সম্বন্ধে অনুমান করতে পারি, কিভাবে বা

কত সময় ধরে সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল। তারপরে এইরূপ হল, এইরূপ হল ইত্যাদি বলি। কিন্তু এইরূপই কেন হল, অন্যরূপ হল না কেন, তার উত্তর তো আমরা দিতে পারব না। আমাদের চৈতন্যের উৎক্রান্তি (উত্তরণের) জন্য এই প্রশ্নের প্রয়োজনই নেই। সেজন্যই বেদের ঋষিরা পুরুষের সৃষ্টির সঙ্গে সে তার উৎক্রান্তির বাইরের ধারার দিকে না গিয়ে অন্তরের— চৈতন্যের উৎক্রান্তি পথ গ্রহণ করেছেন। তার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সাধনার কথা বলেছেন। ম য বা পুরুষের সৃষ্টিতে ব্রহ্ম যেন নিজেই সন্তুষ্ট হয়ে বললেন— সুকৃতমিদম্। ঐতরেয় উপনিষদে আছে— পুরুষো বাব সুকৃতম্, ১।২।৩। বাইবেলেও আছে, God created man after his own image.

ওষধি ও অন্নের সৃষ্টির পরেই, সোজা পুরুষের সৃষ্টিতে যাচ্ছেন। যিনি সাধনা করে সেই সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম বা আত্মার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করতে পারেন— ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি, তাঁর কথাতেই এসেছেন। যে সৃষ্টিকে আমরা দেখছি, অনুভব করছি, সেই সৃষ্টিতে অন্নরসময় পুরুষই— মানুষই, ব্রহ্মবিৎ— সত্যময়, জ্ঞানময়, আনন্দময় হতে পারেন। সেই সাধনার শক্তি— সেই বিবেকজ্ঞান একমাত্র মানুষের মধ্যেই আছে। সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বর সর্বজীবের মধ্যে সমানভাবেই আছেন— পশু পক্ষী মানুষ সবার মধ্যে। যো দেৱো অগ্নৌ যো অপসু যো ৱিশ্বং ভুৱনমাৱিৱেশ। য ওষধিষু যো ৱনস্পতিষু... ... ..., শ্বে. ২।১৭; ঈশ্বরঃ সর্ৱভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি, গীতা ১৮।৬১; তদ্ অন্তর্ অস্য সর্বস্য, ঈশ. ৫। কিন্তু তাঁকে জানার অনুভব করার শক্তি মানুষকেই দেওয়া হয়েছে। তাই এরপরে মানুষের অন্তরে— এই অন্নরসময় পুরুষের অন্তরে আর কত ভাবে আর কত স্তরে তিনি রয়েছেন, তাঁর কথা ও তাঁকে জানার, পাবার সাধনার কথা উপনিষদ অতি বিপুলভাবে বলে চলেছেন।

উপনিষদের ঋষি অন্নরসময় পুরুষের কথা বলছেন, অন্নরসময় কোষের কথা নয়। কোষের কথা পরবর্তীযুগে আনা হয়েছে। এটা সাংখ্যবাদীদের কথা। আত্মা আর দেহের মধ্যে যখন স্পষ্ট অলঙ্ঘ্য অনতিক্রম্য পার্থক্য করা হয়েছে। স্পষ্ট নেতিবাদ— আত্মা দেহ নয়, প্রাণ নয়, মন নয়, এসব কথা সাংখ্যের। চৈতন্যময় পুরুষ আর জড় অচৈতন্য প্রকৃতি— দুটি সম্পূর্ণরূপে আলাদা, এভাব সাংখ্যের। কিন্তু সবই চৈতন্যময়— সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম— এসব কথা বেদান্তীদের। ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ইত্যাদি প্রাচীন উপনিষদগুলিতে পুরুষের কথাই প্রবল। 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি'—কঠ ২।১।১২। এখানে অন্নময় থেকে আনন্দময় সবাই পুরুষ। পুরুষঃ— পুরে শেতে। দেহ এখানে ব্রহ্মপুর। পুর্+উষ্, √উষ্ to shine ঝলমল করা। আবার √পুর্— to fill up। জ্যোতি-আলো-চৈতন্যময় যে সত্তা, তাই পুরুষ।

যা আবিষ্ট হয়ে সমস্ত কিছু উদ্ভাসিত করে। পরের অনুবাকেই আমরা পাব, অন্নঃ সর্বৌষধম্ উচ্যতে। পুরুষ আর ওষধি দুয়ের মধ্যেই উষ্ ধাতু অন্বিত আছে। ওষধি <√উষ্ আলো, উষার আলো যাতে নিহিত আছে ধাতু ধা। প্রাণের প্রথম প্রকাশ। জড়ে আলো প্রবিষ্ট বা প্রকট হল। এই ওষধি রূপান্তরিত হয়েছে অন্নে। ওষধি চিৎশক্তিকে ফুটিয়ে তুলছে। সমস্ত অন্নই চিন্ময়। প্রসাদ বলতে আমরা যা বুঝি। অন্ন আমার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করবে। অন্নই ব্রহ্ম— এটা বুঝতে হবে। বিরাট দৃষ্টিতে সব দেখতে হবে। ফলে অন্ন রূপান্তরিত হবে অন্নাদের শক্তিতে, চৈতন্য। অন্নই অন্নাদ হয়ে সর্ব অন্নকে গ্রহণ করে। ছান্দোগ্যে প্রাণাগ্নিহোত্রে এই ধারণা স্পষ্ট করা হয়েছে। Matter is transformed into life, mind and spirit. শ্রীঅরবিন্দের উক্তি— This life shall become Divine. তাঁর Life Divine-এর মূলে এই মূল ভাবনাই প্রকাশ পেয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়— অন্নময় পুরুষ থেকে আনন্দময় পুরুষের উৎক্রান্তি ascent–evolution—তৈ. উপনিষদের এই ভাবধারাই শ্রীঅরবিন্দের Life Divine-এর দর্শনের মূল। বিজ্ঞানানন্দময় পুরুষের এই জীবনে অভিব্যক্তিই তাঁর অতিমানস যোগের, তাঁর পূর্ণযোগের লক্ষ্য।

অন্নময় পুরুষ থেকে আনন্দময় পুরুষ পর্যন্ত মানবদেহকে পাখীর উপমা দিয়ে বোঝানো হয়েছে। এই পাখী যেন চলেছে আদিত্যের দিকে। এটা বৈদিক সুপর্ণের উপমা। অগ্নিচয়নের বেদিও ইষ্টক দিয়ে পাখীর আকারে তৈরি করা হোত। যজ্ঞে ঋত্বিকরা পাখীর ওড়ার অভিনয় করে দোলায় উঠতেন। যেন তাঁরাই সূর্য, আকাশে দিব্য সুপর্ণ হয়ে উড়ছেন। যজ্ঞে হোতা এবং তাঁর সহকারীরা উড়ু উড়ু পাখীর ভঙ্গীতে বসে প্রাতরনুবাক পাঠ করতেন। সুপর্ণ বা হংস আধিভৌতিক দৃষ্টিতে যাকে বলি সূর্য, তাঁকেই বলা হয়েছে— ইন্দ্রং মিত্রং ৱরুণম্ অগ্নিম্ আহুঃ অথো দিৱ্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্ (ঋ. ১।১৬৪।৪৬)। একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রম্ আৱিৱেশ স ইদং বিশ্বং ভুৱনং ৱি চষ্টে, ঋ. ১০।১১৪।৪। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই পাখীই আমার অন্তর-পুরুষ। এই উপনিষদেই পরে বলা হবে, যিনি এই পুরুষে অর্থাৎ জীবে এবং যিনি আদিত্যে, তিনি একই, ২।৮।৫; ৩।১০।৪।

অন্নময় পুরুষরূপী যে পাখী, সে আমার এই মানবদেহই। আমার মস্তকই তার শির। আমার দক্ষিণ বাহুই তার দক্ষিণ পক্ষ। উত্তর বা বাম বাহু তার উত্তর পক্ষ। দেহের মধ্যভাগ কণ্ঠ থেকে নাভি পর্যন্ত তার মধ্যভাগ। শ্রুতিতেও আছে— মধ্যম্ হি এষাম্ অঙ্গানাম্ আত্মা। দেহের নাভির নীচের ভাগ তার পুচ্ছ এবং সেটাই তার প্রতিষ্ঠা। ২।১।৩।

দ্বিতীয় অনুবাক

অন্নাদ্ বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাঃ চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ। অথো অন্নেন এব জীবন্তি। অথ এনদ্ অপি যন্তি অন্ততঃ। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাত্ সর্বৌষধম্ উচ্যতে। সর্বং বৈ তে অন্নম্ আপ্নুবন্তি। যে অন্নং ব্রহ্ম উপাসতে। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাত্ সর্বৌষধম্ উচ্যতে। অন্নাত্ ভূতানি জায়ন্তে। জাতানি অন্নেন বর্ধন্তে। অদ্যতে অত্তি চ ভূতানি। তস্মাত্ অন্নং তদুচ্যতে।

এই পৃথিবীকে আশ্রয় করে যত জীব আছে, তারা সবাই অন্ন থেকেই জাত হয় এবং অন্নের দ্বারাই জীবনধারণ করে। অন্তে এই অন্নেই লীন হয়। তাই অন্নই সর্বভূতের জ্যেষ্ঠ, অর্থাৎ অগ্রজ হয়ে উৎপন্ন হয়েছে। তাই অন্নকে সর্বৌষধ বলা হয়। যাঁরা অন্নকে ব্রহ্ম বলে উপাসনা করেন, তাঁরা সমুদয় অন্ন লাভ করেন। অন্নই সর্বভূতের অগ্রজ। তাই তাকে সকল প্রাণীর ঔষধস্বরূপ বলা হয়। অন্ন থেকেই ভূতবর্গের জন্ম হয়, এবং জন্মাবার পর অন্নের দ্বারা বর্ধিত হয়। অন্ন ভূতবর্গের দ্বারা ভক্ষিত এবং স্বয়ং ভূতবর্গকে ভক্ষণ করে বলে তাকে অন্ন বলা হয়।

অন্ন থেকেই সবকিছুর, সর্বজীবের জন্ম। কারণ, অন্ন সর্বৌষধ। ব্রহ্মের জ্যোতি, আলো তার মধ্যে প্রবিষ্ট, নিবিষ্ট আছে। তাই অন্নও চৈতন্যময়। প্রশ্নোপনিষদে আছে— অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ, ততো হ বৈ তদ্‌রেতঃ। তস্মাদ্ ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে (১।১৪)। —অন্নই প্রজাপতি। ভক্ষিত অন্ন থেকেই শুক্র— বীর্য উৎপন্ন হয়, তার থেকেই এই সকল জীব উৎপন্ন হয়।

বহির্দৃষ্টিতে অন্ন জড় matter। কিন্তু matter থেকে অন্ন সংজ্ঞাটি বেশি ব্যঞ্জনাময়। উপনিষৎ সত্তাকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। একভাগ অন্ন, আরেকভাগ অন্নাদ। অন্নাদ অন্নকে আত্মসাৎ করে। আবার অন্নই রূপান্তরিত হয় অন্নাদে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, ভুক্ত অন্নের অণিষ্ঠ, অণুতম ভাগ মনে, চৈতন্যে পরিণত হয়। —ছা. ৬।৫। এই আত্তীকরণের, assimilation-এর পরম্পরাই হল সৃষ্টির মাঝে ঊর্ধ্ব পরিণামের উৎক্রান্তির ধারা। সুতরাং অন্ন শুধু জড় নয়, চৈতন্যে রূপান্তরিত হবার সামর্থ্যযুক্ত জড়। তাকে আশ্রয় করে চৈতন্যের ক্রমিক উৎকর্ষই সৃষ্টির রহস্য। অর্থাৎ নিরেট জড়ের মধ্যে পূর্ণ চৈতন্য লুকিয়ে আছে বলেই জড় থেকে চৈতন্যের অভিব্যক্তি ঘটছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলতেন— আগে involution, অনুপ্রবেশ, তার পরে evolution, ক্রমবিকাশ বা উৎক্রান্তি। আগে (জড় বা) অন্নে ব্রহ্মের বা পরমাত্মার অনুপ্রবেশ, তার পরে অন্ন থেকে প্রাণ মন বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্মের ক্রমবিকাশ বা

উৎক্রান্তি। আমরা evolution বা উৎক্রান্তিকে কিছুটা দেখতে পাই, অনুপ্রবেশকে দেখি না, জানি না, শুধু অনুমেয়। অন্ন থেকে আত্মা পর্যন্ত— অন্নরসময় পুরুষ থেকে আনন্দময় পুরুষ পর্যন্ত এই ঊর্ধ্ব পরিণামের ক্রমটি এই উপনিষদে বিবৃত হয়েছে। জীব অন্নাদ, কিন্তু পরম অন্নাদ হলেন সেই পরম চৈতন্য। তু. দেবীসূক্ত— ময়া সো অন্নম্ অত্তি ঋ. ১০।১২৫।৪। প্রসিদ্ধ উক্তি আছে— জীবো জীবেন জীবতি। অন্নই ভূতের জন্মের কারণ। অন্ন ভক্ষণ করেই ভূতসমূহ বর্ধিত হয় আর পরিণামে অন্নেই লীন হয়, ঠিক ব্রহ্মের মত। সেইজন্য ছান্দোগ্যে বলা হয়েছে— সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি। অর্থাৎ এখানে যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম, তাঁর থেকেই 'জ' জন্ম, তাঁতেই লয় 'ল' এবং অনন্ প্রাণন্ করে, 'অন্' অর্থাৎ বাঁচে। অন্ন— √অদ্ খাওয়া, যে খায় এবং যা খাদ্য।

> **তস্মাত্ ৱৈ এতস্মাত্ অন্নরসময়াত্ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা প্রাণময়ঃ। তেন এষ পূর্ণঃ। স ৱৈ এষঃ পুরুষৱিধঃ এৱ। তস্য পুরুষৱিধতাম্ অনু অয়ম্ পুরুষৱিধঃ। তস্য প্রাণ এৱ শিরঃ। ৱ্যানঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপানঃ উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশঃ আত্মা। পৃথিৱী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । তদপি এষ শ্লোকঃ ভৱতি। ২।২**

সেই ব্রহ্ম বা এই অন্নরসময় দেহ থেকে ভিন্ন তারও অন্তরে প্রাণময় আত্মা আছেন। তাঁর দ্বারা এই অন্নরসময় আত্মা পরিপূর্ণ। সেই প্রাণময় আত্মা পুরুষাকার। আগের অন্নরসময় পুরুষাকারের অনুযায়ী ইনিও প্রাণময় ও পুরুষাকার। প্রাণবায়ু সেই প্রাণময় পুরুষের মস্তক। ব্যান বায়ু তার দক্ষিণ পক্ষ। অপান বায়ু বাম পক্ষ। আকাশ তার আত্মা বা মধ্যভাগ। পৃথিবী তার পুচ্ছ, যাতে তিনি প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে এই শ্লোক (কথা) আছে— ২।২।

এখানেও তস্মাদ্ বৈ এতস্মাদ্ অন্নরসময়াত্ আত্মনঃ— হওয়া উচিত ছিল। শঙ্করাচার্য আগাগোড়াই 'পিণ্ডাত্' বলেছেন। কিন্তু আমরা 'আত্মনঃ'ই নেব। অন্তরপুরুষ বা আত্মাকে পেতে হলে অন্তর্মুখী হতে হবে। যেহেতু তিনি আলো। প্রাণময় পুরুষের ব্যাপ্তি অন্নরসময় পুরুষ থেকে অনেক বেশী। তিনি ভিতরেও আছেন এবং সেই সঙ্গে সর্বব্যাপীও বটে। 'আত্মা'র কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ। দেহকোষে আবদ্ধ আত্মা প্রাণময়। পঞ্চভূত হিসাবে অন্ন পৃথিবী, প্রাণ আপঃ বা life-force, জীবনীশক্তি। এর মধ্যে যে পুরুষ আছেন, তিনি প্রাণময় কিন্তু অন্নরসে আবিষ্ট। তারা পৃথক্, এই ভাবনা ঠিক নয়। তেন এযঃ পূর্ণঃ। প্রাণময়-পুরুষেণ অন্নরসময়পুরুষঃ পূর্ণঃ। দেহ থেকে প্রাণ আরো মুক্ত। প্রাণ থেকে মন আরো বেশী মুক্ত। আর বিজ্ঞান মন থেকেও অধিক মুক্ত। অনু

অয়ং পুরুষবিধঃ— ইনিও, এই প্রাণময় পুরুষও অন্নরসপুরুষের মতো। দেহের একটি রূপরেখা আছে। তার মতো আলোরও রূপরেখা আছে। জৈনেরা এই ভাব নিয়েছেন। আত্মার পরিমাণ কি? তিনি সর্বব্যাপী ও বৃহৎ। জৈনেরা মধ্যম পরিমাণী। ন্যায়-বৈশেষিকরা অণুবাদী। আমরা সব নেব।

তস্য পুরুষবিধতাম্ অনু অয়ং পুরুষবিধঃ অর্থাৎ অন্নরসময়পুরুষস্য অনু। এই প্রাণময় পুরুষের রূপরেখাও আগের অন্নরসময় পুরুষের রূপরেখার অনুরূপ। পাখীর মত। আগে যেমন পাখী ছিল, এটাও সেই রকম। তিনি চিন্ময় পাখী— প্রাণপাখী। মস্তক আর পুচ্ছ তার দুটি প্রান্ত। পুচ্ছ নিচের দিকে টানে। প্রাণময় পুরুষের মস্তক মুখ্য প্রাণ, মুখের মধ্যে যে প্রাণ, যে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। পাখী যখন ওড়ে, তখন মাথাটি সামনের দিকে থাকে। তাই মুখ্য প্রাণ দিশারী। এখানে পঞ্চ প্রাণের পরিবর্তে তিনটি প্রাণের কথা বলা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের মতো। ঋগ্বেদে দুটি প্রাণের কথা আছে— প্রাণ ও অপান। অথর্ববেদে কিন্তু পঞ্চ প্রাণের কথা পাওয়া যায়। এখানে সাধনার সুবিধার জন্য তিনটি প্রাণের কথা বলা হয়েছে— প্রাণ, অপান ও ব্যান। প্রাণ ও অপানের মধ্যে একটা polarity উভয়প্রান্তিকতা থাকে। এখানে তাই অপান পুচ্ছ হওয়া উচিত ছিল। তার বদলে অপানকে দক্ষিণ পক্ষ বলা হয়েছে। প্রাণ ও অপানকে মুখ্য বলে গ্রহণ করে দুটির মধ্যে সন্ধিস্থানে ব্যানকে রাখা হয়েছে। ছান্দোগ্যের মতে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাঝখানে যে কুম্ভক হয়, সেটাই ব্যান। পরে হঠযোগীরা সমস্ত শরীরব্যাপী প্রাণকেই ব্যান বলেছেন। বি+আন-'বি' ব্যাপ্তি। প্রাণ সামনের দিকে যায়। অপানকে দক্ষিণ পক্ষ বলা হয়েছে। দক্ষিণ হস্ত দক্ষতা— কর্মশক্তি বোঝায়। দক্ষম্ অপসম্ কর্মপ্রবণতা— এটাই দক্ষিণ পক্ষ। প্রাণ যদি দিশারী— জ্ঞান হয়, তাহলে অপান হল কর্ম। আর বিশ্রান্তির ভূমি হল ব্যান— বামপক্ষ। পিঙ্গলা দক্ষিণা নাড়ী, activity। আর ইড়া বামনাড়ী passivity। প্রথমটি সূর্য, অপরটি চন্দ্র। কর্মের চাঞ্চল্য আর বিশ্রান্তি হল এই দুই পক্ষ। প্রাণ দিশারী, pilot। প্রাণ জীবন আর অপান মৃত্যু। এখানে অপান আর ব্যানকে উল্টে দেওয়া হয়েছে। 'সমান' নাভিতে থাকে। আকাশ এখানে হবে উদান বায়ু— চিত্তকে যে ঊর্ধ্বমুখী করে। এ বিষয়ে প্রশ্নোপনিষদ প্রমাণ। সমান digestive function পরিপাক ক্রিয়ার সহায়ক। পৃথিবী এই প্রাণময় পুরুষের পুচ্ছ— প্রতিষ্ঠা। প্রাণের সঙ্গে পৃথিবীতত্ত্বের যোগ—সাম্য, balance হচ্ছে, তাই পৃথিবী এই প্রাণময় পুরুষের প্রতিষ্ঠা। পৃথিবী অন্নময় আর অন্নের সঙ্গে প্রাণের যোগ রয়েছে।

তৃতীয় অনুবাক

প্রাণং দেৱা অনু প্রাণন্তি। মনুষ্যাঃ পশৱঃ চ যে। প্রাণঃ হি ভূতানাম্ আয়ুঃ। তস্মাত্ সর্ৱায়ুষম্ উচ্যতে। সর্ৱম্ এৱ তে আয়ুঃ যন্তি। যে প্রাণং ব্রহ্ম উপাসতে। প্রাণঃ হি ভূতানাম্ আয়ুঃ। তস্মাত্ সর্ৱায়ুষম্ উচ্যতে ইতি।

এই মুখ্য প্রাণেরই অনুগত হয়ে সমস্ত দেবতা প্রাণন করেন, ক্রিয়াশীল হন। যত সব মনুষ্য আর পশু আছে, তারাও। প্রাণই সর্ব প্রাণীর আয়ু। সেই জন্য প্রাণকেই সকলের আয়ু বলা হয়। যাঁরা এই প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাঁরা পূর্ণ আয়ু লাভ করেন। কারণ, প্রাণই সর্বভূতের আয়ু, আর তাই তাকে 'সর্বায়ুষ' বলা হয়।

এই প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। বিশেষ করে তিন স্থানে— দেব, মনুষ্য আর পশুতে। আর এক স্থান হল উদ্ভিদ্। এখানে আগের তিনটিকে ধরা হয়েছে। কারণ প্রাণ প্রধান ভাবে প্রথম দেখা যায় পশুতে— 'পশবঃ বৈ প্রাণাঃ'।' মানুষের মধ্যেও পশু রয়েছে। অন্ন, প্রাণ ও মন মানুষের মধ্যে আছে। কিন্তু প্রাণ প্রধানভাবে পশুতে। আবার উৎকৃষ্ট প্রাণ আছে দেবতায়। মনোময় প্রাণ মনুষ্যে আর বিজ্ঞানময় প্রাণ দেবতায়। আনন্দময় প্রাণ ব্রহ্মে বা পরমাত্মায়, কিঞ্চিৎভাবে মনুষ্যেও।

প্রাণম্ অনু প্রাণন্তি— বিশ্বময় প্রাণ রয়েছে, সে-ই বিশ্বপ্রাণই মাতরিশ্বা বা মরুদ্‌গণ। মাতরিশ্বাতে তারই অভিব্যক্তি। সেই বিশ্বপ্রাণই সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন। তাই নিয়েই আমরা সবাই বেঁচে আছি। এটা ব্রহ্ম-ভাবনার অনুকূল। √য়ম্ সংকোচ ও বিস্তার। যম, নিয়ম, 'প্রাণায়াম। সাংখ্য ও বেদান্ত দুই ধারাতেই এটা বোঝা যায়। মহাপ্রাণের নিঃশ্বাসই সব প্রাণ। **প্রাণো ভূতানাম্ আয়ুঃ**— যা ব্যাকৃত, সবই ভূত all created life। প্রাণ আর আয়ুতে সূক্ষ্ম তফাৎ আছে। √ই গতি, তার থেকে আয়ু। অর্থ life movement জীবনের গতি। প্রাণ life energy, consciousness– চৈতন্যের ক্রিয়াই আয়ু। এটাই span of life, জীবনের বিস্তার। 'শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ'। ....প্রাণ জন্ম ও মৃত্যু দুটোকেই ধরে আছে। কিন্তু জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানের ব্যবধান হল আয়ু। একটি শান্তিমন্ত্রে আছে 'দেৱহিতং যদ্ আয়ুঃ'। প্রত্যেক ভূতের যে life span আয়ু, সেটা প্রাণেরই বিভূতি। সবার আয়ু— সর্বায়ুষম্ হল প্রাণ। আগের সর্বৌষধির মতন। যেমন অন্নগ্রহণ করছি, তখন সবার সঙ্গে খাচ্ছি, সর্বৌষধম্ হচ্ছি, সবার সঙ্গে একাকার হচ্ছি। তেমনি আমার অনন্ত প্রাণসমুদ্রে ভাসা— ঢেউয়ের মতন। অনন্ত প্রাণসমুদ্র থেকে প্রাণ নিচ্ছি আর ছাড়ছি, তখন প্রাণ ব্রহ্ম হয়ে যায়। আমার আয়ু সবার আয়ু, আমার প্রাণ সবার প্রাণ। তখন সবার আয়ু আমার মধ্যে এসে যায়। এই

হল 'প্রাণব্রহ্মোপাসনা'। যে প্রাণং ব্রহ্ম উপাসতে— এখানে শঙ্করাচার্যের ভাষ্য mystic— মরমীয়া অনুভবের অনুকূল। তু. যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মনি এব অনুপশ্যতি। সর্বভূতেষু চ আত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।। ঈশ, ৬। যেমন অন্ন ব্রহ্ম, তেমনি প্রাণ ব্রহ্ম।

তস্য এষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্বস্য। তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ। তেন এষ পূর্ণঃ। স বৈ এষঃ পুরুষবিধঃ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্ অনু অয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুঃ এব শিরঃ। ঋক্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সাম উত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশঃ আত্মা। অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং, প্রতিষ্ঠা। তদপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি। ২।৩

এই প্রাণময় পুরুষই সেই পূর্বোক্ত অন্নরসময় পুরুষের শরীরের অন্তঃস্থিত আত্মা। সেই প্রাণ বা এই প্রাণময় পুরুষের অন্তরে অন্য এক মনোময় আত্মা বা পুরুষ আছেন। সেই মনোময় আত্মার দ্বারা এই প্রাণময় আত্মা পূর্ণ। উক্ত মনোময় আত্মাও পুরুষাকার। তার পুরুষাকৃতিও আগেকার মতনই। অর্থাৎ পাখির মতন। যজুঃ মন্ত্রগুলি তার মস্তক; ঋক্ মন্ত্রগুলি তার দক্ষিণ পক্ষ ; সাম মন্ত্রগুলি তার উত্তর বা বাম পক্ষ ; আদেশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণগুলি তার আত্মা বা মধ্যভাগ। এবং অথর্ববেদ তার স্থিতি-সম্পাদক পুচ্ছ। এ বিষয়েও এরকম শ্লোক আছে। ২।৩

তস্য (অন্নরসময়পুরুষস্য) এষ (প্রাণময়পুরুষঃ) এব শারীর আত্মা। এখানে কোষের কথা নেই, শরীরের কথা আছে। অন্নরসময় পুরুষকে যদি শরীর বল, আর সে যদি প্রাণের দ্বারা পুরিত বা উদ্ভাসিত হয়, তখন শরীরটাই অন্নরসময় পুরুষ, আর তার শারীর-আত্মা হল প্রাণ। চৈতন্যই শরীর হয়ে যাচ্ছে। সেই অন্নরসময় পুরুষের অন্তরাত্মা প্রাণময় পুরুষ, আর প্রাণময় পুরুষের অন্তরাত্মা আর এক মনোময় আত্মা বা পুরুষ। সব পুরুষের আকৃতিই সেই পাখির মতন। ঐ মনোময় পুরুষের শির হল যজুঃ। এই উপনিষদ যজুর্বেদের অন্তর্গত বলে এখানে যজুঃ-এর প্রাধান্য। ব্রহ্মলাভ করতে হলে একাক্ষরী যজুর্মন্ত্র ওঙ্কারই শির। আর তিনটি কে? ঋক্ অগ্নির মন্ত্র। সমস্ত জীবন যজ্ঞময়, অগ্নিময়, কর্মময়। তাই ঋক্ মন্ত্রগুলি মনোময় পাখির দক্ষিণ পক্ষ। আর সোমযাগই সর্বশেষ যজ্ঞ। সোমযাগেই সামগান গীত হয়। সোম আর সাম সমার্থক। সেখানে শান্তি, আনন্দ, মোদ, প্রমোদ—calm, peace, bliss, জীবনের শেষ প্রাপ্তি। তাই সামমন্ত্রগুলি হল বাম বা উত্তর পক্ষ। আর আদেশ হল আত্মা। ব্রাহ্মণই আদেশ,

এমন সব মহাবাক্য, যা উচ্চারণ করলে প্রচোদনা, চেতনার ঊর্ধ্বায়ন হয়, যা দিয়ে দীক্ষা দেওয়া হয়, শক্তি সঞ্চার করা হয়। এমন সব ব্রাহ্মণ বা বিধিবাক্য, যা শক্তিকে সম্পুটিত করে সাধককে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর পুচ্ছ হল অথর্বাঙ্গিরস— অথর্ববেদ। অথর্বাঙ্গিরস মন্ত্রসমূহের সঙ্গে পৃথিবীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। স্মার্তকর্ম, গৃহ্যকর্ম, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি জাগতিক কর্মে অথর্ববেদের প্রাধান্য। ঋক্ সাম দিয়ে চেতনা ঊর্ধ্বে উধাও হয়, চেতনাকে নিঃশ্রেয়সের দিকে ঠেলে দেয়। অথর্ববেদের যোগ রয়েছে বিশেষ করে অভ্যুদয়ের সঙ্গে। নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয়কে একসঙ্গে নিতে হবে। তাই ঋষি কণাদও বলেছেন— অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সাভ্যাং ধর্মঃ। মনোময় পুরুষ মন্ত্রময়। মননাত্ ত্রায়তে ইতি মন্ত্রঃ। সমস্ত বেদই মন্ত্রময়। অথর্ববেদের ঋত্বিক সোমযজ্ঞের ব্রহ্মা—Presiding Officer হন। তিনিই সমস্ত যজ্ঞকে ধরে রাখেন। তাই অথর্ববেদই মনোময় পাখির পুচ্ছস্বরূপ।

এই মনোময়, মন্ত্রময় পুরুষের সম্পর্কেও এইরকম শ্লোক আছে।

চতুর্থ অনুবাক

যতঃ ৰাচঃ নিৱর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচন ইতি। ২।৪।১

যাকে না পেয়ে মনের সঙ্গে বাক্সমূহ যেখান থেকে ফিরে আসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জেনেছেন, তিনি কখনো ভয় পান না। ২।৪।১

এখন মনোময়, মন্ত্রময় পুরষের সম্পর্কে শ্লোক বলা হচ্ছে, ফলশ্রুতির মতন। বাক্ এবং মন— দুয়েরই নিরোধ করা হচ্ছে। এমন এক স্থানের কথা বলা হচ্ছে, যেখান থেকে বাক্ ফিরে আসে মনকে নিয়ে। ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব সবই বাক্। এই বাক্ হল প্রেরণাস্বরূপ, মনকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এই বাক্ মনকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেল যেখানে বাক্ আর মন থৈ পায় না। পরম পুরুষের আভাস পেলে মনও পিছনে পড়ে যায়। এখানে যেন একটা ফাঁক, hiatus বা ব্যবধান আছে। আগে আনন্দকে পাচ্ছি। বিজ্ঞানের কথা পরে হবে। বিজ্ঞানের দ্বারা বিভূতি ফোটে— অনেক সিদ্ধি আসে। আনন্দই আসল ফলশ্রুতি, আসল লক্ষ্য বা প্রাপ্তি। ঐশ্বর্য আসে বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে। বাক্ মন সেখানে হারিয়ে যায়, থাকে কেবল আনন্দ। তখন আর কোন ভয় থাকে না। তখন পূর্ণমুক্তি, পূর্ণানন্দ।

শারীর ভাবনা এই ক্রমে করা হয়েছে— অন্নময়, প্রাণময় এবং মনোময়। এই মনোময় শরীর হল মন্ত্রময় এবং বাঙ্ময়। বাক্ই মন্ত্র একথা মনে রাখতে হবে। 'স্তোত্রাণি সর্বা গিরঃ'। যত শুনি কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে— রামপ্রসাদ। তন্ত্রে বর্ণমালার প্রত্যেক অক্ষরকে মন্ত্ররূপে ধরা হয়েছে। বেদে বাক্ নিয়ে অনেক উচ্ছ্বাস আছে। মনের উদ্দীপন হলে, মন্ত্র তৈরি হলে বাক্ সার্থক। মনে বাক্, মন্ত্র ফুটলেই মনোময় শরীর তৈরি হয়। তখন মন উজানে বইবে। এখানে ক্রমভঙ্গ আছে। যতো ৱাচো নিৱর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ— বাক্ আর মন যখন নিবৃত্ত হয়। এখানে সাধনার দিকে ইঙ্গিত আছে। এই ভাবনা অপ্রাকৃত। সাধারণ মানুষের বাক্ মন উজানে বয় না। মনই মানুষের মর্যাদা, সীমা। কিন্তু মানুষ যখন যজমান হয়, তখন তার সার্থকতা উজানে যাওয়া। তখন সে সত্যিকার মনু। এখান থেকে একেবারে শেষের কথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রাকৃত মন ও বাক্ নিবৃত্ত হলে ব্রহ্মের আনন্দকে পাওয়া যায়। তখন আর কোন ভয় থাকে না। আনন্দ আর অভয়ের কথা দুটোই পরে আবার আসবে। এখানেই চরম ফলশ্রুতির কথা বলে দেওয়া হল। এরপর বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় পুরুষের কথাতে এই ভাবনাকে সমৃদ্ধ করা হবে। এইভাবে মন সমৃদ্ধ হলে বিজ্ঞানময় পুরুষের স্ফুরণ সম্ভব। এই অনুবাকের পরের অংশেই বিজ্ঞানময় পুরুষের কথা বলা হচ্ছে।

তস্য এষঃ এৱ শারীরঃ আত্মা, যঃ পূর্ৱস্য। তস্মাত্ ৱৈ এতস্মাত্ মনোময়াত্ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা ৱিজ্ঞানময়ঃ। তেন এষ পূর্ণঃ। স ৱৈ এষঃ পুরুষৱিধঃ এৱ। তস্য পুরুষৱিধতাম্। অনু অয়ং পুরুষৱিধঃ। তস্য শ্রদ্ধা এৱ শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যম্ উত্তরঃ পক্ষঃ। যোগঃ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপি এষঃ শ্লোকঃ ভৱতি। ২।৪।২

এই যে মনোময় পুরুষ, তিনি পূর্বোক্ত প্রাণময় পুরুষের শারীর আত্মা। এই মনোময় থেকে অন্য অথচ তার অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় আত্মা (পুরুষ) আছেন। তাঁর দ্বারা ইনি পূর্ণ। তিনিও (বিজ্ঞানময় আত্মাও) পুরুষাকার। সেই মনোময় পুরুষের অনুরূপই এই বিজ্ঞানময় পুরুষের আকৃতি। শ্রদ্ধাই তার মস্তক। ঋত তার দক্ষিণ পক্ষ। সত্য তার উত্তর পক্ষ। যোগ তার আত্মা বা মধ্যভাগ। মহঃ-তে সে প্রতিষ্ঠিত। তাই মহঃ-ই তার পুচ্ছ। সে সম্পর্কেও এই শ্লোক আছে। ২।৪।২

প্রাণময় পুরুষের আত্মা মনোময় পুরুষের কথা হচ্ছিল। সেই মনোময় পুরুষের মধ্যেও তাঁর আত্মারূপে আরেক পুরুষ আছেন। তিনি বিজ্ঞানময়। তেন ৱিজ্ঞানময়পুরুষেণ এষ মনোময়পুরুষঃ পূর্ণঃ। সেই বিজ্ঞানময়পুরুষের দ্বারা এই মনোময়পুরুষ পূর্ণ হয়ে আছেন। বিজ্ঞান আলো হয়ে মনকে উদ্যোতিত করে রয়েছে।

স ৱা এষ পুরুষবিধ এব। সেই বিজ্ঞানময় আত্মাও আগেকার পুরুষের মতন। পুরুষের মতন বলতে সেই পাখির মতো বলা হচ্ছে। ভাবনাটা এই রকম, দেহ প্রাণে পূর্ণ, আবার দেহ ও প্রাণ মনে পূর্ণ। দেহ মনে পূর্ণ একথা ভাবা কষ্টকর। এ দেহ-প্রাণ-মনের গভীরেও বিজ্ঞানময় পুরুষ আছেন। তার উপমা হলেন দক্ষিণামূর্তি। দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রে শঙ্করাচার্য দক্ষিণামূর্তি গুরুর সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। দেহের সমস্ত ছিদ্র থেকে যেন জ্ঞান আলো হয়ে ফুটে বেরোচ্ছে। দেহ আলো বা জ্ঞানকে কোন বাধা দিচ্ছে না। বরং প্রতিফলিত করছে অন্তরের বিজ্ঞান ও আনন্দকে। মনোময় পুরুষের অনুরূপই এই বিজ্ঞানময় পুরুষ। যেমন স্থূলদেহ প্রাণময় হয়, আবার সেই প্রাণময় দেহ মনোময় হয়, তেমনি এই প্রাণমনোময় দেহই বিজ্ঞানময় হয়। এটা হলে কয়লাতে আগুন ধরে যাবার মতো সমস্ত শরীর— দেহ-মন-প্রাণ যোগাগ্নিময় হয়ে যায়। দেহের উদ্দীপন— যোগাগ্নিময় হওয়াই বিজ্ঞানময় শরীরের ভাবনা।

বিজ্ঞানের প্রধান বৃত্তিগুলি আগের মতনই পাখির অঙ্গের মত স্থাপন করা হচ্ছে। শ্রদ্ধা তাঁর শির। ঋত ও সত্য তার দক্ষিণ ও বাম পক্ষ। যোগ, যোগবীর্য হল তাঁর আত্মা বা মধ্যদেশ। আর মহঃ হল তাঁর পুচ্ছ, প্রতিষ্ঠা। তিনি মহঃ-এ প্রতিষ্ঠিত। এই মহঃ হল চতুর্থ ব্যাহৃতি, যার কথা শীক্ষাবল্লীতে আছে।

মোট পাঁচটি ভাব বা বৃত্তির কথা বলা হচ্ছে— শ্রদ্ধা, ঋত, সত্য, যোগবীর্য ও মহঃ।

শ্রদ্ধাই আসল কথা। যোগেও বলা হয়েছে— আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ প্রজ্ঞা। মন কেন উজান বইবে, এখানে তার সূত্র পাচ্ছি। মনোময় পুরুষের ফলশ্রুতিতে মনের উজান বইবার কথা বলা হয়েছিল। তার মূলে এই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা মানুষের মনকে দুই জাতের করে তোলে। যার মধ্যে শ্রদ্ধা নেই, সে প্রাকৃত মনুষ্য। শ্রদ্ধাকে শঙ্কর বলেছেন 'আস্তিক্যবুদ্ধি'। লোকোত্তর কিছু আছে— 'নেদম্ যদিদমুপাসতে' (কেন,)। এখানে তুমি যার উপাসনা করছ, তার থেকে অন্য, বেশি কিছু আছে। এই বিবেক যার মধ্যে জাগ্রত হয়, তার মধ্যে শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাই গীতা বলছেন— শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষঃ, যো যত্-শ্রদ্ধঃ স এব সঃ —গীতা ১৮।৩। আরো আছে— শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্, গীতা ৪।৩৯। তার উদাহরণ কঠোপনিষদের নচিকেতা। ঋগ্বেদে শ্রদ্ধাসূক্ত আছে— ঋ ১০।১৫১। ঋষি শ্রদ্ধা কামায়নী। দেবতা শ্রদ্ধা। সেখানে চতুর্থ মন্ত্রে আছে— শ্রদ্ধাং হৃদয্যয়া আকূত্যা শ্রদ্ধয়া বিন্দতে বসু। শ্রদ্ধা হৃদয়ের আকূতি। এটা কৈশোরে জাগে। তার আগেও জাগতে পারে। তখন সে যেন অলখের আলো দেখতে পায়। এই শ্রদ্ধার একদিকে মন, আরেক দিকে বিজ্ঞান। মন ও বিজ্ঞানের পার্থক্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর সহজভাষায় বুঝিয়েছেন— কেউ দুধ দেখেছে, জেনেছে আর কেউ দুধ খেয়ে গায়ে

জোর করেছে। যে জেনেছে সে জ্ঞানী, আর যে খেয়ে গায়ে জোর করেছে সে বিজ্ঞানী। ব্রহ্মের বিচার— জ্ঞান, অনুভূতি, বিজ্ঞান। অন্তরের বিজ্ঞানই শ্রদ্ধা আনে। তার মূলে আস্তিক্যবুদ্ধি। কৈশোরচেতনায় সেটা স্ফুরিত হয়। এটাই dream consciousness স্বপ্নচেতনা। বাস্তব জগৎকে ভুলে স্বপ্ন-ব্রহ্মকে জানা। শ্রদ্ধা হল আভাসে পাওয়া। ঠিক জানতে পারছি না, অথচ শ্রদ্ধা জেগেছে। শ্রদ্ধা পুষ্ট হলে প্রভাসে illumination-এ রূপান্তরিত হয়। সেটাই বিজ্ঞানে, উপলব্ধিতে, প্রাপ্তিতে রূপান্তরিত হয়। এইসব কিছুর মূলে শ্রদ্ধা। তাই শ্রদ্ধা হল বিজ্ঞানময়পুরুষের শির— অগ্রণী।

দক্ষিণ পক্ষ কর্মের দ্যোতক। বামপক্ষ বিশ্রামের। দক্ষিণ হস্ত হল ঋত, সম্বাদী, সমন্বয়ী একতানগতি harmony. আর বামহস্ত হল সত্য, স্থির, শান্ত, সনাতন। সত্য ও ঋতকে অবলম্বন করেই সেই মনপাখি উড়ছে। ঋত এই জগতের ছন্দ। সত্যেই তার প্রতিষ্ঠা। সহজ উপমা হল সত্যের সূর্য জ্বলছে। তার আলোই সত্য। সে আলো সব জায়গায় সমানভাবে ছড়াচ্ছে। তার যে গতি, সে গতিকে আশ্রয় করেই অহোরাত্রের, ষড়্ ঋতুর আবর্তন। এই ছন্দোময় গতিই ঋত। তাঁর ক্রিয়াও ঋত।

মাঝখানের যে শক্তি— তার যে আত্মা, বা মধ্যভাগ— ধড়, সে হল যোগ। কথাটা খুব প্রাচীন, ঋগ্বেদেও আছে। সাধারণ অর্থে আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করাই যোগ। রবির ভাষায়— বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো। শ্বে. উপনিষদে আছে— 'যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো, ৱিপ্রা ৱিপ্রস্য বৃহতো ৱিপশ্চিতঃ'। ২।৪। কার সঙ্গে মনের যোগ করতে হবে? সবিতার সঙ্গে। এটা মনোযোগ। সব সময় সবিতার মনন বা জপ করবে। বিশ্বামিত্রের গায়ত্রীমন্ত্র ঋ. ৩।৬২, ভারতের সাধনার আধার-শিলা হয়ে রয়েছে। আর এক যোগ হল ধী-যোগ। মনের ঊর্ধ্বে ধী। ধী, বুদ্ধি, বিজ্ঞান একই কথা। এখানে মন এবং ধী-এর মধ্যে পার্থক্য কী, তা স্পষ্ট হচ্ছে পরের কথায়।

মহঃ হল বিজ্ঞানময় পাখির পুচ্ছ, প্রতিষ্ঠা। তাই দিয়ে জীবনের সঙ্গে তার যোগ রয়েছে। মহঃ চতুর্থ ব্যাহৃতি। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ— এই তিন ব্যাহৃতির ওপারে। মহঃ। মহিমা। উপনিষদে অন্যত্র আছে— মহিমানম্ আত্মনঃ, কঠ. ১।২।২০। স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ। মহিমার তিন ধর্ম—ব্যাপ্তি বা বৈপুল্য, দীপ্তি এবং শক্তি বা সামর্থ্য। মহঃ এবং might এক ধাতু থেকে। মহঃ-এর আদর্শ হল আদিত্য। আদিত্যের দীপ্তি, শক্তি এবং ব্যাপ্তি, সেটাই হল মহঃ। মনস্তত্ত্বে চেতনার বৈপুল্য—Universal Consciousness, বিশ্বব্যাপী চৈতন্য, এটাই বিজ্ঞান। এটাই যোগের প্রথম সিদ্ধি। পতঞ্জলি চিত্তের পঞ্চভূমির কথা বলেছেন। চিত্ত যখন মূঢ় তখন সেটা অন্নময় ভূমি। ক্ষিপ্তচিত্ত প্রাণময় ভূমি। বিক্ষিপ্তচিত্ত মনোময় ভূমি। এই তিন ভূমিতেও সমাধি হতে পারে। কিন্তু সত্যিকার যোগ, যৌগিক সমাধি আরম্ভ হয় একাগ্রভূমিতে। চিত্ত যখন

কোন একভাবে একাগ্র হয়। এটাই বিজ্ঞানের ভূমি। আর নিরুদ্ধ চিত্তের সমাধি হয় আনন্দময় ভূমিতে।

মহঃ চতুর্থ ব্যাহৃতি, বিজ্ঞানভূমি। শ্রীঅরবিন্দের supermind। Link between lower and upper hemisphers. চেতনার সপ্তভূমির— সপ্তলোকের মাঝখানের ভূমি। মহঃ-এর ঠিক উপরের ব্যাহৃতি, লোক হচ্ছে জনঃ, আনন্দলোক। সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপের অন্তিম লোক, যা অধঃ তিনলোকের সঙ্গে যুক্ত। বিজ্ঞানচেতনা আদিত্যভাস্বর চেতনা, Universal Consciousness। ব্যক্তিকে ছাপিয়ে ভাবে পৌঁছন। শ্রীরামকৃষ্ণের উদাহরণ—সব মেয়ের মধ্যেই মাকে দেখছি। ব্রহ্মময়ীর প্রতিমারূপে প্রত্যেক মেয়েকে তাঁর দেখা। এটাই বিজ্ঞান। ৰাসুদেবঃ সর্ৰম্ ইতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ, গীতা ৭।১৯। যত্র যত্র নেত্র পড়ে, তত্র তত্র কৃষ্ণ স্ফুরে— চৈতন্য-চরিতামৃত। এসবই বিজ্ঞানভূমির দর্শন। বস্তুর পিছনে ভাবকে দেখা।

আত্মচৈতন্যের ব্যাপ্তি, বিস্তার— এর বোধই বিজ্ঞান। এটাই মহঃ বা প্রভাস। এটাই বিজ্ঞানময় পুরুষের, পাখির পুচ্ছ বা প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়েও একটি শ্লোক আছে—

পঞ্চম অনুবাক

ৰিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্মাণি তনুতে অপি চ। ৰিজ্ঞানং দেৰাঃ সর্ৰে ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠম্ উপাসতে। ৰিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেত্ ৰেদ, তস্মাত্ চেত্ ন প্রমাদ্যতি, শরীরে পাপ্মনঃ হিত্বা, সর্ৰান্ কামান্ সমশ্নুতে ইতি।। ২।৫।১

বিজ্ঞানই যজ্ঞের বিস্তার করে। আর কর্মসমূহেরও বিস্তার করে। সমস্ত দেবতা তাদের জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ অগ্রজ বিজ্ঞান-ব্রহ্মের উপাসনা করেন। এই বিজ্ঞান-ব্রহ্মকে যিনি জানেন আর যিনি তাঁর বিষয়ে প্রমাদ, অবহেলা করেন না, তিনি এই দেহে উৎপন্ন সব পাপ ত্যাগ করে সমস্ত কাম্য বস্তু ভোগ করেন।। ২।৫।১

প্রথমেই বলছেন যজ্ঞ ও কর্মের কথা। মনোময় পুরুষের ফলশ্রুতিতে বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে সোজা আনন্দ-ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছিল। সেখান থেকে বিজ্ঞানের ফলশ্রুতি আরো এগিয়ে যাবে। দুটো ফলশ্রুতির পার্থক্য বুঝে নিতে হবে। মনের বেলা এক ধাক্কা দিয়ে মনকে উজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মন উজান বইলে দেহ-প্রাণ মনের সমস্ত কর্ম হয়ে যাবে যজ্ঞ। বিজ্ঞান তখন যজ্ঞ ও কর্ম দুটোকেই 'তনুতে' বিস্তার করেন। √তন্-এর ব্যবহার লক্ষণীয়। √তন্ =টানা— সুতো টানা। এখানে যজ্ঞের তননের— এগিয়ে নিয়ে

যাবার কথা বলা হল। যজ্ঞের আর এক নাম 'বিতান'। এই পৃথিবী থেকে দ্যুলোক পর্যন্ত সুতো টেনে যাওয়া। এটা দেবযান পথ। অন্যত্র আছে, আদিত্য-রশ্মি ঊর্ধ্বলোক থেকে নেমে এসে আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তাকে ধরেই আবার উজানে বয়ে যাওয়া, হিতানাড়ী ধরে মূর্ধা পর্যন্ত এবং তারও ঊর্ধ্বে। এটাই পরে হয়েছে সুষুম্না নাড়ী ধরে উজানে বয়ে যাওয়া। এটাই বিতান, বিতনন। তখন সেটা আমাদের সমস্ত কর্ম, বচন, মনন— দেহ-প্রাণ-মনের সমস্ত ক্রিয়াকে ঊর্ধ্বমুখী করে দেয়। এখান থেকেই বিতত, আতত, প্রতত, সন্তত করে। সূর্যরশ্মিকে ধরে উজিয়ে গিয়ে আদিত্যলোকে পৌঁছন যায়। এটা যজমানের সাধ্য। Direction মার্গ-দর্শন দেন ঋত্বিকরা। ঋত্বিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন ব্রহ্মা। তিনি বিজ্ঞানী পুরুষ। তাঁর লক্ষণ ছান্দোগ্য উপনিষদে দেওয়া আছে— যজ্ঞকে তিনি ধরে রয়েছেন। তাঁর মনে যা আছে, তাকে রূপ দিচ্ছেন ঋত্বিকরা। তাকে 'অপূর্ব'রূপে, ফলরূপে গ্রহণ করছেন যজমান। ব্রহ্মার বিজ্ঞান, ঋত্বিকদের কর্ম আর যজমানের কর্মফল বা অপূর্বকে গ্রহণ করা— এই নিয়ে যজ্ঞ। এই ভাবনা মুসলমানদের মধ্যেও আছে। তাদের ইমাম বিজ্ঞানী পুরুষ, ব্রহ্মা আর ঋত্বিক একাকার। এই মানসযজ্ঞকে ব্রহ্মা প্রসারিত করেন দ্যুলোক পর্যন্ত তাঁর বিজ্ঞান দিয়ে। যজ্ঞের পিছনে রয়েছে আত্মোৎসর্গের ভাবনা। অগ্নিতে নিজের প্রতীক-স্বরূপ হবি দিয়ে তাঁর প্রসাদ পাওয়া। দীক্ষার মধ্যেও এই অগ্নিষ্বাত্ত হবার ভাবনা আছে। দীক্ষা— দহন করার ইচ্ছা। যেমন রবির গানে আছে— এই করেছ ভালো নিঠুর হে। এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো। ব্রহ্মা, ঋত্বিক ও যজমান— এই তিনের পিছনে রয়েছে বিজ্ঞান। এই যজ্ঞ করার অর্থ দেবতার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া।

দেবতারা সব বিজ্ঞানের আশ্রিত। তাঁরা জ্যেষ্ঠব্রহ্মের উপাসক। ব্রহ্মাই ভূদেব, পৃথিবীতে দেবতা। এর-পরে দেবত্বের অধিকারী হলেন বিশ্বে দেবাঃ। তাঁরা বিজ্ঞানময়। তাঁরা সবাই জ্যেষ্ঠব্রহ্মের উপাসনা করছেন। জ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম পিছনে থাকেন। দেবতা ও বিশ্বদেবগণেরও ঊর্ধ্বে। এইসব দেবতারা ব্রহ্মচৈতন্যের বিভূতি। 'জ্যেষ্ঠব্রহ্ম' আকাশবৎ। ব্রহ্মসূত্রে আছে— আকাশস্তল্লিঙ্গাত্। আকাশের ভিতর দিয়ে আলো ছড়িয়ে পড়ল, তারাই দেবাঃ। সূর্যরশ্মিগুলি বিশ্বে দেবাঃ। 'অথ সূর্যস্য রশ্ময়ঃ'। এই দেবতারা উপাসনা করেন জ্যেষ্ঠব্রহ্মের— আকাশের। আকাশ শব্দের মধ্যেই আলোর ব্যঞ্জনা আছে— আ=কাশ্। কঠোপনিষদে আছে, আলোকে ছাপিয়ে অনালোকের আলোর কথা, যা সমস্ত কিছুকে আলোকিত করে। ন তত্র সূর্যো ভাতি...কুতোঽয়মগ্নিঃ তমেৱ ভান্তমনুভাতি সর্ৱম্ তস্য ভাসা সর্ৱমিদং ৱিভাতি।। (কঠ. ২।২।১৫, শ্বেত. ৬।১৪, মুণ্ডক ২।২।১০)। এটা নীলাকাশ। এটা সন্মাত্র বা অসন্মাত্র। শঙ্করের সন্মাত্র (সৎ-মাত্র) বা বৌদ্ধদের শূন্যতা অসন্মাত্র (অসৎ-মাত্র) দুই মিলেই জ্যেষ্ঠব্রহ্ম। তার থেকে

সূর্যরশ্মির বিকিরণ হল দেবতারা। এরা সংহত হয়েছেন ব্রহ্মার হৃদয়ে— ভূদেবে। ঋত্বিকরা তার সহকারী, যজমান তার ফলকামী— দেবকাম। একো দেবঃ আদিত্যঃ। ভূদেব— ব্রহ্মা। ঋত্বিকরা দেবতা। যজমান দেবকামী। শৌনকসংহিতায় জ্যেষ্ঠব্রহ্মসূক্ত আছে, অথর্ব ১০।৮।

এইভাবে ব্রহ্মকে বিজ্ঞানরূপে জানো আর ব্রহ্ম থেকে চ্যুত, স্খলিত হয়ো না, কোন প্রমাদ করো না। বুদ্ধদেব অপ্রমাদকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। অপ্রমত্তা, অপ্রমাদ— এটাই ব্রহ্মবিহারের মূল কথা। এটাই জীবন্মুক্তেরও ভাব। গীতাতেও এই ব্রাহ্মীস্থিতির কথা বলা হয়েছে— এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।। গী. ২।৭২। স্থিতপ্রজ্ঞ এই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করলে কিছুতেই বিমোহিত, বিমূঢ় হন না। তখন তাঁর ভিতরে কী হয়? তাঁর শরীর অপাপবিদ্ধ হয়। অন্ন-প্রাণ-মনের অধিকারে দেহে মল উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞান জাগলে মলও দগ্ধ হয়। তখন সাধক সর্বপাপ ত্যাগ করে, সর্বকাম সম্ভোগ করেন। জীবন আনন্দময় হয়। এই সম্ভোগ বিজ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব। অন্নময় দেহ স্থূল। প্রাণময় দেহ বাসনাময়। মনোময় দেহ বিচার ও বুদ্ধির স্তর। —এই তিনটি শুদ্ধ নয়, পাপবিদ্ধ। পাপ হল দ্বৈতবুদ্ধি। ভেদজ্ঞানই পাপ। সম-জ্ঞানে পাপ থাকে না। এটাই বিজ্ঞান বা সংজ্ঞানের ভূমি। 'অশনায়া' বুভুক্ষা পাপ। যে আত্মম্ভরি, স্বার্থী, সেই পাপী ও অজ্ঞানী। বিজ্ঞানে ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হয়। চিত্তের নির্বাসন হয়, চিত্ত বাসনাহীন হয়। তখন বিজ্ঞানীর দিব্যভোগ হয়।

তস্য এষঃ এৱ শারীরঃ আত্মা, যঃ পূর্ৱস্য। তস্মাৎ ৱৈ এতস্মাৎ ৱিজ্ঞানময়াৎ, অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ, তেন এষ পূর্ণঃ। স ৱৈ এষঃ পুরুষৱিধঃ এৱ। তস্য পুরুষৱিধতাম্ অনু অয়ম্ পুরুষৱিধঃ। তস্য প্রিয়ম্ এব শিরঃ। মোদঃ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদঃ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দঃ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপি এষ শ্লোকঃ ভবতি।। ২।৫।২

সেই মনোময় পুরুষের এই বিজ্ঞানময় দেহে অধিষ্ঠিত আত্মা। যেমন আগের তেমনি এই বিজ্ঞানময় হতে অন্য অথচ তারই অভ্যন্তরে আনন্দময় আত্মা আছেন। তার দ্বারা এই বিজ্ঞানময় আত্মা পূর্ণ। সেই আনন্দময়ও পুরুষাকৃতি। আগের বিজ্ঞানময় পুরুষের অনুরূপ তার পুরুষাকৃতি। (পাখির মতো)। প্রিয়তা তার মস্তক। মোদ তার দক্ষিণ পক্ষ। প্রমোদ তার উত্তর পক্ষ। আনন্দ তার আত্মা অর্থাৎ মধ্যভাগ। আর ব্রহ্ম তার পুচ্ছ যাতে সে প্রতিষ্ঠিত। সেই বিষয়েও এই শ্লোক আছে।। ২।৫।২

যেমন মনোময় পুরুষের অভ্যন্তরে এবং তাকে ব্যাপ্ত করে বিজ্ঞানময় পুরুষ

আছেন, তেমনি বিজ্ঞানময় পুরুষের অভ্যন্তরে এবং তাঁকেও ব্যাপ্ত করে আনন্দময় পুরুষ আছেন। বিজ্ঞানময় পুরুষের যেমন— শ্রদ্ধা, ঋত, সত্য, যোগ আর মহঃ— এই পাঁচটি অঙ্গ বা লক্ষণ ছিল, তেমনি আনন্দময় পুরুষেরও পাঁচটি অঙ্গ বা লক্ষণ আছে— প্রিয় বা প্রিয়তা, মোদ, প্রমোদ, আনন্দ আর ব্রহ্ম।

প্রিয় বা প্রিয়তা— বৈদিক প্রয়স্— দেবতার প্রিয় খাদ্য। প্রিয় √প্রী, ভালবাসা, endearment আনন্দদায়ক। বৌদ্ধরা যাকে প্রীতি বলতেন। ভালবাসার-প্রেমের-প্রিয়তার আনন্দ—এটা তাঁর মস্তক। ভালবাসা, প্রীতিই দিশারী। ব্রহ্মের দিকে প্রীতিসহকারে এগোতে হবে। বৌদ্ধদের ধ্যানভূমিতে বিতর্ক ও বিচারসহগত ধ্যানের পরে প্রীতি-সহগত ধ্যানের কথা বলা হয়েছে। বিতর্ক-সহগত ধ্যানে মন কাজ করে, ধ্যান নিবিড় হয় না। বিচার-সহগত ধ্যানে মন universalised হয়, বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে, আলোর ছটার মতো। এখানে বুদ্ধি বা বিজ্ঞান-তত্ত্ব ফুটে ওঠে। প্রীতি-সহগত ধ্যানে একতানতা আসবে, চিত্ত একাগ্রভূমিতে উঠে যাবে, আনন্দের হিল্লোল জাগবে। এটাই পতঞ্জলিতে সানন্দ-সমাপত্তি। তখন আনন্দ সম্পদ, প্রীতি লক্ষ্য। তখন ইষ্টের প্রতি ভালবাসা হয়। 'বদন ছাড়িতে নারে হরিনাম'। 'বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা'।

তারপর আনন্দময় পুরুষরূপী পাখির দুটি পক্ষ— মোদ আর প্রমোদ। ঋগ্বেদের সোমমণ্ডলে আনন্দের সঙ্গে মোদ, প্রমোদের কথা আছে। যত্র আনন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদঃ আসতে— ৯।১১৩।১১। যেখানে আনন্দ ও মোদ, মোদ আর প্রমোদ আছে। যেখানে সর্বকামের প্রাপ্তি হয়, সেই অমৃতভূমিতে হে ইন্দ্র, আমাদের নিয়ে চল। মোদ হল বিষয়-সংস্পর্শজনিত আনন্দ। মনপাখি উড়ে চলেছে ইষ্টের দিকে। তাঁকে সর্বত্র দেখছি শুনছি স্পর্শ করছি ভিতরে বাইরে। এটা বিষয়ের স্পর্শ। দৃশ্যে-স্পর্শে-গানে-গন্ধে যে আনন্দ, তাই মোদ। তার থেকে প্রকৃষ্ট আনন্দ দেখা দেয় রস-চেতনার উন্মেষে। তখন প্রমোদ। সোম্য রসচেতনা। বিষয়ানন্দে ব্রহ্মানন্দ। চেতনা রসাপ্লুত হয়ে রয়েছে।

অন্তরের যে আনন্দ— 'আনন্দসাগর উথলে', সে হল তার আত্মা। আনন্দ সুখ নয়। মোদ সুখধর্মী— বিষয়মুখী। প্রমোদও সুখধর্মী কিন্তু ভাবমুখী। আনন্দ ভিতরে উথলে ওঠে আপনি, আপন স্বভাবে। তা কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে না।

এই আনন্দময়ের প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মে। আনন্দময় পুরুষের স্বরূপ কী? সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের সঙ্গে সে যুক্ত। সর্বত্র ইষ্টদর্শন ও তজ্জনিত রসাপ্লুতি ও সহজানন্দে স্থিতি। ব্রহ্মের সঙ্গে সে যুক্ত। তাই ব্রহ্মই আনন্দময় পুরুষের পুচ্ছ, যেখানে সে প্রতিষ্ঠিত।

বিজ্ঞানময় পুরুষের প্রতিষ্ঠা মহঃ। চতুর্থ ব্যাহৃতি। পর ও অপর ব্রহ্মের upper and lower hemisphere-এর ঠিক মাঝখানে। তিন নিম্নলোক, অপরলোক

ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ। এর উপরে মহঃ। আনন্দময় পুরুষের প্রতিষ্ঠা। সোজাসুজি ব্রহ্মে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের। যদিও ব্যাহৃতির দৃষ্টিতে সেটি 'জনঃ' লোক, দ্র. মহানারায়ণ উপনিষদ্। পরব্রহ্মের— upper hemisphere-এর তিন ব্যাহৃতি, আলাদাভাবে সত্য, তপঃ ও জনঃ থাকলেও তারা ওতপ্রোতভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। তিনে এক, একে তিন। উপর থেকে নীচের দিকে সাজালে ব্যাহৃতি ও লোকের স্তর হল এই—

সত্যম্	সত্যলোক	সৎ
তপঃ	তপোলোক	চিৎ
জনঃ	জনঃ বা আনন্দলোক	আনন্দ
মহঃ	বিজ্ঞানলোক	বিজ্ঞান শ্রীঅরবিন্দের Supermind
স্বঃ	স্বর্লোক, জ্যোতির্ময় মনো-লোক	দ্যৌঃ মনোময়
ভুবঃ	ভুবর্লোক বা অন্তরিক্ষলোক	প্রাণময়
ভূঃ	ভূলোক	পৃথিবী বা অন্নময় (শরীর)

'পিণ্ডে সো ব্রহ্মাণ্ডে' (যা আছে পিণ্ডে, তাই ব্রহ্মাণ্ডে) এই ন্যায়ে আমাদের দেহে এই লোক ও ব্যাহৃতিসমূহ পদ্ম বা চক্ররূপে সাজানো রয়েছে। সহস্রার মস্তকোপরি সত্যম্। আজ্ঞা বা ভ্রূমধ্যে তপঃ। কণ্ঠে বিশুদ্ধে জনঃ। অনাহতে হৃৎকেন্দ্রে মহঃ। মণিপুরে নাভিতে স্বঃ। স্বাধিষ্ঠানে ভুবঃ। মূলাধারে ভূঃ।

তন্ত্রসাধনাতে প্রত্যেক চক্র বা পদ্মে তার বীজমন্ত্র নিহিত আছে। মূলাধারে— লং, স্বাধিষ্ঠানে— বং, মণিপুরে— রং, অনাহতে— যং, বিশুদ্ধ চক্রে— হং, আজ্ঞা-তে ওঁ, সহস্রারে— ওঁকারের অনুরণন, যাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন— ঘণ্টার ধ্বনি। টং....।

ষষ্ঠ অনুবাক

অসন্-ন্ এৱ স ভৱতি, অসদ্ ব্রহ্ম ইতি ৱেদ চেত্।
অস্তি ব্রহ্ম ইতি চেত্ ৱেদ, সন্তম্ এনং ততঃ ৱিদুঃ।। ইতি।
তস্য এষ এৱ শারীরঃ আত্মা, যঃ পূর্ৱস্য। ২।৬।১

ব্রহ্মকে যিনি অসৎ বলে জানেন, তিনি অসৎ-ই হয়ে যান। আর যদি কেউ ব্রহ্মকে 'আছেন'— 'অস্তি'— সৎরূপে জানেন, তাঁরা তাঁকে সত্যরূপেই জানেন। এই আনন্দময়ই পূর্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের শরীরস্থ আত্মা। ২।৬।১

ব্রহ্মানন্দবল্লীর আরম্ভ ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণের বর্ণনা দিয়ে। বলা হয়েছিল— সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম। তারপর অন্তরে অন্তরে একটা যোগ স্থাপন করা হয়েছে। বলা হচ্ছে ব্রহ্ম আর আত্মা এক। আর সেই আত্মা থেকে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ আর পৃথিবী— এই পাঁচটি মহাভূত, cosmic elements বেরিয়ে আসছে, যার সংক্ষিপ্ত নাম ইদম্। ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে— 'আত্মা বৈ ইদম্ একঃ এব অগ্রে আসীত্' ১।১। যদি তাঁকে দেখি, তাহলে এই 'ইদম্' বা পঞ্চ মহাভূত হলেন তাঁর আধার বা প্রকৃতি। এই দুই— আত্মা আর 'ইদম্' বা পুরুষ আর প্রকৃতি মূলে এক। পৃথিবীতে এসে যেন সব পরিণাম বা অনুপ্রবেশ involution থেমে গেল। তাই পৃথিবীই প্রতিষ্ঠা। তারপর পৃথিবী থেকে উজানধারায় উঠে যাওয়া। উৎক্রান্তি। evolution। অন্যভাবে দেখলে চেতনা যেন সংবৃত হল, গুটিয়ে এল, কুণ্ডলিত হল পৃথিবীতে। তারপর কুণ্ডলমোচন আরম্ভ হল। তাই পৃথিবী থেকে ওষধি, সেটাই অন্ন। এটা প্রথম বিবর্তন, transformation। সেখান থেকে বিবর্তনের ধারায় দেখা দিল চৈতন্যময় মানুষ। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় algae অ্যাল্‌জি, সমুদ্রশৈবাল থেকে মানুষ পর্যন্ত। মানুষই প্রথম আত্মসচেতন হল। পশু-মানুষ পর্যন্ত বিবর্তনের পর্ব অচেতন বা অর্ধচেতন। পরের পর্বগুলি সচেতন। এখান থেকে চৈতন্যের উজানধারা। প্রথম অন্নময় পুরুষ। তার অন্তরে প্রাণময় পুরুষ। প্রাণময় পুরুষের শরীর হল অন্নময় পুরুষ। এখানে কোষের কথা কোথাও নেই। তারপর সেই ভাবেই ক্রমশ মনোময়, বিজ্ঞানময় পুরুষ এবং অন্তে আনন্দময় পুরুষ। দুটি ধারাকে যদি পাশাপাশি রাখি তাহলে আকাশ থেকে অন্ন পর্যন্ত একটি ধারা, নেমে আসার ধারা। আর একটি উজিয়ে যাবার ধারা। অন্নময় পুরুষ থেকে আনন্দময় পুরুষ পর্যন্ত। তাহলে ঠিক সমান্তরাল তত্ত্বগুলি হল পৃথিবী অন্নময়, আপঃ প্রাণময়, অগ্নি মনোময়, বায়ু বিজ্ঞানময়, আর আকাশ আনন্দময়। একথাই উপনিষদে বলা হয়েছে। শঙ্করাচার্যও এটা লক্ষ্য করেছেন। সব ঠিক ঠিক মিলে যায়, কিন্তু বায়ু বিজ্ঞানময় একথা ঠিক বোঝা যায় না। চণ্ডীর প্রথম চরিত্রের দেবী যোগমায়া। তিনি inconscience অচেতনে কাজ করছেন। আমাদের মধ্যে তাঁর কাজ শুরু হচ্ছে, সেটা বিজ্ঞানের আভাস পেলেই জানতে পারি। সৃষ্টি আর প্রলয়ের বেলায় কিছু অংশ অচেতন আর কিছু সচেতন। পরমের দৃষ্টিতে সবই সচেতন। পৃথিবী অন্ন, আপঃ প্রাণ আর অগ্নি মন— এই সমীকরণ বেদে পাওয়া যায়— আপো বৈ প্রাণাঃ, অনেক জায়গায় আছে। বৃহদারণ্যকে আছে মনোজ্যোতির কথা। পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ আর দ্যৌঃ-তে সূর্য। সবই অগ্নি বা জ্যোতি। সচেতন জ্যোতি, আলো প্রথম দেখা দেয় মনে। তার প্রতীক অগ্নি। অগ্নির পরে বায়ু। তাই বলতে পারি

বিজ্ঞানময় পুরুষই বায়ু। এই বায়ুকে গ্রহণ করতে হবে বৈদিক অর্থে, অধিদৈবত অর্থে, ভৌতিক অর্থে নয়। বায়ুর তিনটি রূপ— বাত হল তার ভৌতিক রূপ। তার গভীরে আছেন বায়ু দেবতা। যেমন— বায়ুরনিলম্ অমৃতম্, ঈশ. ১৭। তারই উপরে আছে বায়ুর সূক্ষ্মতর রূপ, সেটি মরুদ্‌গণ। এগুলিকে সাংখ্যের ত্রিগুণের সঙ্গেও মেলানো যায়। বাত-তমোভাগ, বায়ু-রজোভাগ, আর মরুদ্‌গণ সত্ত্বভাগ। ঋগ্বেদে তিনটির উদ্দেশ্যেই সূক্ত আছে। মরুৎ শব্দের অর্থ হল— আলো ঝলমল—dazzling light। √স্মৃ বা √মৃ >স্মর, স্মৃতি, মরুৎ ইত্যাদি। মরুৎ চিন্ময় প্রাণ। এটাই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানময় পুরুষকে যখন পাই, তখন অধিদৈবত দৃষ্টি খুলে যায়। অধিদৈবত দৃষ্টিতে যে বায়ু এবং অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যে প্রাণ, তা বিশ্বব্যাপী হলে মরুদ্‌গণ। তাদেরও উপরে ইন্দ্র এবং বিষ্ণু। মরুদ্‌গণ আলোর ঝড়। ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করছে, আবরণশক্তিকে দূর করছে, অনাবৃষ্টি আর অন্ধকার দূর হচ্ছে। তারপরে প্রকাশিত হন বিষ্ণু— মধ্যগগনের সূর্য। মরুদ্‌গণ dynamic ক্রিয়াশক্তি। ইন্দ্রের সহচর তারা। শেষে পৌঁছলাম আকাশে। আকাশো বৈ আনন্দঃ।

আরম্ভ অন্নময় পুরুষ দিয়ে, দেহকে নিয়ে। তারপর ভিতরে ঢোকা— প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় পর্যন্ত। এটা অন্তরাবৃত্তির পথ। এখানে শুধু বলা হয়েছে— অন্তরাত্মা। কঠোপনিষদে আছে আবৃত্তচক্ষু-র কথা। 'কশ্চিত্ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষত্, আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বমিচ্ছন্।' কোন ধীর (বিবেকী পুরুষ) অমৃতের অভিলাষী হয়ে আবৃত্তচক্ষুঃ, অন্তর্মুখী হয়ে প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন, কঠ. ২।১।১। ভিতরের দিকে মোড়-ফেরানোর কথা। তার একমাত্র সাধন নিশ্চলতা। এটা সাধনার দিক দিয়ে বলা। শান্তিমন্ত্রেও আছে— স্থিরৈঃ অঙ্গৈঃ তুষ্টুঃবাংসঃ তনূভিঃ। অঙ্গকে স্থির করা, নিশ্চল হয়ে বসা। তৈ. উপনিষদ যোগ-উপনিষদ নয়, যজুর্বেদের উপনিষদ। এখানে প্রতীকী অর্থে দেখতে হবে। নিজেকে যূপ, বনস্পতিরূপে কল্পনা করতে হবে। তোমার মধ্যেই যেন একটি যূপ, বৃক্ষকাণ্ড আছে। মেরুদণ্ডই এই বৃক্ষকাণ্ড। তাতে, এই দেহে, অন্নময় আধারে ব্যাপ্ত অন্নময় পুরুষের কল্পনা করো। এটা বেদের ধারা। যোগ বা পতঞ্জলির ধারা হল— দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির হলে, তুমি যে চেতন হয়ে আছ, তোমার ভিতরে যে চৈতন্য আছে, তাকে অনুভব করতে হবে। তাকে, সেই পুরুষকে অনুভব করে, আরো ভিতরে ঢোকা, সাধনা তখন সহজ হয়। কোন rejection, প্রত্যাখ্যান নয়। এই অন্নময় পুরুষের মধ্যে নিজেকে স্থির করলে প্রাণময় পুরুষকে অনুভব করা যাবে। এভাবে ক্রমশ মনোময়, বিজ্ঞানময় পুরুষের ভিতরে আনন্দময় পুরুষকে অনুভব করা যাবে। যত ভিতরে ঢুকবো, ততো চৈতন্যের ব্যাপ্তি বাড়বে। এটাই বেদের পথ। বাইরের কিছু লুপ্ত হয় না। সাংখ্যের ধারাতে লোপ বা লয়ের ভাব

প্রবল। বেদের ধারা অন্তরতম ও ব্যাপ্ততম।

এখন আনন্দময় পুরুষের উপলব্ধির ফলশ্রুতি—

ওখানে গিয়ে এমন অবস্থাতে পৌঁছই, যেখানে অসদ্‌ব্রহ্ম আর সদ্‌ব্রহ্ম একসঙ্গে অনুভব হয়। অসদ্‌ব্রহ্মের অনুভব প্রথম, অনন্ত পরিব্যাপ্তি। সবকিছু মহাশূন্যে লীন হয়ে যায়, কিছুই থাকে না। এটা চরম অবস্থা। বুদ্ধদেবের নির্বাণ। আনন্দময় পুরুষের প্রথম দর্শন অসদ্‌ব্রহ্মের। সাংখ্যের অব্যক্ত। পরে তাকে প্রকৃতির সঙ্গে equate সমতুল্য করা হয়েছে। অব্যক্তের দর্শন যিনি করছেন, তিনি স্বয়ং অব্যক্ত। এটা সুষুপ্তির—জড়সমাধির জড়বৎ অনুভব। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপ্তিচৈতন্য, অনন্তের বোধ। সাংখ্যের পুরুষ এখানে অসদ্‌ব্রহ্ম। তার মধ্যে আত্মসচেতনতা জাগে। চেতনার গাঢ়তা intensity, তার মধ্যে যেন একটা কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া যায়। তখন সদ্‌ব্রহ্ম। উপমা এইরকম। প্রথম যেন অনন্ত অবর্ণ আকাশ। ন তত্রো কিঞ্চিত্ ভাতি। তার মধ্যেই সূর্যকে দেখছি। এই সূর্যের আলোই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। এই হল সদ্‌ব্রহ্মের— সর্বব্যাপী জ্যোতির্ময় চৈতন্যের উপলব্ধি। এই সূর্যের আলোকে সাংখ্যেরা বলতেন 'মহত্' তত্ত্ব। বৌদ্ধেরা বলতেন, আভাস্বর চেতনার ভূমি। নির্বাণভূমির নীচে। আনন্দ পৌঁছয় অব্যক্ত প্রকৃতিতে। তাতে আবিষ্ট যে পুরুষ, সেই হল অসদ্‌ব্রহ্ম। বৌদ্ধেরা বাস্তবিক frankly speaking অসদ্ ব্রহ্মবাদী, শূন্যবাদী। নৈয়ায়িক ও বেদান্তবাদীরা সদ্‌ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মকে সৎরূপে অনুভব করেন। অনুভবের দিক থেকে বলা যায়, অসদ্‌ব্রহ্মেই সৎ ফুটে ওঠে। অব্যক্ত প্রকৃতি ও অব্যক্ত পুরুষের একসঙ্গে অনুভব হয়। এখানে বলা হয়েছে, যে অসদ্‌ব্রহ্মকে জানে, যে জ্যোতির্ময় অব্যক্তকে জানে, সে অসৎই হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, কালাপানিতে গেলে জাহাজ ফিরে আসে না। এটাই মহাপ্রলয়। ব্রহ্মসূত্রে আছে, অনাবৃত্তির কথা—ন পুনরাবর্ততে। গীতাতেও এই ভাব আছে। যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ ধাম পরমং মম, গী. ৮।২১। যেখানে পৌঁছে আর এই জগতে ফিরে আসতে হয় না, ভক্ত, আমার সেই পরম ধামকে পায়। শঙ্করমতের বৈদান্তিকরা কিন্তু সৎ-চিৎ-ব্রহ্মবাদী। সৎ-চিৎ-একং ব্রহ্ম। অবশ্য তাঁর শিবোঽহম্ স্তোত্রে শঙ্কর আনন্দকে স্বীকার করেছেন। চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্। সাংখ্যেরাও সৎ-চিৎ-বাদী। ওখানে অসদ্‌ব্রহ্মে নির্বাণভূমিতে পৌঁছে সেখান থেকে ফিরে এসে সব-কে পাওয়া, এটাই পূর্ণদর্শন। এটাই তৈত্তিরীয় উপনিষদের অভিপ্রেত।

এরপরে সমস্তে যে হারিয়ে গেল, সেই অসৎ অক্ষর অব্যক্ত থেকে অস্তি-ব্রহ্মে ফিরে আসা, এটাই সদ্‌ব্রহ্মের ভাব। তখন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ভাব প্রকট হয়। বৃহদারণ্যকে (বৃ. ১।৪।১০) আছে, 'ব্রহ্ম অবেদ্ অহং ব্রহ্মাস্মি ইতি।' সর্বব্যাপী অস্মি। অহম্ অস্মি ভো। এটাই সর্ব-অস্মিতার মূল। আদি অস্মিতা। পাঁচটি ক্লেশের মধ্যে প্রথম হল অবিদ্যা।

অবিদ্যার পরে অস্মিতা। অবিদ্যার অস্মিতা না হয়ে বিদ্যার অস্মিতা হলে সেটা হবে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ভাবের পোষক। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, বিদ্যার আমি। এই অনুভব হলে যে অবস্থা দাঁড়াবে, সেটি নির্বাণভূমির একধাপ নীচে। বৌদ্ধদের মতে, 'নৈব সংজ্ঞা নৈব অসংজ্ঞা'র ভূমি।

উপনিষদ বলছেন, তখন সবাই তাকে সৎ বলে জানে। অর্থাৎ তিনি ফিরে এলেন। লোকে তাঁকে জানতে পারে। এখানকার 'সন্তম্' কথা থেকেই পরে উত্তরভারতে মরমীয়াদের বলা হয় সন্ত্। অসৎ-কে দেখে তাঁরা ফিরে এসেছেন, সৎ-কেও দেখেছেন আর সন্ত্ হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাধিতে তলিয়ে যাচ্ছিলেন, আর মা তাঁকে বললেন, তুই ভাবমুখে থাক্।

শঙ্করাচার্য অসতের ব্যাখ্যা করেছেন নাস্তি বলে, আর সৎ-কে অস্তি বলেছেন। এটা সাধারণ ব্যাখ্যা।

এই অনুভব যার হয়েছে, অর্থাৎ আনন্দময় পুরুষের অনুভব যে দেহে হয়েছে, সে বিজ্ঞানময়ের আত্মা আনন্দময়। অর্থাৎ সে আনন্দময়, বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় এবং অন্নময় একই সঙ্গে। যোগশক্তি সবার মধ্যে উপসংক্রান্ত হচ্ছে।

> **অথ অতঃ অনুপ্রশ্নাঃ। উত অবিদ্বান্ অমুং লোকং প্রেত্য কশ্চন গচ্ছতি-ই-ই (গচ্ছতী প্লুত)??? আহো বিদ্বান্ অমুং লোকং প্রেত্য কশ্চিত্ সম্ অশ্নুতা-অ-আ-ই (সম্ অশ্নতে প্লুত) উ??? ২।৬।২**

উভয়ত প্লুতস্বরকে ভেঙে দেখানো হল।

আচার্যের কাছে এইরকম উপদেশ শোনার পর শিষ্য এইসব প্রশ্ন করছে— আচ্ছা, অবিদ্বান পুরুষ এই লোক ত্যাগ করার পর অর্থাৎ দেহাবসানের পরে কি ঐ লোক অর্থাৎ ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে লাভ করেন? না, করেন না? এবং বিদ্বান্ও কি এই লোক ত্যাগ করার পর ঐ লোক ভোগ করেন? নাকি করেন না? ২।৬।২

আনন্দময় পুরুষ পর্যন্ত সব শোনার পর শিষ্য দু-চারটি প্রশ্ন করছেন। দুটি প্রশ্নের মধ্যেই দুটি করে ভাগ আছে। তাই অনুপ্রশ্নাঃ। বহুবচনে প্রয়োগ। যিনি অবিদ্বান, যিনি আগের এইসব কথা জানেন না, তিনি প্রেত্য চেতনাকে অতিক্রম করে উজিয়ে গেলে অর্থাৎ দেহত্যাগের পরে কি তিনি অমুং লোকং ঐ লোকে অর্থাৎ আনন্দময় ব্রহ্মলোকে পৌঁছন? না, পৌঁছন না? দ্বিতীয় প্রশ্ন হল— আহো কশ্চিত্ বিদ্বান্ অমুং লোকং প্রেত্য— এখানে প্রেত্য শব্দের অর্থ চেতনার উত্তরণ বা উজিয়ে যাওয়া। শঙ্করাচার্যাদি

ভাষ্যকারগণ দুটি প্রশ্নের বেলায় একই অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ 'দেহত্যাগের পর' অবিদ্বান ও বিদ্বান— দুজনেরই কি একই অবস্থা হয়? কিন্তু বিদ্বানের বেলায় প্রশ্নের মধ্যেই আছে কশ্চিত্ সমশ্নুতে, অর্থাৎ বিদ্বানের চেতনা 'উজিয়ে গেলে' তার কি আনন্দব্রহ্মের সম্যক্ সম্ভোগ হয়? না হয় না? চেতনা যদি অসদ্‌ব্রহ্মে লীন হয়ে যায় তাহলে সম্ভোগ হয় না। সদ্‌ব্রহ্মে থাকলে বা ফিরে আসলে তার সম্যক্ সম্ভোগ হয়। তখন আনন্দময় শরীরই কারণশরীর। যেমন ঈশ. উ. আছে, বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যা অমৃতমশ্নুতে। অসম্ভূতিতে উঠে গিয়ে সম্ভূতিতে ফিরে আসতে হয়। তখন 'এই শরীরেই' অমৃত সম্ভোগ হয়।

এরপরে আচার্য শিষ্যকে সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝাচ্ছেন। ভিতরে না ঢুকলে সৃষ্টিরহস্য বোঝা যায় না। অসদ্‌ব্রহ্ম পর্যন্ত পৌঁছে সম্ভোগের সম্ভাবনা নিয়ে ফিরে এসেছেন যিনি, তিনি সৃষ্টিকে বোঝেন। এখানে এসে তিনি দেখেন, যেন সবকিছু উপর থেকে নির্ঝরিত হচ্ছে। এর পরের অংশে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। আত্মবিৎ ব্রহ্মবিৎ পুরুষ নিজের মধ্যেই এই প্রক্রিয়া অনুভব করেন। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, অধিব্রহ্ম দৃষ্টিতে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম থেকে কিভাবে সৃষ্টি নির্ঝরিত হচ্ছে, সেই কথা আচার্য শিষ্যকে বলছেন।

> **সঃ অকাময়ত— বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি। স তপঃ অতপ্যত। স তপঃ তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত। যত্ ইদং কিং চ। তত্ সৃষ্ট্বা তদ্ এব অনুপ্রাবিশত্। তদ্ অনুপ্রবিশ্য সত্ চ ত্যত্ চ অভবত্। নিরুক্তং চ অনিরুক্তং চ। নিলয়নং চ অনিলয়নং চ। বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ। সত্যং চ অনৃতং চ। সত্যম্ অভবত্। যত্ ইদং কিং চ। তত্ সত্যম্ ইতি আচক্ষতে। তদপি এষ শ্লোকঃ ভবতি।।— ২।৬।৩**

তিনি কামনা করলেন— আমি বহু হব; আমি উৎপন্ন হব অর্থাৎ আমি বহু প্রজার সৃষ্টি করব। তিনি তপ করলেন। তপ করে এই যা-কিছু আছে সব সৃষ্টি করলেন। এই সব সৃষ্টি করে তিনি তার মধ্যেই প্রবেশ করলেন। অনুপ্রবিষ্ট হয়ে 'সৎ' এখানে যা আছে আর 'ত্যৎ' ওখানে যা আছে— সব হলেন। ব্যক্ত আর অব্যক্ত হলেন। সাশ্রয়, সালম্ব, আর অনাশ্রয়, নিরালম্ব হলেন। জ্ঞানময় আর অজ্ঞানময় হলেন। সত্য আর মিথ্যা হলেন। সত্য ও মিথ্যার ঊর্ধ্বে পরম সত্য হলেন। এখানে যা কিছু আছে সব হলেন। তাই এই সব কিছু সত্যেই আছে, এইরূপ বলা হয়। সে বিষয়েও এই শ্লোক আছে। ২।৬।৩

এটা সৃষ্টি প্রকরণ। আগে যেসব কথা ইঙ্গিতে বলা হয়েছিল, এখানে সেগুলি

স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে।

আগে ব্রহ্ম থেকে সৃষ্টি এবং আত্মাতে তার অনুভব কিভাবে হয়, তা বলা হয়েছিল। এখন আত্মা থেকেই সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে। আগে সৃষ্টির পরম্পরা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত নেমে এসে, পরে পৃথিবী থেকে ওষধি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে অন্নময় পুরুষ পর্যন্ত এবং তারও পরে অন্নময় পুরুষ থেকে আনন্দময় পুরুষ পর্যন্ত উজিয়ে যাবার ধারা বলা হয়ে গেছে। তারপরে সঃ অকাময়ত। আনন্দময় পুরুষই এখানে 'সঃ'।

সৃষ্টি তাঁর আনন্দ থেকেই হয়েছে, সেকথা আমরা পরের অনুবাকে পাব। এখানে আরেকটি কথা উল্লেখনীয়। পরে ভৃগুবল্লীতে ষষ্ঠ অনুবাকে ভার্গবী-বারুণী বিদ্যাতে বলা হয়েছে— আনন্দং ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাত্। অনেকে এটা ধরে আনন্দ থেকে সৃষ্টির কথা বলেন, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। এই কথা থেকে সেটা প্রমাণিত হয় না। কারণ, বিজ্ঞান-মন-প্রাণ-অন্ন বিষয়ে একই পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আনন্দ থেকে সৃষ্টি— সেটা এখানে আভাসেই বলা হয়েছে। ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্— এটাই ঠিক। আনন্দের কথা আত্মার বেলাতেই ব্যবহৃত হয়েছে। এই বল্লীরই অষ্টম অনুবাকে আনন্দ-মীমাংসায় আনন্দের কথা বিশদভাবে আসবে। তাহলে আগের আর এখনকার সৃষ্টিতত্ত্বের ক্ষেত্রে পার্থক্যটা কি? আগে সত্যের খ্যাপনমাত্র করা হয়েছিল। যুক্তি বা অনুভবের পরম্পরা নেই। তত্ত্বের বিন্যাসমাত্র ছিল। তারও মূলে যা আছে, সে বিষয়ে এখন বলা হচ্ছে। তত্ত্বের পরম্পরাতেও প্রেরণা কার বা প্রেষণা কোথা থেকে আসে, সেটাই এখানে বলা হচ্ছে। আত্মা থেকেই, আনন্দময় পুরুষ থেকেই সৃষ্টির প্রেরণা আসছে।

দ্বিতীয় কথা হল, সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝতে হলে এমন জায়গাতে যেতে হবে, যেখানে সৃষ্টি নেই। কাজেই উজিয়ে না গেলে সৃষ্টি বোঝা যায় না। অন্নময় পুরুষ থেকে আনন্দময় পুরুষ পর্যন্ত উজিয়ে গিয়ে, পরে সেই আনন্দময় পুরুষের আনন্দের যে উৎসারণ সেটাই সৃষ্টি। আনন্দরূপং ব্রহ্মণো যদ্বিভাতি। সবই ব্রহ্মের আনন্দরূপ। আনন্দ-ব্রহ্মের রূপ। উপনিষদগুলিতে আনন্দবাদের সমর্থক যে উক্তিগুলি আছে, তার মূল এখানে। আগে আনন্দ, পরে কাম, তপঃ। আত্মা ও ব্রহ্ম একাকার। তখন আমিই আনন্দময় পুরুষ। তখন দেখছি, আমার থেকেই সৃষ্টির উৎসারণ হচ্ছে।

এখন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সৃষ্টি বোঝানো হচ্ছে। তার গোড়াতেই আত্মারামতার কথা। সঃ— আনন্দময় পুরুষ, যাকে জানলে অসদ্‌ব্রহ্ম আর সদ্‌ব্রহ্মের বিজ্ঞান আমাদের মধ্যে জ্বলে ওঠে, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলে কিরকম করে সৃষ্টি হয়, বুঝতে পারি। সঃ বলতে এখানে আত্মা বা পুরুষকে বোঝানো হয়েছে। আত্মা ও ব্রহ্ম কিন্তু

অভিন্ন। অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত দৃষ্টি পাশাপাশি রাখা হয়েছে। এখনকার কথাগুলি আনন্দ ও বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি।

সঃ অকাময়ত— তিনি কামনা করলেন। অন্যত্র আছে স ঐক্ষত (ঐ. উ. ১।১।২) ঈক্ষার কথা। এখানে কামের পরে তপঃ-এর কথা আছে। সৃষ্টির প্রেষণার মূলে তিনটি ভাব— কাম, ঈক্ষা আর তপঃ। কাম সবথেকে পুরাতন। ঋগ্বেদে নাসদীয়সূক্তে আছে। অথর্বে শৌনকসংহিতায় কামসূক্তে তার বিস্তার আছে। 'ঈক্ষা' চেয়ে দেখা, চেয়ে থাকা— দৃষ্টিতে সৃষ্টি। পরে তপঃ। তন্ত্রে ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রথমে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে— পুরুষ ও প্রকৃতি। পরে এই দুটিকেই তিনটি করে মোট ছ'টি তত্ত্বে বিভক্ত করা হয়েছে। পুরুষ— সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ আর প্রকৃতি— ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াস্বরূপিণী। ইচ্ছা হল কাম, জ্ঞান ঈক্ষা, আর ক্রিয়া তপঃ। আবার সঃ অকাময়ত— এটাই ব্রহ্মক্ষোভ। আকাশে প্রথম স্পন্দ। এখানে ঈক্ষার কথা বাদ দেওয়া হয়েছে। কোথাও কাম আগে, ঈক্ষা পরে। আবার কোথাও ঈক্ষা আগে, কাম পরে। কামের সঙ্গে যুক্ত আছে আনন্দতত্ত্ব এবং ঈক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞান। অন্যত্র আছে, যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। সাধারণত মনে হয়, আগে জ্ঞান, পরে কাম। কিন্তু আসলে আগে কাম,পরে জ্ঞান। সঃ অকাময়ত, (অহং) বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি। মূল এক অহম্, তিনিই বহু হচ্ছেন। তাঁর মধ্যেই বহু হবার, বিচিত্রভাবে প্রকট হবার কামনা জাগছে। অহম্ 'বহু' বিচিত্র হচ্ছেন, কিন্তু তার একটা সীমা আছে। সৃষ্টি— √সৃজ্ উৎসারণ outflow। সৃষ্টি হল আত্ম-উৎসারণ। প্রতপ্ত হওয়া তার ক্রিয়া। স তপঃ অতপ্যত— তিনি তপ করলেন। ঋগ্বেদে অঘমর্ষণ সূক্তে তপঃ-কে সৃষ্টির মূলে রাখা হয়েছে। মূলে আছেন সঃ— তাঁর শক্তি হল কাম আর তপঃ। তাঁর মধ্যে যে বহু হবার ইচ্ছা, সেটাই ঈক্ষা। ঈক্ষার পরে তপঃ। বিজ্ঞানের ভাষায় এটা তেজস্ক্রিয়া Radio-activity। তার মধ্যে গুটিয়ে আসা এবং বিকিরণ একই সঙ্গে চলে। ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ— ঈশ ১৬।

এভাবে তপ করে তিনি এখানে যা আছে, সবকিছু সৃষ্টি করলেন। তত্ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশত্। সৃষ্টি করে সেই সৃষ্টির মধ্যেই তিনি অনুপ্রবেশ করলেন। এখানে অনুপ্রাবিশত্ পদের দ্বারা কালের কথা এসেছে। প্রথম সৃষ্টি, তারপর অনুপ্রবেশ। কিন্তু এটা প্রাতিভাসিক। এই পারম্পর্য যথার্থ real নয়। তিনি সবসময়ই যা ছিলেন আর যা হচ্ছেন, তাতে প্রবিষ্টই ছিলেন। দুটো তত্ত্ব ওতপ্রোত। বিভক্ত হলে একটি তত্ত্ব তটস্থ থাকে, অপরটি সক্রিয়। তারপর alternately পরস্পরকে জোর দেয়। প্রথমে পুরুষ থেকে প্রকৃতি, সৃষ্টি উন্মীলিত হয়, পরে পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করেন। শক্তি energy একই সঙ্গে সম্ভাবনাময় potential আর ক্রিয়াশীল kinetic। পুরুষকে, চৈতন্যকে প্রকৃতির অধীন করা যায় না। একটা অতিষ্ঠাতত্ত্ব সর্বদাই থাকে। প্রকৃতির

রঙ পুরুষে লাগে কিন্তু অতিষ্ঠা-তত্ত্ব থেকেই যায়। শেষে প্রকৃতি পুরুষে লয় হয়ে যায়। পুরুষ সর্বদা আত্মপ্রতিষ্ঠ এবং প্রকৃতি পুরুষে লয় হবার জন্য প্রস্তুত।

তদের অনুপ্রাৱিশত্— অনু শব্দের অর্থ পরপর one after another অথবা সঙ্গে সঙ্গে along with হতে পারে। প্রত্যেকের ভিতরে তিনি প্রবেশ করলেন। এখন একটা dichotomy দ্বৈধভাব দেখা দেয়। এখন একদিকে সব স্থির, অন্যদিকে সব অস্থির। তিনি সৎ হলেন, আর ত্যত্ হলেন। সৎ— যা কিছু আছে। সব যেন ফুরিয়ে যায় না বলে, যা কিছু বাইরে থেকে গেল, তাই হল ত্যৎ। বৃহদারণ্যকে ব্রহ্ম বিষয়ে এই কথা বলা হয়েছে— তিনি সচ্চ ত্যচ্চ। যেটা অব্যক্ত সেটাই ত্যৎ। ঋগ্বেদে আছে, স ভূমিং ৱিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠত্ দশাঙ্গুলম্— ১০।৯০।১। এই অতিষ্ঠাতত্ত্বই ত্যৎ। নিরুক্তং চ অনিরুক্তং চ। যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা যায়, যার বর্ণনা করা যায়, তা নিরুক্ত। যার সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না, যিনি অচিন্ত্য, অবর্ণনীয়, যাকে শব্দে বা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না তা অনিরুক্ত। বেদে অনিরুক্ত স্তোভ আছে। হুম্। প্রজাপতি তার ভিতরে নিহিত আছেন। ঐশী প্রেরণা অনিরুক্ত। নিলয়ং চ অনিলয়ং চ। নিলয়ন— জগৎকে দেখছি, দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। সূর্য অস্ত গেল, কিন্তু কোথায় গেল? আকাশে বায়ুর কোথায় শেষ? যেখানে যায় সেটাই নিলয়ন। এটাই গর্ভাশয়। গীতায় আছে— মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম। এমন জায়গা কি হতে পারে না, যেখানে সৃষ্টি ব্যাপার নেই? এটাই অনিলয়ন— অসম্ভূতি। সম্ভূতি হল যেখান থেকে সৃষ্টি সম্ভব হয়। অসম্ভূতি eternally undisturbed এমন একটি স্থান, যেখানে কিছুই হচ্ছে না। পুরুষসূক্তে এই ভাব আছে। পাদঃ অস্য ৱিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদ্ অস্য অমৃতং দিৱি। ১০।৯০।৩ এইসব কথা cosmic বিশ্বাত্মক দৃষ্টিতে বলা হয়েছে। একদিকে মহাশূন্য, আরেকদিকে প্রকৃতি সৃষ্টি-উন্মুখ। আমি দেখছি, আমার বেলায় এটা হবে ৱিজ্ঞানং চ অৱিজ্ঞানং চ। কেনোপনিষদের ৱিজানত্ আর অৱিজানত্। পতঞ্জলির সম্প্রজ্ঞাত আর অসম্প্রজ্ঞাত। মানুষ সর্বজ্ঞ হতে পারে না। অসম্প্রজ্ঞাত অজানা থেকেই যায়। আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে প্রথম সিদ্ধদশার, নিত্য সিদ্ধদশার কথা, সৎ থেকে নিলয়ন পর্যন্ত। দ্বিতীয় হল, সাধকদশার কথা— বিজ্ঞানং চ অৱিজ্ঞানং চ। তৃতীয় হল, একেবারে ব্যবহারিক জগতের কথা— সত্যং চ অনৃতং চ। সত্য মিথ্যা— সাচ্চা ঝুটা দুইই তিনি। একথা শঙ্কর সুন্দরভাবে বলেছেন— সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য। সত্য মিথ্যা মিশিয়ে জগদ্ব্যবহার চলে।

মাণ্ডুক্য উপনিষদের দৃষ্টিতে দেখলে প্রথম সুষুপ্তিদশার অনুভব, দ্বিতীয় স্বপ্নদশার অনুভব, তৃতীয় জাগ্রত অবস্থার অনুভব। সব কিছুই psychological মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখা।

পরের অন্বয় হবে— সত্যম্ অভবদ্ যদ্ ইদং কিং চ। আগে বলা হয়েছিল সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম। সেই সত্যই এই সব কিছু হয়েছেন। 'তৎ সত্যম্ ইতি আচক্ষতে'— তাই সবকিছুকে সত্য বলা হচ্ছে। ছান্দোগ্যে বলা হয়েছে— সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলছেন— সবই সতে প্রতিষ্ঠিত। তার জন্য এই শ্লোক আছে।

সপ্তম অনুবাক

অসত্ বৈ ইদম্ অগ্রে আসীত্। ততঃ বৈ সত্ অজায়ত। তদ্ আত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত। তস্মাত্ তত্ সুকৃতম্ উচ্যতে ইতি। যত্ বৈ তত্ সুকৃতম্, রসঃ বৈ সঃ। রসং হি এব অয়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি। কঃ হি এব অন্যাত্ কঃ প্রাণ্যাত্। যত্ এষ আকাশে আনন্দঃ ন স্যাত্। এষ হি এব আনন্দয়াতি। যদা হি এব এষ এতস্মিন্ অদৃশ্যে অনাত্ম্যে অনিরুক্তে অনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সঃ অভয়ং গতঃ ভবতি। যদা হি এব এষ এতস্মিন্ উদরম্ অন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ তু এব ভয়ং বিদুষঃ অমন্বানস্য। তদপি এষ শ্লোকঃ ভবতি।। ২।৭।।

'ইদম্'— এই অভিব্যক্ত জগৎ সৃষ্টির আগে অসদ্ ব্রহ্মই ছিলেন। তার থেকেই সদ্ ব্রহ্ম উৎপন্ন হলেন। তিনি নিজেই নিজেকে এইভাবে সৃষ্টি করেছিলেন। সেজন্য তাঁকে সুকৃত, স্বয়ং-কর্তা,— সুকর্মকৃত্ বলা হয়।

এই যে তাঁর সুকৃত সদ্ব্রহ্ম, তিনি রসস্বরূপ। ঐ রস লাভ করে এই জীবাত্মা আনন্দিত হয়। এই আকাশে হার্দাকাশে, চিত্তাকাশে বা মহাকাশে যদি এই আনন্দ না থাকত, তাহলে কেই বা অপানক্রিয়া করত, আর কেই বা প্রাণন ক্রিয়া করত। এই রসস্বরূপ সদ্ব্রহ্ম পরমাত্মাই সবাইকে আনন্দিত করেন। যখনি এই জীবাত্মা ঐ অদৃশ্য, অশরীরী, অনির্বচনীয় অনিকেত বা নিরাধার ব্রহ্মে নির্ভীকভাবে, নিশ্চিন্তভাবে স্থিতিলাভ করেন, তখনই তিনি অভয় লাভ করেন। আর যখনই এই জীবাত্মা তাঁর থেকে অল্পমাত্র অন্তর বা ভেদ দর্শন করেন, তখনই তাঁর ভয় হয়। এই ভেদজ্ঞানই অবিবেকী, অভেদজ্ঞানহীন সাধারণ জ্ঞানীর জন্য ভয়ের কারণ হয়। এই বিষয়েও একটি শ্লোক আছে।। ২।৭।।

অসত্ বৈ ইদম্ অগ্রে আসীত্। ততঃ বৈ সত্ অজায়ত।

অসত্ ব্রহ্মই আগে ছিলেন। তাঁর থেকে সদ্ব্রহ্ম উৎপন্ন হলেন। ঋগ্বেদে আছে—

অসত্ চ সত্ চ পরমে ব্যোমন্ ১০।৫।৭। অসত্ আর সত্ দুইই পরম ব্যোমে ছিলেন। আবার সৃষ্টিপ্রকরণে এ-ও আছে, ন অসত্ আসীত্ ন সত্ আসীত্ তদানীম্— ১০০।১২৯।১। তখন না ছিল অসৎ, না ছিল সৎ। কিন্তু কিছু ছিল। তম আসীত্ তমসা গূঢ়ম্ অগ্রে, আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদেকম্— ১০।১২৯।৩, ২। তিনিই কেবল গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ছিলেন আর নিজের স্বধা, আত্মশক্তি দিয়ে বায়ুহীন স্থানে নিঃশ্বাস ফেললেন। অন্যত্র সৃষ্টিপ্রকরণে এমন কথাও আছে— অস্য মহাভূতস্য নিঃশ্বসিতম্। ঐ মহাভূতের নিঃশ্বসিত এই সৃষ্টি। অর্থাৎ কোন এক অদৃশ্য অব্যক্ত অনির্বচনীয় গূঢ় তত্ত্ব থেকেই সৃষ্টির প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। তাই এখানে বলা হল, অব্যক্ত অসৎই আগে ছিলেন। তার থেকে সৎ ব্যক্ত উৎপন্ন হল। এই অসৎই ত্যত্ বা তত্। তিনি অব্যক্ত, অনিরুক্ত, অ-নিলয়ন। অসৎ থেকে সৎ আর সৎ থেকে যা বেরিয়ে আসছে তা সবই সৎ। 'ত্যৎ' অসৎ থেকে সৎ যে উৎপন্ন হলেন, এটা তিনি স্বয়ম্ অকুরুত। 'ব্যাকৃত' বি—আ—√কৃ ব্যবহার উপনিষদে অনেক জায়গায় আছে। বিশেষ বিশেষ আকার তিনি ধারণ করলেন। ত্যৎ স্বয়ং নিজেকে নামরূপে ব্যাকরবাণি— বিশেষ বিশেষ নাম ও রূপে আকারিত করলেন। এটাই তাঁর বহু হওয়া। সেজন্য তাঁর নামই হল 'সুকৃত'। তিনি স্বয়ং করছেন বলে সুকৃত। আর যা হয়েছে তাও সুকৃত। তাহলে সৃষ্টির ক্রম হবে এই রকম— অসৎ অতিষ্ঠাতত্ত্ব। সৎ প্রতিষ্ঠাতত্ত্ব। আর সুকৃত ক্রিয়াতত্ত্ব। এই সব তিনিই বলে, তিনিও সুকৃত। *যদ্ বৈ তত্ সুকৃতম্*— তৎ বেদে অনির্বচনীয়। এই যে তিনি সুকৃতম্ হলেন, তিনিই হলেন রসঃ। আগে যা ছিল আনন্দ, তাই এখন হল রস। আগে urge, কামরূপে শক্তিরূপে প্রবেশ করেছিলেন— অনুপ্রাবিশত্। এখন তিনি রসস্বরূপ হলেন। কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি ঋ. ১০।১২৯।৪। এই তাঁর আদিকাম। যার থেকে সৃষ্টি। সোঽকাময়ত বহু স্যাম্ ইতি তৈ. ২।৬। ঋগ্বেদে, উপনিষদে একেই মধ্বদ, পিপ্পলাদ পুরুষ বলা হয়েছে। সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সবকিছু যিনি রসরূপে আস্বাদন করছেন। তুমি যখন আনন্দ পাও, তখন এই রসই লাভ কর। এই রস সর্বত্র রয়েছে। সত্যং চ অনৃতং চ, এর মধ্যেও রস রয়েছে। বৈষ্ণবদর্শনে এই আনন্দকে রতি বলা হয়। সেটা প্রকৃতিতত্ত্ব। এখানে আনন্দই প্রকৃতিতত্ত্ব। কিন্তু রস ও আনন্দ পুরুষ ও প্রকৃতি দুয়ের মধ্যেই আছে। আনন্দময় পুরুষ প্রকৃতির মধ্যেও আনন্দ সম্ভোগ করেন। এটাই রসিক পুরুষের রসতত্ত্ব। রাধিকার সম্ভোগ যিনি করেন, তিনিই রসিক। রাধিকা তখন আনন্দতত্ত্ব। আনন্দেরও ঊর্ধ্বে রস। সেই পুরুষের রস। সেই রসিক— পুরুষের ছোঁয়া পেলে সবাই আনন্দী হয়।

এখানে আকাশ তৎস্বরূপ, মহাভূত, পুরুষ। আর আনন্দ প্রকৃতি। আকাশ ও আনন্দ একটা মিথুন। মৈত্রায়ণী উপনিষদে আছে— আকাশো বৈ ব্রহ্মযোনিঃ। ব্রহ্মসূত্রে

আছে আকাশস্তল্লিঙ্গাত্। আনন্দরসের ছোঁয়া পেলেই সবকিছু, সবাই উল্লসিত হয়, সবই সুকৃত হয়।

বলা হচ্ছে, আকাশে এই আনন্দ না থাকলে কে শ্বাস-প্রশ্বাস নিত? কেই বা বাঁচত? এখান থেকে উজিয়ে যাবার কথা আসছে। যখন রসিকশেখর স্পর্শ করেন, যখন সবকিছু আনন্দময় হয়ে যায়, তখন বাইরের জগতে সবচেয়ে বড় বাধা হল ভয়। পতঞ্জলিতে আছে— অন্ধতামিস্র, অন্ধতা, অজ্ঞতার চরম হল ভয়। ভয়ের কারণ হল অভিনিবেশ, আঁকড়ে ধরা, আসক্ত হয়ে ডুবে থাকা। এই ভয় কাটবে কিসে? আনন্দে কাটবে না, রসের ছোঁয়া পেলেও যাবে না। যাবে, যখন অতীন্দ্রিয় অদৃশ্য অনির্বচনীয় অ-নিলয়ন অনাত্মাতে (বৌদ্ধ পরিভাষায়) পৌঁছবে। বাক্ সেখানে যায় না, মনও যায় না। সেখানে গেলেই অভয়ং ৱিন্দতি, অভয়কে পাব। তখনি ভয় যাবে। মৃত্যুভয়ই হল সবথেকে বড় অভিনিবেশ। সব সময়ে মরে থাকলেই ভয় থাকবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, সবসময় মৃত্যুচিন্তা নিয়ে থাকবে। এক মুহূর্তের জন্যেও সে মহাশূন্য থেকে বিচ্যুত হলেই ভয় ধরবে। প্রত্যেক সঙ্গের contact-এর একটা সীমা limitation, ভেদরেখা আছে। তখনি মায়া জন্মায়। তখন তার থেকে পৃথক হয়ে যাবার ভয় থাকে। ৱিদুষঃ— জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞানী হয়নি। সেইরকম অল্পজ্ঞ অপক্ক জ্ঞানী (ৱিদুষঃ অমন্বানস্য) যিনি মনন করেননি। বিদেহ-ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত না হলে অভয় হয় না। তার জন্য এই শ্লোক আছে। ২।৭

অষ্টম অনুবাক

ভীষা অস্মাত্ ৱাতঃ পৱতে। ভীষা উদেতি সূর্যঃ। ভীষা অস্মাত্ অগ্নিঃ চ ইন্দ্রঃ চ। মৃত্যুঃ ধাৱতি পঞ্চমঃ।। ২।৮।১

এই পরব্রহ্ম বা পরমাত্মার ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হয়। তাঁরই ভয়ে সূর্য উদিত হন। তাঁরই ভয়ে অগ্নি ও ইন্দ্র এবং পঞ্চম দেবতা মৃত্যুও ছুটে চলেছেন। ২।৮।১

এই মন্ত্রের ভাবার্থ উল্টোদিক থেকে ধরতে হবে। প্রথম দেবতা সূর্য। তিনি সুকৃত। কিন্তু সেখানেও ভয় আছে। তার নীচের দেবতা ইন্দ্র। প্রাণ ও মনের দেবতা। তৃতীয় বাত বা বায়ু। তিনি পৃথিবীঘেঁষা অন্তরিক্ষের দেবতা, দেহাশ্রিত প্রাণ। সেখানেও ভয় আছে। চতুর্থ দেবতা অগ্নি, পৃথিবী-দেবতা। ভয় সেখানেও আছে। সূর্য পর্যন্ত জীবন। প্রাণঃ প্রজানাম্ উদয়তি এষ সূর্যঃ (প্রশ্ন)। তার বিপরীত দিকে মৃত্যু। সেখানেও ভয় আছে। মৃত্যুর ওপারে কি আছে? এই মৃত্যু হল সবকিছুর নিলয়ন। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অগ্নি

চিদগ্নি, fire of aspiration, অভীপ্সার আগুন। বায়ু হল life-force, জীবনীশক্তি, প্রাণ। ইন্দ্র will power, সংকল্প-শক্তি, বীর্য, শৌর্য। সূর্য বিজ্ঞান। সব লয় হয়ে যায় মৃত্যুতে। সেখানেও ভয়। তাঁর প্রশাসনের ভয়। Divine Law-এর ভয়। 'এতস্য অক্ষরস্য' প্রশাসনের ভয়। দেবতারাও ভয় পান। কঠোপনিষদেও ঠিক এইরকম মন্ত্র আছে— ভয়াদস্য অগ্নিস্তপতি.. মৃত্যুর্ধাৱতি পঞ্চমঃ, কঠ. ২।৩।৩। দেবতাদেরও অধিকার চলে যাবার ভয় আছে। অভয় আছে শুধু অ-নিলয়নে, সেই অনিরুক্ত, অনির্বচনীয়, অনন্ত ব্রহ্মে, পরমাত্মাতে— মৃত্যুরও ওপারে যিনি রয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়— জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। উপনিষদের ভাষায়— যিনি অকামহত শ্রোত্রিয়, তিনিই সম্পূর্ণ ভয়শূন্য— অভয়— পরমানন্দের অধিকারী। এর পরেই তাঁর কথা— আনন্দমীমাংসা।

> সা এষা আনন্দস্য মীমাংসা ভৱতি। যুৱা স্যাত্ সাধুযুৱা। অধ্যায়কঃ আশিষ্ঠঃ দ্রঢ়িষ্ঠঃ বলিষ্ঠঃ। তস্য ইয়ং পৃথিৱী সৰ্ৱা ৱিত্তস্য পূর্ণা স্যাত্। স একঃ মানুষঃ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষাঃ আনন্দাঃ। স একঃ মনুষ্যগন্ধৰ্ৱাণাম্ আনন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য।। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধৰ্ৱাণাম্ আনন্দাঃ স একঃ দেৱগন্ধৰ্ৱাণাম্ আনন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য তে যে শতম্ দেৱগন্ধৰ্ৱানাম্ আনন্দাঃ, স একঃ পিতৃণাং চিরলোক-লোকানাম্ আনন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য।। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোক-লোকানাম্ আনন্দাঃ, স একঃ আজানজানাং দেৱানাম্ আনন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য।। তে যে শতম্ আজানজানাং দেৱানাম্ আনন্দাঃ, স একঃ কৰ্মদেৱানাং দেৱানাম্ আনন্দঃ, যে কৰ্মণা দেৱান্ অপি যন্তি, শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য।। তে যে শতং কৰ্মদেবানাং দেবানাম্ আনন্দাঃ, স একঃ দেৱানাম্ আনন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য।। তে যে শতং দেৱানাম্ আনন্দাঃ, স একঃ ইন্দ্রস্য আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য।। তে যে শতম্ ইন্দ্রস্য আনন্দাঃ। স একঃ বৃহস্পতেঃ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য।। তে যে শতং বৃহস্পতেঃ আনন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেঃ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য।। তে যে শতং প্রজাপতেঃ আনন্দাঃ। স একঃ ব্রহ্মণঃ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চ অকামহতস্য।। ২।৮।১।২,৩,৪
>
> (বি. দ্র.— আমাদের মূলে সন্ধি ও যতির ছেদ অর্থের অনুকূল করা হয়েছে।)

উক্ত ব্রহ্মানন্দের মীমাংসা এইরূপ। এক যুবা যে হবে সাধু অর্থাৎ, সচ্চরিত্র অধ্যয়নপরায়ণ বিদ্বান ক্ষিপ্র দৃঢ়চরিত্র ও বলশালী, এবং তাঁর অধীন হবে সর্বপ্রকার

বিত্তে পরিপূর্ণ এই সমস্ত পৃথিবী। তার যে আনন্দ সেটি হল মানুষ আনন্দের সীমা। এমন শত মানুষের যে আনন্দ— তা হল মনুষ্য-গন্ধর্বদের আনন্দের সমান। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দও তার সমান।।

এমন শত মনুষ্য-গন্ধর্বের যে আনন্দ, সেটি দেবগন্ধর্বদের আনন্দ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দও সেরূপ। এরূপ শত দেবগন্ধর্বের যে আনন্দ, সেটি চিরলোকনিবাসী পিতৃগণের আনন্দের সমান। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দও তার সমান।।

এই চিরলোকনিবাসী শত পিতৃগণের যে আনন্দ, সেটি আজানজ দেবগণের আনন্দের সমান। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দও তার সমান।।

এরূপ শত আজানজ দেবতার আনন্দ, তা হল কর্মদেব দেবগণের আনন্দের সমান— যাঁরা যজ্ঞকর্মের দ্বারা দেবত্বলাভ করেছেন। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ তাঁদের সমান।। এইরূপ শত কর্মদেব দেবতাদের যে আনন্দ, সেটি দেবতাদের আনন্দ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দও তার সমান।।

এরূপ শত দেবতাদের যে আনন্দ, সেটি ইন্দ্রের আনন্দের সমান। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দও তার সমান।।

এরূপ শত ইন্দ্রের যে আনন্দ, সেটি বৃহস্পতির আনন্দের সমান। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দও তার সমান।।

এরূপ শত বৃহস্পতির যে আনন্দ, সেটি প্রজাপতির আনন্দের সমান। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দও সেইরূপ।।

এরূপ শত বৃহস্পতির যে আনন্দ সেটি এক ব্রহ্মার আনন্দ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দও সেরূপ।। ২।৮।২-৪

এখন আনন্দমীমাংসা। চতুর্থ অনুবাকে ভয় আর আনন্দের বিরোধের contrast এর কথা বলা হয়েছে। অভয়ং ৱিন্দতি; আনন্দং ব্রহ্মণো ৱিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন— এর পিছনে মনোবিজ্ঞান কাজ করছে। যোগের ভাষায় ভয় হচ্ছে অন্ধতামিস্র, তামসিকতার চরম। দেহ ধারণের সঙ্গে সঙ্গে তার উৎপত্তি হয়। দেহকে আশ্রয় করেই যত ভয়। আঘাত পাবার ভয়, বিনাশের— মৃত্যুর ভয়। তার সংস্কার শেষ পর্যন্ত থাকে। Fear complex, anxiety neurosis-এ পরিণত হয়। সাধনাতেও সমাধির সময় শেষে মোক্ষভীতি দেখা যায়। নিরালম্ব হয়ে যাওয়া, অসম্প্রজ্ঞাতে ডুব দেওয়া ভীতিজনক হয়। আমরা সংস্কারবশে কোন-না-কোন আশ্রয়কে নিয়ে থাকতে চাই। ন চাস্য সর্ৱভূতেষু কশ্চিত্ অর্থৱ্যপাশ্রয়ঃ, গী. ৩।১৮। যিনি কারো বা কিছুর আশ্রয়ের

অপেক্ষা রাখেন না, তিনিই সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত হতে পারেন। নিরালম্বপুরে প্রবেশ করার সময় একটা reaction প্রতিক্রিয়া হয় শরীরে। নির্বাণের অনুভূতি দেহকে আশ্রয় করেই হয়। দেহের সূক্ষ্মগ্রন্থিগুলোর দৃঢ় বন্ধন বিনষ্ট করা খুবই কঠিন। নিরালম্ব অবস্থায় পৌঁছবার সময় দেহের সূক্ষ্মসংস্কার থেকে প্রচণ্ড বিরোধ, protest জাগে। পতঞ্জলিতে বিদেহভাবনা, অকল্পিতা মহাবিদেহধারণা ইত্যাদির কথা আছে। তখন দেহ থেকে, পৃথিবী থেকে যেন একটা আর্তনাদ ওঠে। চিত্ত সম্পূর্ণভাবে লয় হতে চায় না। তখন উপর থেকে যেন একটা আওয়াজ আসে। কেউ যেন অনুমতি চায়, অনুমতি পেলে নির্বাণভূমিতে নিয়ে যাবে। বৃহদারণ্যকেও অমানব পুরুষের কথা আছে, যিনি জীবাত্মাকে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যাবেন। কঠ.তেও আছে গ্রন্থিভেদের কথা— যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্য ইহ গ্রন্থয়ঃ। অথ মর্ত্যো২মৃতো ভবতি এতাবদ্ হি অনুশাসনম্।। ক ২।৩।১৫। তখনি মোক্ষভীতিকে ছাপিয়ে অভয়ে, আনন্দব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা হয়। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন, ন বিভেতি কুতশ্চন— হয়ে যায়। একদিকে ব্রহ্মের আনন্দ, আর তার বিপরীত কোটিতে জীবের মৃত্যুভীতি। এর মূল কারণ হল অস্মিতা আর অবিদ্যা। অভয়, আনন্দব্রহ্ম থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুর বশীভূত হওয়া পর্যন্ত ভয়ের নানা স্তর stages আছে। উপাদান হারাবার ভয় থাকে। ভয় থাকলে বিদেহভাবনা আসে না। ব্রহ্মের আনন্দ পাওয়া যায় না। অগ্নি থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্যন্ত সবাই ভয়ে কাতর। তার উল্টোদিকে অমৃত। তার পরিচয়, সংজ্ঞা অভয়ে আনন্দে। তাই আগে অভয়কে লাভ করতে হবে। মৃত্যুভয়কে জয় করলে, আসক্তিকে কামনাকে জয় করলে আনন্দ আপনা থেকেই আসে।

এখন আনন্দের মীমাংসা। মীমাংসা শব্দের ব্যবহার উপনিষদে অন্যত্র এক জায়গাতেই আছে— মীমাংস্যম্-এব তে মন্যে, কেন ২।১। পরে এই শব্দের বহুল ব্যবহার হয়েছে ঋষিধারাতে এবং দর্শনে। মীমাংসা হল intensive meditation, গভীর মনন, সবিকল্প সমাধি পর্যন্ত। √মন্+সন্+আ=মীমাংসা—বারংবার মনন করার ইচ্ছা। এই মীমাংসা মনকে নিয়ে যায় বিজ্ঞানে। মুনিদের তর্কপন্থা। সেখানে মনোবৃত্তিকে রুদ্ধ করার কথাও বলা হয়— যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। মীমাংসাতে মনকে একাগ্র করে মহাকাশে উঠিয়ে দেবার ভাব আছে। শ্রীঅরবিন্দ এই ভাবকে নিয়েছেন। তাই তাঁর সব সিদ্ধির স্তরগুলো মনেরই ঊর্ধ্বায়ন, higher mind থেকে supermind পর্যন্ত। উপনিষদের পরে মীমাংসা শব্দ technical হয়ে গেছে। বেদের দুটি মীমাংসাপ্রস্থান— পূর্বমীমাংসা আর উত্তরমীমাংসা।

এবার আনন্দের unit এককের প্রস্থাপনা। প্রথমেই জগতের ভোগের আনন্দের কথা।

যুবা স্যাত্ সাধু যুবা অধ্যায়কঃ আশিষ্ঠঃ দ্রঢ়িষ্ঠঃ বলিষ্ঠঃ, তস্য ইয়ং পৃথিবী বিত্তস্য পূর্ণা স্যাত্। স একঃ মানুষঃ আনন্দঃ।

এমন যুবক, যার জগতের আনন্দভোগের সামগ্রী যেন পরিপূর্ণ, এমন যুবা, যাঁর অন্নময় ও প্রাণময় দুটি ভূমিই পরিপূর্ণ, অথচ তি সাধু, সজ্জন। তাঁর আভিজাত্য nobility আছে, দৈবী সম্পদও রয়েছে। তিনি অ ্যায়ক, বিদ্যা অধিগত করেছেন, আরো অনুশীলন করার ইচ্ছা আছে। তিনি আশি সায়নের মতে আশু শব্দ থেকে, ক্ষিপ্রতম। তাঁর foresight আছে, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার শক্তি আছে। যদি √ অশ্ থেকে হয় (আ- √অশ্) পাবার ইচ্ছা, to attain something, তাহলে অর্থ হবে যা পাবার তিনি পেয়েছেন, আরো পাবার ইচ্ছা আছে।

তিনি দ্রঢ়িষ্ঠ— যাঁর দৃঢ় ব্যক্তিত্ব আছে। তার প্রমাণ হল প্রমাদশূন্যতা। তিনি অপ্রমত্ত। আবার তিনি বলিষ্ঠ— এখানে 'বল' mystic sense, রাহস্যিক অর্থে নিতে হবে। এখানে বল— যোগবল, অধ্যাত্মবল। নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানম্, নাস্তি যোগসমং বলম্। জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে সঞ্চারিত করার ক্ষমতা, এটাই যোগবল। এইরকম সাধু আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ যুবা, এবং যার সমস্ত পৃথিবী বিত্তে পরিপূর্ণ থাকবে। অর্থাৎ সে হবে সম্রাট। এইরকম যুবার আনন্দ হল, মানুষের সত্যিকার আনন্দের একক।

এই 'মানুষ' আনন্দ যদি শতগুণ হয়, তাহলে তা মনুষ্যগন্ধর্বের আনন্দের সমান হবে। আনন্দে অভ্যস্ত হলে, একটা বিতৃষ্ণা আসে। আনন্দ ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে যায়। আনন্দকে ধরে রাখার উপায়, বা key— চাবিকাঠি হল অকামহত হওয়া। আনন্দের কামনা করবে না, তার পিছনে ছুটবে না, তাকে ধরে রাখবার চেষ্টাও করবে না। সব সময় অনাসক্ত হয়ে থাকবে। অকামহত হওয়াই সব আনন্দের basis, ভূমি। ব্রহ্মানন্দ পাবার উপায় হল, চেতনা সবসময় নিষ্কাম থাকবে। কর্মের প্রতি, কোন কিছুর প্রতি অনুরাগ, আসক্তি নেই আর ভিতরটা শূন্যবৎ থাকলে আনন্দ বারবার আসে। তখন অভ্যাসে আনন্দ ফিকে হয়ে যাবার পরিবর্তে শতগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আধার বিরাট ও বিশুদ্ধ না হলে এ আনন্দ ধারণ করতে পারবে না। অশুদ্ধ দেহ-প্রাণ-মনে আনন্দ বিকার ঘটায়। ভিতরে আকাশবৎ শান্ত, অসঙ্গ থাকলে আনন্দ আপনি আসবে।

ব্রহ্মানন্দবল্লীর আরম্ভেই অন্নময় থেকে আনন্দময় পুরুষ পর্যন্ত বর্ণনা আছে। প্রথম আনন্দ অন্নময় শরীরের, অন্নময় পুরুষের আনন্দ। ভোজনের মধ্যে যে আনন্দ পাই, সেটা স্থূল আনন্দ। তারপর প্রাণময় পুরুষের আনন্দ। প্রাণের আনন্দ আমরা ইন্দ্রিয়পথে গ্রহণ করি। যদি অতীন্দ্রিয় কিছু না হয়, তাহলে এই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের আনন্দ মনুষ্যগন্ধর্বের আনন্দ হবে। কামহত হলে সে আনন্দ শতগুণ হয় না। উপনিষদে অকামহত ভিন্ন আরেকটি বিশেষণের প্রয়োগ করা হয়েছে— শ্রোত্রিয়স্য অকামহতস্য।

শ্রোত্রিয় বিশেষ লক্ষণ। ব্রাহ্মণের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ। বাক্‌কে, দিব্য বাক্‌কে শোনার আকূতি যার মধ্যে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কথায়— আমি কান পেতে রই। অলখের বাণী শোনার জন্য যে কান পেতে রয়েছে, সেই শ্রোত্রিয়। এটা বাকের সাধনা। যিনি শ্রোত্রিয় এবং অকামহত, তাঁর মধ্যে এই মনুষ্যগন্ধর্বের আনন্দ শতগুণ হয়ে ফুটে ওঠে। তখন বিষয়ানন্দে ব্রহ্মানন্দ। শুধু বিষয়কে গ্রহণ করলে সে মনুষ্যগন্ধর্ব। দেবগন্ধর্ব তিনি, যিনি ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে অতীন্দ্রিয়কে গ্রহণ করেন। শ্রোত্রিয় শ্ছন্দোঽধীতে পা. ৫।২।৮৪। শ্রোত্র+ঘন্=শ্রোত্রিয়। গান-বাজনা সাধনার একটা পথ। শ্রোত্রিয়ের সাধনার অনুকূল। সূক্ষ্ম শ্রুতি বা সূক্ষ্ম রূপ-স্পর্শ-গন্ধাদি দিব্য সম্বিৎ inner senses খুলে যাওয়া— এইসব দেবগন্ধর্বের এলাকা। দেবগন্ধর্বের চরম রূপ বা প্রতীক হল সবিতা। বেদের সবিতাই দেবগন্ধর্ব। আকাশে সবিতার আলো ফুটে উঠছে, সবিতা নেপথ্যে। পরে ভগ, বালসূর্য ওঠেন। সর্বশেষে মধ্যগগনের বিষ্ণু। দ্যুলোক, মূর্ধন্যচেতনার আলো উদ্ভাসিত হচ্ছে। সাধকের সহস্রার- পদ্ম ফুটে উঠছে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যা কিছু গ্রহণ করি, তারমধ্যে সবচেয়ে বড় সংবিৎ হল গান, সুর, শ্রুতি— যা চেতনাকে আকাশে নিয়ে যায়। শ্রীঅরবিন্দের ভাবের মধ্যেও lower vital ও higher vital নিম্নপ্রাণ ও ঊর্ধ্বপ্রাণের কথা আছে।

এইভাবে অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ শতগুণিত হয়ে চলে। দেবগন্ধর্বের আনন্দের পরে পিতৃণাম্ চিরলোক- লোকানাম্ আনন্দঃ। চিরলোক পিতৃগণ সমস্ত মানবচেতনার আদর্শ। মানুষ যা হবে— যেখানে সে সম্পূর্ণ হয়ে রয়েছে, সেটা পিতৃলোক। কিন্তু এখানে প্রকৃতিতে এখনো তা সিদ্ধ হয়নি। কৌষীতকী ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে পিতাপুত্রীয় সম্প্রদানের কথা আছে। পিতা যা করেছেন, তাকে সম্পূর্ণ করার ভার পুত্রের উপরে ন্যস্ত করে যাচ্ছেন। বিবেকানন্দ বলেছেন— There were Rishis in the past, we will be greater Rishis. শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন— We belong to the noons of the future. প্রকৃতির evolution কালে প্রবাহিত। পুরুষ কিন্তু সব সময় stable নিত্যে স্থিত। মানুষের বিকাশের পরিপূর্ণ ছক পিতৃলোকে বিধৃত। পিতৃলোক পর্যন্ত লোক আলোকিত ভূমি অর্থে। পরের লোকগুলি জ্যোতির্লোক, রোক্ >লোক। √রুচ্ দীপ্তি। চিরজ্যোতির ভূমি। মনোজ্যোতি— মনো বৈ দৈবং চক্ষুঃ। শ্রীঅরবিন্দের মতে, মনের সন্ধানী আলো শেষ পর্যন্ত চলে। এই উপনিষদেও হৃদিস্থিত পুরুষকে মনোময়ঃ অমৃতঃ হিরণ্ময়ঃ বলা হয়েছে তৈ. ২।৬। বৈষ্ণবদের মধ্যে সত্ত্বতনুর কথা আছে। খ্রীষ্টানদের মধ্যে Body of Christ শরীরের তেজস্ক্রিয় হয়ে ওঠার কথা আছে। তন্ত্রে এঁরা সিদ্ধৌঘ। পিতৃলোক পর্যন্ত হল মানবৌঘ= Individual ব্যক্তিবিশেষ গুরু। সবই মনোলোকের ব্যাপার। যিনি অকামহত শ্রোত্রিয় তাঁর আনন্দ, তাদের

থেকেও শতগুণ হবে।

আজানজানাং দেবানাম্ আনন্দঃ। মনোভূমি থেকে বিজ্ঞানভূমির উঠে গেলেন। বিজ্ঞানভূমি দেবতাদের স্থান। সেখানে আনন্দ আরো শতগুণিত হয়। এখান থেকে বিজ্ঞানভূমির সাতটি পর্ব বা স্তর। প্রথম আজান-জ সব দেবতার কথা একসঙ্গে বলা হয়েছে, কোন বিশেষ দেবতা নয়। আজান-জ স্তরে বিজ্ঞানের প্রথম স্ফুরণ; উষার আলোর মতো। সবিতার পর ভগের আলো যখন ফুটল তখন প্রথম আজান-জ। আজান=দেবলোক, world of the gods। আজান-জ মানে দেবলোকে যাঁর জন্ম। God by birth. এদের একটা natural স্বাভাবিক দেবভূমি আছে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন— এঁরা typal gods. সেখানে নিত্য তারুণ্য। দেবতারা পঁচিশ বছরের আর দেবীরা ষোড়শী। বিজ্ঞানের basis-এ ভূমিতে শুদ্ধ-ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা যুক্ত হচ্ছে। ভূমি শুদ্ধ দেবভূমি, প্রকাশ পাচ্ছে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়— Deified animals let loose in the purified body= শুদ্ধ দেহের মধ্যে দিব্য প্রাণের উল্লাস।

তারপরে কর্মদেব। প্রাণের পরে আসছে মনের, বিজ্ঞানের আনন্দ। ইন্দ্রিয় সংহত হলে মনোজ্যোতি বিস্ফারিত হয়। আনন্দের সম্ভোগ হয় দিব্যমন দিয়ে— deified mind. আমরা যদি যজ্ঞানুষ্ঠান যথার্থভাবে করি, তাহলে এই অবস্থা পেতে পারি। এটা বেদের ভাবনা। যেহেতু যজ্ঞই একমাত্র কর্ম। কিন্তু স্মার্তকর্ম ও শ্রৌতকর্মকে এখানে পৃথক করা ঠিক নয়, যা শঙ্কর ও সায়ণ করেছেন। অবশ্য এই যজ্ঞ দ্রব্যযজ্ঞই। যজ্ঞসাধনাই কর্মসাধনা। দ্রব্যকে আশ্রয় করেই যজ্ঞের ভাবকে ঠিকমত পাই। ইদং তব, ন মম—ভাব জাগলে মানস যজ্ঞ হয়। গৃহস্থাশ্রমে দ্রব্যযজ্ঞ, বানপ্রস্থে মানসযজ্ঞ, বিদথ। সমস্ত ব্যাপারটাই মনের ভেতরে চলে, উপকরণ আর থাকে না। তখন আনন্দ, বিদথ-দেবানাম্ আনন্দঃ। বিজ্ঞানলোকে চেতনার পরিমণ্ডলে দেবতারা সমষ্টিভূত। কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত। দেবতারা পরমদেবের বিভূতি। মূলে তিন দেবতা— ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও প্রজাপতি।

ইন্দ্র ও বৃহস্পতি যুগ্ম দেবতা। ইন্দ্র দেবরাজ। এই যুগ্মদেবতার পরিচয় ঋগ্বেদে পণি-সরমা সংবাদে পাই, ঋ ১০।১০৮। দুই দেবতাই ওজঃশক্তির প্রতীক। এই শক্তি দুইভাবে দেখা দেয়— কর্ম ও জ্ঞানের শক্তি রূপে। কর্মপ্রসূত শক্তির আধার ইন্দ্র। আর জ্ঞানপ্রসূত শক্তির আধার বৃহস্পতি। কর্ম সূর্যের স্পন্দন। জ্ঞান আকাশের স্পন্দন। ইন্দ্র বিজ্ঞানময় প্রাণ। বৃহস্পতি বিজ্ঞানময় প্রজ্ঞান। বিজ্ঞান একটা state, ভূমি বা স্তর। প্রজ্ঞান হল means সাধন। এমন সাধনাও আছে, যেখানে প্রজ্ঞানের সমাপ্তি ঘটে। তার প্রয়োজনই হয় না। বলা হয়ে থাকে, প্রজ্ঞানম্ এব আপ্নুয়াত্। বুদ্ধদেবও বলেছেন—

শুধু শীল পালনের দ্বারাও নির্বাণলাভ হতে পারে। পতঞ্জলিতেও আছে, শুধু যম-নিয়মের সুষ্ঠু পালনেই সর্বসিদ্ধি হতে পারে। এটাই পরে সহজধর্মে পর্যবসিত হয়েছে। মহাভারতে আছে— এমি পরিনির্বাণী—চলতে চলতে পরিনির্বাণ হয়ে যায়। সহজ জীবনযাপনের দ্বারা নির্বাণ, মোক্ষলাভ করা যায়। এটা পরে জাপানে Taoism-এ দেখা দিয়েছে।

ইন্দ্রের পর বৃহস্পতি। ইন্দ্র বজ্রশক্তি দিয়ে পাষাণের আবরণ বিদীর্ণ করছেন। আর বৃহস্পতি 'আরাব' বাক্‌শক্তি দিয়ে, মন্ত্রবীর্য দিয়ে পাষাণের আবরণ দূর করছেন। বৃহস্পতি = বৃহতের পতি। বাক্ বৈ বৃহতী। বৃহস্পতি তাই বাচস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি। বাক্ এবং ব্রহ্ম যেখানে এক হয়েছে, তিনিই বৃহস্পতি। পুরাণে তিনি দেবগুরু। ইন্দ্রে আয়াস (শক্তির প্রয়োগ) আছে, কিন্তু বৃহস্পতিতে আয়াস নেই। ইন্দ্র ও বৃহস্পতির যুগ্ম শক্তিতে পণিদের দ্বারা লুকিয়ে রাখা গোযূথ মুক্তি পেল আর আলো ছড়িয়ে পড়ল। ছবিটা যেন eclipsed sun. মেঘাচ্ছাদিত বা রাহুগ্রস্ত সূর্যের উদয় হল। ন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো।

তারপরে প্রজাপতি বা প্রাজাপত্য সূর্য। সৃষ্টিতে সর্বত্র ব্যাপ্ত জ্যোতি। এটা প্রজাপতির আনন্দ। সেখানেও যদি কামনার রেশ থাকে, তার ওপারে যে বাক্ আছে, তাকে শোনার আকাঙ্ক্ষা থাকলে, সেখানেই আটকে যাব। চেতনা যদি তারও ওপরে উঠে যায়, তাহলে সেটি উত্তীর্ণ হবে ব্রহ্মে। তখনি সে পুরুষ হবে আকাশশরীরং ব্রহ্ম।

আনন্দমীমাংসাতে সর্বত্র জোর দেওয়া হয়েছে শ্রোত্রিয় অকামহত হয়ে থাকার জন্য। শেষ পর্যন্ত অকামহত হয়ে থাকলে পরমাত্মা বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। তখন সর্বদেবতার আনন্দ তুচ্ছ হয়ে যায়।

স যঃ ■ অয়ং পুরুষে। যঃ চ অসৌ আদিত্যে। স একঃ। স যঃ এবংবিত্। অস্মাত্ লোকাত্ প্রেত্য। এতম্ অন্নময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি। এতং প্রাণময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি। এতং মনোময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি। এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি। তদপি এষ শ্লোকঃ ভবতি।। ২।৮।৫

সেই যিনি এই পুরুষে এই দেহধারী মানুষে, হৃদয়স্থিত পুরুষে আছেন আর যিনি ঐ আদিত্যে, সূর্যমণ্ডলস্থিত পুরুষে আছেন তিনি এক। সেই পুরুষ যিনি এরূপ জানেন তিনি এই লোক থেকে, সাধারণ জীবন থেকে পরাবৃত্ত, উৎক্রান্ত হয়ে অন্তরের অন্নরসময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন। তারপর ক্রমশ এই প্রাণময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত

হন, এই মনোময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন, এই বিজ্ঞানময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন, এবং অন্তে এই আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন। সে বিষয়েও এই শ্লোক আছে।। ২।৮।৫

অয়ম্ পুরুষে— দেহস্থিত আনন্দময় পুরুষের অনুভূতি যার হয়েছে, তিনি ব্রহ্মানন্দে বিভোর। তিনি সর্বত্র সর্ববিষয়ে ব্রহ্মানন্দময় হয়ে থাকেন। আদিত্য প্রজাপতি, তিনিও প্রাজাপত্য পুরুষ এই অনুভব যার হয়েছে, তার মধ্যে যে পুরুষ এবং ঐ বাইরে আদিত্য— সূর্যমণ্ডলস্থিত যে পুরুষ আছেন, দুইই এক। ছান্দোগ্যে বলা হয়েছে— এষঃ আদিত্যে পুরুষঃ... সোঽহমস্মি, ৪।১১।১। ঈশ. তেও একই অনুভূতির কথা আছে— যোঽসৌ অসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি, ১৬। ওখানে যে পুরুষ সে পুরুষই এখানে আছেন। কঠ.তে 'এতদ্বৈ তৎ' বলে উল্লেখ আছে। এটাই অবতারবাদের মূল। ছান্দোগ্যে উত্তম পুরুষের যে সব লক্ষণ আছে, মহাভারতে পুরুষোত্তম কৃষ্ণের সঙ্গে সেগুলি মিলে যায়।

অস্মাত্ লোকাত্ প্রেত্য— এই যে সাধারণ লোক, common experience-এর জগৎ, তার থেকে প্রেত্য transcend, অতিক্রম করে এতত্ অন্নময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি— এই শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মাতে— আত্মদীপ্তিতে পরিস্ফুটিত হচ্ছে, তাতে ছড়িয়ে পড়ছে। সাধনার প্রথম অবস্থায় অন্নময় আত্মাতে বিস্ফারিত হচ্ছে। উপসংক্রামতি— কাছে গিয়ে সেখানে ছড়িয়ে পড়া। তারপর প্রাণময় আত্মাতে, বিশ্বময় প্রাণকে স্পর্শ করছে, বিশ্বময় প্রাণে ছড়িয়ে পড়ছে। তারপর ক্রমশ বিশ্বমনকে— মনোময় আত্মাতে, বিশ্ববিজ্ঞানকে— বিজ্ঞানময় আত্মাতে, পরিশেষে বিশ্বানন্দে— আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রামিত হচ্ছে।

এইভাবে যিনি আনন্দময় আত্মা পর্যন্ত উপসংক্রমণ করেছেন, যিনি আনন্দব্রহ্মকে জেনেছেন পেয়েছেন, তাঁর বিষয়ে এই শ্লোক আছে।

নবম অনুবাক

যতঃ ৰাচঃ নিৰর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণঃ ৰিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন ইতি।

এতং হ ৰাৱ ন তপতি। কিম্ অহং সাধু ন অকরৰম্। কিম্ অহং পাপম্ অকরৰম্ ইতি। স যঃ এৰং ৰিদ্বান্ এতে আত্মানং স্পৃণুতে। উভে হি এৱ এষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে। যঃ এৰং ৰেদ। ইতি উপনিষত্।। ২।৯

যেখান থেকে তাঁকে (ব্রহ্মকে) না পেয়ে মন-সহ বাণী ফিরে আসে, সেই আনন্দব্রহ্মকে যিনি জেনেছেন— পেয়েছেন, সেই বিদ্বান্ কোন কিছুতেই ভীত হন না।

যিনি এরূপ আনন্দব্রহ্মকে জেনেছেন, সেরূপ বিদ্বান্ আমি কেন এই ভাল কাজ, পুণ্য কর্ম করলাম না, বা আমি কেন এই পাপ কাজ করলাম, এইরকম অনুতাপ করেন না। কেননা, সেই বিদ্বান্ এই দুরকম কর্মের দ্বারা নিজের আত্মাকে পরিপূর্ণ করেন। অর্থাৎ সব অবস্থাতেই তিনি আনন্দে থাকেন। পাপ বা পুণ্য— এই উভয়ের দ্বারাই তিনি আত্মাকেই প্রীত করেন, আনন্দে পরিপূর্ণ করে রাখেন। এইরকম যিনি জানেন তিনিও। এই হল উপনিষৎ।। ২।৯

আগে চতুর্থ অনুবাকে ছিল আনন্দং ব্রহ্মণো ৱিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন। তিনি সর্বদা অভয় থাকেন। ভয়ের কারণ বিশ্লেষণ করা হয়নি। তার জন্য এখানে বলা হচ্ছে— ন বিভেতি কুতশ্চন। ভয়ের কোন কারণই থাকে না। কোন কিছুই তার ভয়ের কারণ হয় না। তাই তিনি সর্বদা অভয় ও আনন্দে থাকেন।

এইরকম অভয় যাঁর হয়, তিনি কোনভাবে সন্তপ্ত হন না। তাঁর কোন দুঃখ হয় না। তাঁর এটাও মনে হয় না যে, কেন আমি ভাল বা পুণ্যকর্ম করলাম না, অথবা পাপকর্ম করলাম। এই রকম পাপ-পুণ্য ভালমন্দ, দুরকম কর্মকেই অতিক্রম করার কথা একমাত্র ভারতেই বলা হয়েছে। রামপ্রসাদও তাঁর এক গানে বলেছেন— ধর্মাধর্ম দুটো খেলি।

স য এৱম্ ৱিদ্বান্ এতে আত্মানং স্পৃণুতে। স্পৃণুতে— √স্পৃ to save, to gain, to fulfil, to win, to gladden, to delight, to gratify লাভ করা, জিনে নেওয়া, আনন্দিত হওয়া, উপভোগ করা ইত্যাদি। আরেক অর্থ to release, মুক্ত করা। এখানে বিশেষ করে অর্থ হবে পাপ-পুণ্য দুটোকেই তিনি আত্মসাৎ করে নেন, তাদের জয় করেন অর্থাৎ তাদের অতিক্রম করেন। তিনি শুদ্ধম্ অপাপৱিদ্ধম্ হয়ে যান। পাপ তাঁকে বিদ্ধ করতে পারে না। সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে যাবার মতো পাপ-পুণ্যেরও ঊর্ধ্বে যান। পাপের একটা অপেক্ষিক সত্তা আছে, কিন্তু তার কোন absoluteness চরম সার্বভৌম সত্তা নেই। তোমার ভিতরে সে আছে, কিন্তু তাতে তুমি বিদ্ধ নও। পাপ ও পুণ্যের ন্যূনতা আছে। অখণ্ড সত্তার দুটো ভাগ রূপে তারা আছে। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্ তাদের এই ব্যবধান দূর করে পূর্ণ করে দেন।

য এৱং ৱেদ— এইভাবে যিনি জানেন, তিনি ব্রহ্মেই থাকেন। সর্বদা ব্রহ্মানন্দেই থাকেন। তিনি কোন কিছুতেই তপ্ত, অভিভূত, সন্তপ্ত হন না। শঙ্করাচার্য নির্বাণষট্কে এই একই কথা সুন্দরভাবে বলেছেন— ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখম্। ...চিদানন্দরূপঃ শিৱো২হং শিৱো২হম্।।

এই হল উপনিষৎ।

ব্রহ্মানন্দবল্লীর নবম অনুবাক শেষ হল।

কোন কোন গ্রন্থে ব্রহ্মানন্দবল্লীর শেষেও আবার ওঁ সহ নাববতু... ইত্যাদি শান্তিমন্ত্রের পাঠ আছে। যেমন শীক্ষাবল্লীতে ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ... শান্তিমন্ত্র আরম্ভে ও অন্তে রাখা হয়েছে। এই উপনিষদের ভৃগুবল্লীতে ওঁ সহ নাববতু... শান্তিমন্ত্র প্রথম অনুবাকের অন্তর্গত করা হয়েছে। শঙ্করাচার্য অবশ্য তা করেননি। আমরাও তাই এখানে একই শান্তিমন্ত্রের পুনরাবৃত্তি করছি না। অবশ্য উপনিষৎ-পাঠের সময় আরম্ভে ও অন্তে শান্তিমন্ত্র পাঠ করা সমুচিত। তাতে একটি আবহ তৈরি হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় ব্রহ্মানন্দবল্লী সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায়

ভৃগুবল্লী

প্রথম অনুবাক

ভৃগুঃ বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরম্ উপসসার। অধীহি ভগবঃ ব্রহ্ম ইতি। তস্মৈ এতত্ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনঃ বাচম্ ইতি। তং হ উবাচ। যতঃ বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যত্ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি। তত্ বিজিজ্ঞাসস্ব তত্ ব্রহ্ম ইতি। স তপঃ অতপ্যত। স তপঃ তপ্ত্বা— ৩।১

বরুণের পুত্র ভৃগু, 'হে ভগবন্, আমায় ব্রহ্মের উপদেশ করুন'— এই কথা বলে পিতা বরুণের কাছে উপস্থিত হলেন। পিতা তাঁকে বললেন— অন্ন (অন্নদ্বারা উৎপন্ন এই শরীর), প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন ও বাণী (বাক্)— এরাই (ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার)। তিনি তাঁকে আরো বললেন— যা হতে এই সমস্ত ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, জাত হয়ে ভূতবর্গ যার দ্বারা বর্ধিত হয়, আর (বিনাশকালে) যেখানে প্রবেশ বা গমন করে, তাকেই জানতে চাও। তিনিই ব্রহ্ম। ভৃগু তপস্যা করলেন এবং তপশ্চর্যা করে...। ৩।১

ভৃগু একজন অতি প্রাচীন ঋষি। ঋগ্বেদে পিতৃগণের মধ্যে তাঁর নাম আছে। অথর্বসংহিতার অনেক অংশ তাঁর রচনা। অথর্বা-অঙ্গিরা-ভৃগু এই হল অগ্নিবিদ্যার প্রবর্তকদের ক্রম। ভৃগু অগ্নিবিদ্যার অন্যতম প্রবর্তক। ভৃগূণাম্ রাতিঃ, অগ্নি হলেন ভৃগুদের দান। ভৃগুর্বৈ অগ্নিঃ। অগ্নি আর ভৃগু এক। তিনি দেবলোক থেকে অগ্নি নামিয়ে এনেছিলেন। পুরাণে আছে, ভৃগু একসময় বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করেছিলেন। বিষ্ণু নীলাকাশ। বিষ্ণুর বক্ষে কৌস্তুভ মণি হল সূর্য। এই সূর্যদ্বার ভেদ করাই ভৃগুর বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত। তিনি আবার বরুণের পুত্র। তিনি মহাশূন্যের উপাসক বা বরুণ থেকে জাত। আসলে সাধনা ও সিদ্ধির ধারা ধরে ঋষিদের পরিচয় দেওয়া হত। যেমন, বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি, আর ভৃগু বারুণি। বরুণ অনন্ত মহাশূন্যের দেবতা। অসুর বরুণের বিশেষ সংজ্ঞা। বরুণ— √বৃ >যিনি সবকিছু আচ্ছাদিত করে রয়েছেন। সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট অথচ

সর্বাতীত। বরুণ অতিষ্ঠাতত্ত্ব। শব্দের প্রাচীন ব্যুৎপত্তি হল অসুর— অসু+র, যার মধ্যে অসু— প্রাণশক্তি আছে। আবার, √অস্ নিক্ষেপ করা। যার থেকে প্রাণের বিচ্ছুরণ হয়। এটা দেবতাদের প্রাচীন সংজ্ঞা। ইরানে অসুরই অহুর্ হয়েছে। শুদ্ধ সন্মাত্র। তাঁর থেকে শক্তির বিচ্ছুরণ। তাই বরুণ। ভৃগু এই বরুণের পুত্র। পিতা বরুণের কাছ থেকে তিনি যে বিদ্যা পেয়েছিলেন, সেটি ভার্গবী বারুণী বিদ্যা।

ভৃগু— √ভৃজ্ ভর্জন, ভাজা। গায়ত্রীতে আছে বরেণ্যং ভর্গঃ, scorching ray of Sun. সূর্যকিরণের চরম। তার তাপে আমার সমস্ত মালিন্য দগ্ধ হয়ে যায়। যার মধ্যে এমন হয়েছে তিনিই ভৃগু। আবার √ভ্রাজ্ দীপ্তি। যিনি প্রদীপ্ত, প্রজ্বলিত, তিনি ভৃগু। বারুণি ভৃগু হলেন মহাশূন্যের দীপ্তিতে যার আধার দগ্ধ হয়ে শুচি হয়েছে। তাঁর কীর্তি হল মানুষের মধ্যে অগ্নিকে প্রতিষ্ঠিত করা।

এই ভৃগু পিতা বরুণের কাছে গিয়ে বললেন— অধীহি ভগবঃ ব্রহ্ম ইতি। আপনি অধ্যয়ন, অধিগত করুন। অধ্যাপনার কথা নেই। এই অধ্যয়নকে বলা হত প্রবচন। এই প্রবচন আপনার থেকে উৎসারিত, উচ্চারিত হোক। একজন বলে যাচ্ছেন, যে যেমন পারে গ্রহণ করছে। পরে এটাই আচার্যের প্রবচন হয়েছে।

তস্মৈ এতত্ প্রোবাচ— প্র+উবাচ। তিনি প্রবচন করলেন। অন্ন থেকে বাক্ পর্যন্ত বলে তিনি চুপ করে গেলেন। Zen Buddhism-এ Koan-এর মত। সত্যকে ইঙ্গিতে বলে দেওয়া। প্রথমে একটা ভিত্তি রচনা করলেন। এটা থেকে পরে অর্থ বের করা হয়েছে। ছান্দোগ্যে অন্ন বাদে অন্য পাঁচটি— প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও বাক্‌কে ব্রহ্মের (ব্রহ্মজ্ঞানের) দ্বারপাল, ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনরূপে ধরা হয়েছে। এখানে প্রসিদ্ধ পাঁচটি দ্বারপালের সঙ্গে অন্নকেও ধরা হয়েছে। যেমন, বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য হৃদয়কে ষষ্ঠ দ্বারপাল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আগের বল্লীতে অন্নময় পুরুষের কথা বলা হয়েছে। এই উপনিষদে অন্নের কথা বহুবার বলা হয়েছে। অন্ন অর্থাৎ matter জড়পদার্থ, যা গ্রহণ করে শরীর বর্ধিত হয়। শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্। শরীরকে সুস্থ সবল রাখতে হবে। তার থেকে ছান্দোগ্যে অন্নশুদ্ধি, আহারশুদ্ধির কথা এসেছে। আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ। তপস্যার দ্বারা কায়শুদ্ধি হয়, এটা basic, মূল ভাব। তৈত্তিরীয় সংহিতায় সাতটি দ্বারপালের কথা আছে। এদের বলা হয়েছে শীর্ষণ্য প্রাণ। আবার, 'নরদ্বারে পুরে দেহী', এই কথাও আছে। সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণ আর দুটি নিম্নদ্বার, উপস্থ ও পায়ু। পরে কবীর আবার একাদশ দ্বারের কথা বলেছেন, আজ্ঞাচক্রের উপরে দুটি দ্বারকে নিয়ে— ললাটচক্র ও সহস্রার।

ভুক্তান্ন নাভিতে পরিপাক হয়। সেখানে যে আগুন জ্বলে, সেটা প্রাণাগ্নি। সেই প্রাণ অন্নকে পাক করে অগ্নিশিখা হয়ে শীর্ষণ্য— মূর্ধার সাতটি দ্বার দিয়ে প্রকাশিত

হয়। ছান্দোগ্যে আছে— অন্নমশিতং ত্রিধা ৱিধীয়তে। দুধ মন্থন করলে ননী যেমন উপরে উঠে আসে, তেমনি অন্ন থেকেই অন্নের সূক্ষ্মতম অণিষ্ঠ, অণুতম ভাগ মন হয়। ছা. ৬।৫।১।

প্রত্যেক দ্বারপাল বা শীর্ষণ্য প্রাণ নিয়ে একেকটি সাধনা। যেমন বাক্-এর সাধনা জপ, স্তোত্রপাঠ ইত্যাদি। শ্বাস-প্রশ্বাস বা প্রাণের সাধনা প্রাণায়াম। শ্রোত্রের সাধনা নাদানুসন্ধান, নাদব্রহ্মের উপাসনা, সুরসাধনা। মনের সাধনা ঋষি ও মুনিপন্থার জ্ঞানযোগ—শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন। যাজ্ঞবল্ক্য অন্নকে বাদ দিয়ে হৃদয়ের কথা বলেছেন এবং তাকে শেষে ষষ্ঠ দ্বারপালরূপে রেখেছেন। এখানে অন্নকেই প্রথমে রাখা হয়েছে। এই ভাবনার মূল আছে ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে। সেখান থেকে সমস্ত উপনিষদে তা ছড়িয়ে পড়েছে। পুরুষসূক্তে ব্রহ্মকে পুরুষকে, ভাবনা করা হয়েছে। সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাত্ ঋ ১০।৯০।১। আবার তাকে অতিষ্ঠারূপেও ভাবনা করা হয়েছে। স ভূমিং ৱিশ্বতো ৱৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্, ঐ। আসলে বেদে ব্রহ্ম শব্দ উপনিষদের অর্থে ব্যবহারই করা হয়নি। বেদে 'ব্রহ্ম' হল 'মন্ত্র', বাকের রূপ। যখন তিনি সহস্রাক্ষঃ পুরুষঃ, তখন তাঁর প্রতীক সূর্য। অথচ বরুণ বা আকাশরূপে তিনি অতিষ্ঠা হয়ে তাঁকে ছাপিয়ে রয়েছেন। তারপরে বলা হয়েছে— পুরুষ এৱেদং সর্ৱম্ যদ্ভূতং যচ্চ ভৱ্যম্ ১০।৯০।২। এটা দ্বিতীয় ভাবনা। আর তৃতীয় ভাবনা হল, তাঁর এইসব হওয়া। এটা তাঁর যজ্ঞ, তাঁর আত্মবিসৃষ্টি। নিজেকে ঢেলে দেওয়া। তাঁর দ্বিতীয় কী উৎপন্ন হল? প্রথমটি হল ছন্দ। Universal Rhythm স্পন্দ, শক্তি উৎপন্ন হল। এটাই ঋত। আর দ্বিতীয় হল বিরাট্ পুরুষ। তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তুমি দেখছ তাঁর মাথা, দুটি হাত, দুটি পা, ধড়। এই বিরাট পুরুষের দেহে চতুর্দশ লোক স্থাপন করা হয়েছে। চেতনা নীচে থেকে উপরে উঠেছে। চেতনা ঊর্ধ্বস্রোতা হয়ে যত উপরে উঠছে, ততই সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন— সাধারণ মানুষের মন গুহ্য লিঙ্গ ও নাভি পর্যন্ত থাকে।

এই পুরুষসূক্তকে অবলম্বন করে তিনটি ভাব পাই— প্রজা, লোক ও আত্মা (দেহ ও চৈতন্য দুই মিলে)। প্রজা না বলে চাতুর্বর্ণ্যের কথা আছে। মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয়, ঊরু বৈশ্য, পদ শূদ্র। বৃহ. উপ.তে আছে— পদ্ভ্যাং প্রতিষ্ঠা। শূদ্রের প্রতিষ্ঠা। পদ্ভ্যাং ভূমি। nearer to earth। এগুলোকে লোকরূপে দেখলে পুরুষের মূর্ধা হল দ্যুলোক— দিব্যচেতনা, তার পাদ পৃথিবীলোক— শূদ্র। আর ধড় অন্তরিক্ষলোক। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। ক্ষত্রিয় উজিয়ে যায় ব্রাহ্মণের দিকে আর বৈশ্য ভাটিয়ে আসে শূদ্রের দিকে। অবশ্য সর্বত্রই আদর্শ হল চেতনার উত্তরণ। শূদ্র, বৈশ্য সবাই ব্রাহ্মণত্বের দিকে উজিয়ে যাবে।

বৈষ্ণবদের ভাষায় বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ও অন্তরঙ্গা চিতিশক্তি। মাঝখানে তটস্থা জীবশক্তি। চিতিশক্তি উপরের দিকে নিয়ে যেতে চায় আর মায়াশক্তি নীচের দিকে টানে। চেতনার দিক থেকে শূদ্র অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। সে যখন জ্ঞানভূমিতে প্রবেশ করে, তখন বিশ্ হয়। নতুন ভূমিতে বৈশ্য, তখন তার প্রবর্ত দশা। তার উপরে ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয়ের সাধকদশা। ব্রহ্মচৈতন্য ফুটলে তখন সে ব্রাহ্মণ। এই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় পুরুষসূক্তে ১৩, ১৪ মন্ত্রে বলা হয়েছে। মুখাত্ ইন্দ্রশ্চ, অগ্নিশ্চ। অগ্নিই বাক্ একথা অনেক জায়গায় পাই। অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা। অগ্নিচেতনা উদ্দীপ্ত হলে যে বাকের স্ফুরণ হয়, তাই মন্ত্র। অগ্নি সাধনবীর্য। ইন্দ্র ওজঃ। দ্যুলোকের আদিতে বা অন্তরিক্ষলোকের অন্তে তার স্থান। বাকের ব্যক্তরূপ যে অগ্নিকে অবলম্বন করে প্রকট হয়, তাকে চতুর্থ বা বৈখরী বাক্ বলা হয়। আর তিনটি বাকের প্রতিষ্ঠা বায়ু ইন্দ্র আর সোমে। মধ্যমা বাক্ বায়বী। পশ্যন্তী ঐন্দ্রী। এবং পরা বাক্ সোম্যা। বৈখরী আগ্নেয়ী। বায়ু আর সোমের কথা বলা হয়নি, উপলক্ষণ থেকে বুঝতে হবে। শুধু ইন্দ্রের কথাই বলা হয়েছে। প্রাণাত্ বায়ুঃ অজায়ত। প্রাণাপানের কথা পরে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। এর প্রাচীনতম উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে। অস্য প্রাণাদ্ অপানতি। নাসিকার ঊর্ধ্বে চক্ষুঃ। চক্ষোঃ সূর্যঃ অজায়ত। দিশঃ শ্রোত্রাত্। চন্দ্রমা মনসো জাতঃ। মন চন্দ্রমা থেকে উৎপন্ন, সেকথার যত্র তত্র উল্লেখ পাই। সাধনার দিক থেকে এদের মধ্যে correlation পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। মানুষের পাঁচটি মুখ্য বৃত্তি। শ্বাস-প্রশ্বাস, কথা বলা, দেখা, শোনা, ভাবনা করা। এগুলির মধ্যে বাক্ কর্মেন্দ্রিয়। চক্ষু আর শ্রোত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়। মন সাধারণ, সর্ব-ইন্দ্রিয়ের রাজা। তাকে একাদশ ইন্দ্রিয় বলা হয়। প্রাণনও সামান্য বৃত্তি। এই scheme logical। শ্রোত্র এবং বাকের মধ্যে বিশেষ করে inter-relation পাওয়া যায়। বিরাট পুরুষের ভাবনা স্ফুরিত হয় বাকে। তাই তাকে বলা হয় ব্যাহৃতি। ব্যাহরণ অর্থাৎ তার উচ্চারণ। এই ব্যাহৃতি থেকেই লোকসৃষ্টি। ভূর্ভুবঃস্বঃ— এই তিন ব্যাহৃতি থেকে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকের সৃষ্টি। এটা খুব প্রাচীন ধারণা; প্রাচীনতম ব্রাহ্মণগুলিতেও পাওয়া যায়। অথর্ববেদে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আর প্রাচীন উপনিষদগুলিতেও পাওয়া যায়। ভূমি বা পৃথিবী, অন্তরিক্ষলোক ও দ্যুলোকের সঙ্গে যুক্ত করে চতুর্থ ব্যাহৃতি, মহঃ-এর কথা এই উপনিষদেই ঋষি মাহাচমস্যের নতুন আবিষ্কাররূপে পাওয়া যায়। পরে জনঃ, তপঃ ও সত্যম্— ব্যাহৃতিরূপে সাজানো হয়েছে। বেদে সাতটি ব্যাহৃতির কথা নেই। ভূর্ভুবঃ স্বঃ— এই তিনটি ব্যাহৃতির কথাই আছে। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা এই তিনটি ব্যাহৃতি উচ্চারণ করলেন এবং তিনটি লোক সৃষ্টি হল। আকাশে বায়ব্য স্পন্দন হল ব্যাহৃতির উচ্চারণে।

বাক্ একটা Radiation তেজস্ক্রিয়া। অগ্নির সঙ্গে তার যোগ আছে। এই বাক্ শুনল কে? এই বাক্ তাতেই (আকাশেই) বা ব্রহ্মে ফিরে এল। তখন দিক্ হল। এই দিক কিন্তু আকাশ নয়, বাকের divergent rays কেন্দ্রাতিগ রশ্মি। এটা বাকের ধর্ম। পরিধিতে বাক্ বৈখরী হয়। ভুবন-কোলাহল, Cacophony। সাধনাতে বিষয় বাহির থেকে কেন্দ্রের দিকে যায়। বাকের এই কেন্দ্রের দিকে যাবার জন্য শ্রোত্র হল অবলম্বন, সাধন। পরা বাক্ বিচ্ছুরিত হলে সেটা পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরীতে পরিণত হয়। আগ্নেয়ী তুরীয়া অর্থাৎ চতুর্থী বাক্ 'মনুষ্যা বদন্তি'। বিপরীত দিক থেকে এলে কেন্দ্রাভিমুখ, convergent rays হবে। 'চত্বারি ৱাক্ পরিমিতা পদানি তানি ৱিদুঃ ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ। গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং ৱাচো মনুষ্যা ৱদন্তি,' ঋ. ১।১৬৪।৪৫। তিনটি বাক্ গুহায় নিহিত আছে। তাদের অনুসন্ধান করাই নাদসাধনা। বাণী জ্যোতির্ময় হলে পশ্যন্তী হয়, inner illumination. শ্রীঅরবিন্দ একেই Illumined mind বলেছেন। যখন বাক্ pure energy শুদ্ধ-শক্তিরূপ ধারণ করে, তখন সেটা পরা বাক্। মন্ত্র জপ করার সময় পরা পর্যন্ত না পৌঁছলে মন্ত্রসিদ্ধি হবে না। বাচিক— উচ্চারণ করে জপ করা বৈখরী বাক্। উপাংশু হল মানস জপ, মধ্যমা বাক্। তারপরে চৈতস জপ স্মৃতিতে পরিণত হয়। ছান্দোগ্যে তাকে 'স্মর' বলা হয়েছে। এটা জ্যোতির্ময় পশ্যন্তী বাক্। শেষে জপ এবং জাপ্য এক হয়ে যায়। তখন অজপা জপ, আপনা থেকেই হয়। বাকের তখন পরা অবস্থা। এই ধারাকে অনুসরণ করাই শ্রোত্রের সাধনা। তুমি বলছ, তুমিই শুনছ— এটা দিক্। আর দুটি যখন একাকার হয়ে যায় তখন আকাশ, অন্তরের হার্দাকাশ। √হৃ= to shine, ঝলমল করা জ্যোতি। তখন পশ্যন্তী বাক্, অন্তরে হৃদয়ে গিয়ে আকাশে মিলে যায়, তখন আনন্দ। এটা পরা বাক্। এই আকাশই দিক্ হয়ে কিরণরূপে প্রকাশিত হলে, তখন দেশ, space।

মন=চন্দ্রমা, inner illumination অন্তরের আলোক। নীচের ভূমিতে অন্তরিক্ষে চন্দ্রমা, যেখানে হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। ঊর্ধ্বভূমিতে নিত্য ষোড়শী কলা। মন বলতে দুটিই বোঝায়। সোম ঊর্ধ্বচেতনা। সোমের প্রভাসে মন আলোকিত হয়, তখন তিথি নিত্যা। বৃহৎকে অণুতে নিয়ে আসতে পারলে প্রত্যেক অণু বা তিথি নিত্য হয়ে যায়। তন্ত্রে কুমারীচেতনার কথা আছে। সে ছোট হলেও নিত্যা। প্রকাশ সেখানে সহজ। মহাশক্তি কলায় কলায় বিকশিত হন। প্রত্যেকের pshyche-তে অন্তশ্চেতনাতে তা দেখা যায়।

অন্ন থেকে বাক্ পর্যন্ত প্রথমে একটা ঠেলা দিয়ে উজিয়ে দেওয়ার পর নিজেই ব্যাখ্যা করছেন। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে... তদ্ ৱিজিজ্ঞাসস্ব।

জিজ্ঞাসস্ব=জিজ্ঞাসা করতে হবে, জানতে হবে। √জ্ঞা-এর পূর্বে বি এবং প্র উপসর্গদুটি গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান। ঋগ্বেদে বিজ্ঞান শব্দ নেই, অথর্ববেদে আছে। অবশ্য বিজ্ঞানের ক্রিয়ারূপ আছে— বিজ্ঞায়তে। ঐতরেয় উপনিষদে আছে— প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে প্রজ্ঞান। বিজ্ঞান বুদ্ধিতত্ত্ব universal consciousness. বৈশ্বিক চেতনা জাগলে তখন মন বিজ্ঞানে পৌঁছয়। মনের ওপারে বিজ্ঞান। বরুণ ভৃগুকে বলছেন— তুমি বিজ্ঞানকে ধর। তোমাকে জানতে হবে বিজ্ঞান দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন— দুধকে শুধু জানা নয়, যিনি দুধ খেয়ে শক্তি লাভ করেছেন, তিনি বিজ্ঞানী। যে শুধু শুনেছে, বা দেখেছে তার জ্ঞান হয়েছে।

এখানেই ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় সূত্র জন্মাদ্যস্য যতঃ-এর মূল। প্রথম সূত্র অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। এটা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ ব্রহ্মানন্দবল্লীর আরম্ভেই বলা হয়েছে— সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য উপনিষদে শাণ্ডিল্য ঋষি ব্রহ্মের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ— সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত— এই যা কিছু আছে, সবই ব্রহ্ম। তাঁর মধ্যেই জন্ম-লয় আর প্রাণন। তাই শান্ত হয়ে উপাসনা করো— ছা. ৩।১৪।১।

সংবিশন্তি— তলিয়ে যাওয়া। যার থেকে সর্বভূতের জন্ম, যার দ্বারা জীব বাঁচে আর অন্তে যার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, সেই উৎস কী, তা জানতে হবে। শাণ্ডিল্যের উদ্দেশ্য তাই। এটাই মূলানুসন্ধান, কারণের সন্ধান। গীতাতেও আছে— যতঃ প্রবৃত্তিঃ ভূতানাম্ যেন সর্বম্ ততম্, গী. ১৮।৪৬। যার থেকে সমস্ত জন্মায়, তিনিই সবকিছু ছেয়ে রয়েছেন, এটা জানতে পারলে, তাঁর বিজ্ঞান হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যায়। কেনোপনিষদের আরম্ভেই এই জাতীয় জিজ্ঞাসা আছে— কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ ইত্যাদি। সেখানেও উজিয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে। এখানেও তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন বা চেতনাকে অন্তর্মুখী করলে সমস্ত বহির্গামী রশ্মিগুলি অন্তরের দিকে converge কেন্দ্রিত, অরংকৃত, সংহত করলে তাপ সৃষ্টি হয়। এটাই তপঃ, এটাই যোগ। এই সমূহন আর ব্যূহনের প্রতীক হল শিবের ডমরু। এটাই ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র। তপঃ-এর স্থান, তপোলোক। পিতা বরুণ ভৃগুকে তপ করতে বললেন। সমস্ত রশ্মি, ইন্দ্রিয়গুলিকে সংহত করে বিকীর্ণ করো। এটাই ঈশোপনিষদের ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ (১৬)। তপের কাজই হল তেজের সমূহন, পরে তার ব্যূহন— ঐ সংহত তেজের বিকিরণ। তাঁর থেকে যে তেজ বিকীর্ণ হচ্ছে, সেটি আমি গ্রহণ করছি, এই ভাব আগে নিলে তখন সেটা হবে তাঁর আবেশ। আগে ব্রহ্মানন্দবল্লীতে দৃষ্টি অধ্যাত্ম

subjective ছিল। এখানে সেটি অধিদৈবত বা অধিব্রহ্ম। এই বল্লীর শেষে আনন্দের বিকিরণের কথাই প্রধানভাবে বলা হয়েছে।

শীক্ষাবল্লীর আকাশ-শরীরং ব্রহ্ম সত্যাত্ম প্রাণারামং মন-আনন্দম্ (১।৬)— এসবই হল অনুভূতির বীজ। এই অনুভূতি পাবার জন্য প্রথমে অধ্যাত্মসাধনা চাই, যেটা ব্রহ্মানন্দবল্লীতে বলা হল। এখন তাকে সর্বত্র অনুভব করার জন্য অধিদৈবত সাধনা। ৩।১

দ্বিতীয় অনুবাক

অন্নং ব্রহ্ম ইতি ব্যাজানাত্। অন্নাত্ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি। তত্ বিজ্ঞায়। পুনঃ এব বরুণং পিতরম্ উপসসার। অধীহি ভগবঃ ব্রহ্ম ইতি। তং হ উবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপঃ ব্রহ্ম ইতি। স তপঃ অতপ্যত। স তপঃ তপ্ত্বা ৩।২

ভৃগু জানলেন অন্নই ব্রহ্ম। কেননা অন্ন থেকেই তো ভূতবর্গ জন্মায়, অন্নের দ্বারাই তারা জীবনধারণ করে, শেষে অন্নেই প্রবেশ করে ও বিলীন হয়। এরকম জেনে তিনি আবার পিতা বরুণের কাছে গিয়ে বললেন— হে ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন। তাঁকে পিতা বললেন— তপের দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষ করে জান। তপই ব্রহ্ম। তখন ভৃগু আবার তপ করলেন। তিনি তপশ্চর্যা করে— ৩।২

ভৃগু অন্নকে ব্রহ্মরূপে জানলেন। এই অনুভব শেষে হলেও আগেও হতে পারে। সাধনার আরম্ভ থেকেই দৃষ্টির শুদ্ধি। জৈনেরা বলেন দৃগ্ বিশুদ্ধি। Change of outlook। বুদ্ধদেবও বলেছেন, সম্যগ্ দৃষ্টি। ব্রহ্মদৃষ্টি পেতে হলে 'সবই তিনি' এভাবে আরম্ভ করতে হবে। জৈনদের সম্যগ্ দৃষ্টি, সম্যক্ মতি, সম্যক্ চরিত্র— অন্যোন্যনির্ভর। সম্যগ্দৃষ্টি হলে, বিজ্ঞান হলে তার ফলে আকাশশরীরং ব্রহ্ম ইত্যাদির জ্ঞান হবে। ভৃগু বুঝলেন, অন্ন থেকেই ভূতবর্গ জন্মগ্রহণ করে, অন্ন খেয়েই তারা জীবনধারণ করে আর অন্তে অন্নেই প্রবেশ করে।

তদ্ বিজ্ঞায়, এই কথা জেনে তিনি আবার পিতার নিকট গেলেন এবং ব্রহ্ম-বিষয়ে আরো কিছু উপদেশ চাইলেন। তখন পিতা বললেন— তুমি তপের দ্বারা ব্রহ্মের বিজ্ঞান লাভ কর। কারণ, তপো ব্রহ্ম ইতি— তপস্যাই ব্রহ্ম। তোমার ভিতরের চেতনা সংহত হলে তাপ উৎপন্ন হবে। সেই সংহত তেজের বিচ্ছুরণ

হলেই তুমি ব্রহ্মকে আপনি জানবে, পাবে। সাধনই সিদ্ধিরূপে পরিণত হবে। সাধন-সাধনা ও সিদ্ধি একাকার হয়ে যাবে। ৩।২

তৃতীয় অনুবাক

প্রাণঃ ব্রহ্ম ইতি ৰ্যজানাত্। প্রাণাত্ হি এৱ খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীৱন্তি। প্রাণং প্রযন্তি অভিসংৱিশন্তি ইতি। তত্ ৱিজ্ঞায়। পুনঃ এৱ ৱরুণং পিতরম্ উপসসার। অধীহি ভগবঃ ব্রহ্ম ইতি। তং হ উৱাচ। তপসা ব্রহ্ম ৱিজিজ্ঞাসস্ব। তপঃ ব্রহ্ম ইতি। স তপঃ অতপ্যত। স তপঃ তপ্ত্বা—৩।৩

ভৃগু, প্রাণই ব্রহ্ম, একথা জানলেন। কারণ প্রাণ থেকেই ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়ে প্রাণের দ্বারাই জীবনধারণ করে, এবং শেষে প্রাণেই প্রবেশ করে, প্রাণেই বিলীন হয়। এই জেনে তিনি আবার পিতা বরুণের নিকট গিয়ে বললেন— ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন। (পিতা) তাঁকে বললেন— তপের দ্বারাই ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ কর। তপই ব্রহ্ম। ভৃগু আবার তপস্যা করলেন। তপস্যা করে...। ৩।৩

একইভাবে তপস্যা করার ফলে ভৃগু জানলেন, প্রাণই ব্রহ্ম। আগে যেমন অন্নের মধ্যে শরীরের মধ্যে ব্রহ্মকে জেনে আকাশশরীরং ব্রহ্মকে জেনেছিলেন, তেমনি এবার প্রাণারাম ব্রহ্মকে জানলেন। ব্রহ্মই যে প্রাণের আরাম, তা তিনি জানলেন। ৩।৩

চতুর্থ অনুবাক

মনঃ ব্রহ্ম ইতি ৰ্যজানাত্। মনসঃ হি এৱ খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীৱন্তি। মনঃ প্রযন্তি অভিসংৱিশন্তি ইতি। তত্ ৱিজ্ঞায়। পুনঃ এৱ ৱরুণং পিতরম্ উপসসার। অধীহি ভগৱঃ ব্রহ্ম ইতি। তং হ উৱাচ। তপসা ব্রহ্ম ৱিজিজ্ঞাসস্ব। তপঃ ব্রহ্ম ইতি। স তপঃ অতপ্যত। স তপঃ তপ্ত্বা— ৩।৪

ভৃগু জানলেন মনই ব্রহ্ম। কারণ, মন থেকেই ভূতবর্গের উৎপত্তি হয়, তারা মনের দ্বারাই জীবনধারণ করে, অবশেষে মনেই প্রবেশ করে, মনেই বিলীন হয়। এই জেনে তিনি আবার পিতা বরুণের নিকট গিয়ে বললেন— ভগবন্, আবার আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন। পিতা তাঁকে বললেন— তপের দ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ কর, তপই ব্রহ্ম। ভৃগু আবার তপস্যা করলেন। তপস্যা করে...। ৩।৪

ভৃগু তপস্যার ফলে প্রাণ থেকেও উর্ধ্বতর, চৈতন্যের সূক্ষ্মতর অবস্থায় মনে উঠলেন। আর মনই ব্রহ্ম, সেটা জানলেন। 'মন আনন্দং ব্রহ্ম' অনুভব করলেন। মনের মধ্যে যে আনন্দের প্রকাশ, তাই ব্রহ্মের স্বরূপ বলে জানলেন। ৩।৪

পঞ্চম অনুবাক

ৰিজ্ঞানং ব্রহ্ম ইতি ৰ্যজানাত্। ৰিজ্ঞানাত্ হি এৰ খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। ৰিজ্ঞানেন জাতানি জীৰন্তি। ৰিজ্ঞানং প্রযন্তি অভিসংৰিশন্তি ইতি। তত্ ৰিজ্ঞায়। পুনঃ এৰ ৰরুণং পিতরম্ উপসসার। অধীহি ভগৰঃ ব্রহ্ম ইতি। তং হ উৰাচ। তপসা ব্রহ্ম ৰিজিজ্ঞাসস্ব। তপঃ ব্রহ্ম ইতি। স তপঃ অতপ্যত। স তপঃ তপ্ত্বা— ৩।৫

ভৃগু জানলেন বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। কারণ, বিজ্ঞান থেকেই ভূতগণ উৎপন্ন হয়, বিজ্ঞানের দ্বারাই জীবনধারণ করে, অবশেষে বিজ্ঞানেই প্রবেশ করে ও বিলীন হয়। এই জেনে তিনি আবার পিতা বরুণের নিকট গিয়ে বললেন— ভগবন্, আমাকে আবার ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিন। পিতা তাঁকে বললেন— তপের দ্বারাই ব্রহ্মের বিজ্ঞান লাভ কর। তপই ব্রহ্ম। ভৃগু আবার তপস্যা করলেন। তপস্যা করে তিনি...। ৩।৫

তপস্যান্তে ভৃগু বিজ্ঞানভূমিতে উত্তীর্ণ হলেন। আর বিজ্ঞানই ব্রহ্ম— এটা জানলেন। এটা 'সত্যাত্মা'র অবস্থা। বিজ্ঞানই আত্মা। বিজ্ঞানভূমিতে পৌঁছলে আত্মারই সন্ধান পাব। আকাশ ও আত্মা এক। যেন দুটি মেরু। বিজ্ঞানই সত্য, বিজ্ঞানই সেতু। 'সেতুঃ ঈজানানাম্' যাজ্ঞিকদের আনন্দ। অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হবার সেতু। দেহ-প্রাণ-মন ও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের মাঝখানে সেতুস্বরূপ হল এই বিজ্ঞান। এ-ই শ্রীঅরবিন্দের অতিমানস— Supermind এর ভূমি। এই হল মাহাচমস্যের চতুর্থ ব্যাহৃতি, মহঃ। মহর্লোক। (দ্রঃ তৈঃ উঃ ১।৫।১) ৩।৫

ষষ্ঠ অনুবাক

আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ৰ্যজানাত্। আনন্দাত্ হি এৰ খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীৰন্তি। আনন্দং প্রযন্তি অভিসংৰিশন্তি ইতি। সা এষা ভাগৰী ৰারুণী ৰিদ্যা। পরমে ৰ্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। স য এৰং ৰেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নৰান্ অন্নাদঃ ভৰতি। মহান্ ভৰতি। প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মৰর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা। ৩।৬

ভৃগু জানলেন, আনন্দই ব্রহ্ম। কেননা আনন্দ থেকেই এই ভূতবর্গ জাত হয়, জাত হয়ে আনন্দের দ্বারাই জীবনধারণ করে, অন্তে আনন্দেই প্রবেশ করে ও বিলীন হয়। বরুণের দ্বারা প্রোক্ত ও প্রেরিত এবং ভৃগুর দ্বারা প্রাপ্ত এই বিদ্যা পরমব্যোমে প্রতিষ্ঠিত। যে কেউ এইভাবে জানেন, তিনিও এই আনন্দব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রচুর অন্ন, সর্বপ্রকার ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়ে অন্নাদ, সর্বভুক্ হন। তিনি সন্তান-সন্ততি, পশুধন ও ব্রহ্মতেজে মহান্ হন, (রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি হন) এবং নাম-যশেও মহান্ হন। ৩।৬

বিজ্ঞানপ্রাপ্তির পরে আরো তপস্যার ফলে ভৃগু আনন্দব্রহ্মকে জানলেন। এটাই শান্তিসমৃদ্ধ অমৃত ও আনন্দের অবস্থা। ঋগ্বেদে সোমমণ্ডলের শেষে সোম্য আনন্দের কথা আছে।

যত্র আনন্দাঃ চ মোদাঃ চ, মুদঃ প্রমুদঃ আসতে।

কামস্য যত্র আপ্তাঃ কামাঃ, তত্র মাম্ অমৃতং কৃধি।। ঋ. ৯।১১৩।১১

সেই পরমানন্দ থেকেই সবকিছু হচ্ছে। সবার উৎপত্তির কারণ তিনি । তাঁতেই সবাই জন্মায় জীবনধারণ করে আর বিলীন হয়। তজ্জলান্ ইতি, ছা. ৩।১৪।১।

এই ভাগবী বারুণী বিদ্যা পরমব্যোমে প্রতিষ্ঠিত। আবার তাকে যিনি জানেন, তিনিও প্রতিষ্ঠিত হন সর্বলোকে, ভূলোক থেকে আরম্ভ করে সত্যলোক পর্যন্ত প্রত্যেক লোকে। তিনি অন্নবান্ হন, তাঁর প্রচুর অন্ন অর্থাৎ জীবনধারণের সমস্ত সামগ্রী লাভ হয়। All round material prosperity— সর্বপ্রকার অভ্যুদয় তাঁর হয়। দারিদ্র্য (poverty) বৈদিক জীবনের আদর্শ নয়। তিনি অন্নাদ হন অর্থাৎ জাগতিক সবকিছু সুখভোগ করেন। আগেও যেটা বলা হয়েছে— সর্বান্ কামান্ অশ্নুতে।

মহান্ ভৱতি— তিনি মহান্ হন। এটা মহত্তত্ত্ব— সৌরচেতনা। কঠোপনিষদে— 'মহান্ আত্মা'র ভূমি। এই উপনিষদের মহঃ। মহর্লোক। বিজ্ঞানচেতনা।

মহান্ ভৱতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। অন্নের, স্থূলসম্পত্তির পরে material physical consciousness দৈহিক চেতনার পর প্রাণের কথা। পশু life-force, জীবনীশক্তি, vital energy। ব্রহ্মবর্চস ব্রহ্মতেজ, spiritual আধ্যাত্মিক তেজ শক্তি। তেজ বিকীর্ণ হয়। প্রজা দুরকম— বিদ্যাবংশ আর যোনিবংশ। এটাই তাঁর কীর্তি, সৃষ্টির পরম্পরা। তিনি মহান্ কীর্ত্যা √কৃ বিকিরণ। তাঁর যশ, কীর্তি সর্বত্র বিকীর্ণ হয়। এটা চরম সিদ্ধি। বৈদিক ভাবনা হল, গৃহস্থ মহাশাল, মহাক্ষত্রিয় হবে। সত্যং মহৎ ঋতং বৃহৎ— এটাই ঋষিপন্থার আদর্শ।

ফলশ্রুতিতে প্রথমেই অন্নবান্ ভৱতি, অন্নাদো ভবতি বলাতে আনন্দব্রহ্মের উপলব্ধির পরে একেবারে মহা-আকাশ— দ্যুলোক থেকে একেবারে নীচে, এই মাটির

পৃথিবীতে সিদ্ধ যেন নেমে আসেন, coming back to earth. এখানে ষষ্ঠ অনুবাকের ভাষ্য শেষ হল।

এরপরে অন্ন সম্পর্কে চারটি অনুবাক আছে, সপ্তম থেকে দশম পর্যন্ত। অন্ন শব্দ তাৎপর্যময়। অন্ন বলতে পৃথিবী বুঝতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞানের matter, বস্তু, পদার্থ (অণুরূপে), আর অন্ন সমার্থক। সমস্ত কিছুর প্রতিষ্ঠা অন্নে। ব্রহ্মকে অন্নরূপে জানতে হবে। অন্নের আরেক সংজ্ঞা হল 'পিতু'। ঋগ্বেদে অন্নসূক্ত আছে ধনান্নদানম্ ঋ. ১০।১১৭। √পী থেকে পিতু, অন্ন এবং পান দুই-ই। তাই সোমরসও পিতু। এটি পান করলে জ্যোতির্দ্বার খুলে যায়। দেহ-প্রাণ-মনের সমস্ত বাধা দূর হয়। আমরা যা খাই তাই শুধু অন্ন নয়। অন্নাদ্য বলে শব্দ আছে। আদ্যম্ অন্নম্—edible food. আবার inedible food, যা খাদ্য নয়, সেরকম অন্নও আছে। এ জগতে যা কিছু আছে সবই অন্ন। কারো না কারো অন্ন। অন্নই energy-তে চৈতন্যে রূপান্তরিত হয়। অশিতম্ অন্নম্ ত্রিধা ভবতি, ছা. ৬।৫। আমরা যে অন্ন গ্রহণ করি সেটি তিন ভাগে বিভক্ত হয়, স্থবিষ্ঠ, স্থূল, অধম ভাগ। রক্ত-মাংস-অস্থি প্রভৃতি সপ্ত ধাতুতে পরিণত হবার পর যা বাকি থাকে, সেটি পুরীষ অর্থাৎ মল হয়ে বেরিয়ে যায়। মধ্যম ভাগ রক্তমাংস ইত্যাদি। আর অণিষ্ঠ ভাগ হল মন। অন্নের সূক্ষ্মতম ভাগ মন। Food becomes thought. তাই ছান্দোগ্যে বলা হল— আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, ছা. ৭।২৬।২। আহার শুদ্ধ হলে সত্ত্ব, দেহ-মন-প্রাণ সবই শুদ্ধ হয়। এ ভাবনা থেকে একটা অনুষ্ঠান rite আছে— প্রাণাগ্নিহোত্র। আমি যে অন্নগ্রহণ করছি, সেটি আত্মপ্রাণে বিশ্বপ্রাণে আহুতি দিচ্ছি। আহার করো মনে করো আহুতি দিই শ্যামা-মাকে-রামপ্রসাদ। তাই আহারের আরম্ভে ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্, গীতা ৪।২৪ মন্ত্র উচ্চারণ করা বিধি। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অন্নগ্রহণ করেন, তার দ্বারা সবার তৃপ্তি হয়। এটাই অন্নের প্রতি শুদ্ধদৃষ্টি। অন্ন থেকেই প্রাণ, মন, ব্রহ্মবর্চস সবকিছু। আমার অন্নময় শরীর আদ্য অন্ন গ্রহণ করে ব্রহ্মের দিকে বিকশিত হয়। দুটি ধারা, অগ্নিহোত্র ও সোমযাগ। অগ্নি-সোম— দেবতার প্রসিদ্ধ দ্বন্দ্ব বা মিথুন। বলা হয়েছে— অগ্নীষোমাত্মকং জগৎ। অগ্নিতে যাকিছু আহুতি দেওয়া হয় তা রূপান্তরিত হয় সোমে, সোম্য আনন্দে, পিতু-তে। পিতু অন্নের রাহস্যিক নাম।

অন্ন আমাদের অস্তিত্বের মূল। অন্নের আধার পৃথিবী। তার প্রতিরূপ হল আমাদের দেহ। এই দেহই পৃথিবী। আমার এই দেহে, এই পৃথিবীতে, দৈনন্দিন জীবনে আনন্দ নামিয়ে আনা, এটাই অনুবাকগুলির লক্ষ্য। এই পার্থিবজীবন, food & drink, অন্নপানের যে জীবন, তার ভিতর দিয়ে ব্রহ্মকে দেখা, পাওয়া, ছড়িয়ে দেওয়া, ব্যাপ্ত

করা, ব্রহ্মানন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিচরণ করা— এটাই জীবনের লক্ষ্য। এটাই আদর্শ জীবন— 'বিষয়ানন্দে ব্রহ্মানন্দ' পঞ্চদশী, প্রকরণ ১৫।

সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।— রবীন্দ্রনাথ

সপ্তম অনুবাক

অন্নং ন নিন্দ্যাত্। তদ্ ব্রতম্। প্রাণঃ বৈ অন্নম্। শরীরম্ অন্নাদম্। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তত্ এতত্ অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স যঃ এতত্ অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি। মহান ভবতি প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা।। ৩।৭

অন্নের নিন্দা করবে না। এই হল ব্রহ্মবিদের ব্রত। প্রাণই অন্ন আর শরীর অন্নাদ। প্রাণের মধ্যে শরীর প্রতিষ্ঠিত। শরীরের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। তাই (অন্যোন্যসাপেক্ষে) এই অন্ন ঐ অন্নের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এভাবে অন্নের মধ্যেই অন্ন প্রতিষ্ঠিত আছে বলে জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি (একাধারে) অন্নবান্ ও অন্নাদ হন। প্রজা (সন্ততি) পশু ও ব্রহ্মবর্চস লাভ করে মহান্ হন, মহতী কীর্তি লাভ করেন।। ৩।৭

ব্রহ্মবিদ্ কখনো অন্নের নিন্দা করবে না। বিদ্বেষবশে বা তপস্যার ছলেও অন্নগ্রহণ না করা— এটাও অন্নের নিন্দা। অন্নকে যারা অস্বীকার করে, তারা অন্ননিন্দক। He looks down upon material existence. ভূতিকে, অভ্যুদয়কে যাঁরা খাটো করেন, হীন মনে করেন, তাঁরাও অন্ননিন্দক। বেশি সাধুতা ভালো নয়। যা খাদ্য তার নিন্দা, বিদ্বেষ করবে না। তাই গীতাতে (৬/১৬, ১৭) বলা হয়েছে— 'যুক্তাহারবিহা'-এর কথা। শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট বলছেন— ন অতি অশ্নতঃ তু যোগঃ অস্তি ন চৈকান্তম্ অনশ্নতঃ। যে বেশি খায়, খাই-খাই করে, তার যোগ হয় না। আবার যিনি না খেয়ে থাকেন, তাঁরও যোগ হয় না। অন্নের প্রতি, এই দেহের প্রতি, পৃথিবীর প্রতি যেন বিদ্বেষভাব না হয়, ঘৃণার ভাব না হয়— সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

তদ্ ব্রতম্— আনন্দব্রহ্মকে যিনি লাভ করেছেন, তাঁর পক্ষে এই হল ব্রত। দৈনন্দিন ব্রত। তিনি কখনো অন্নকে অস্বীকার করবেন না। এই পার্থিব জীবনকে, অভ্যুদয়কে অস্বীকার করবেন না।

প্রাণঃ বৈ অন্নম্, শরীরম্ অন্নাদম্— শরীর অন্ন, আর প্রাণ অন্নাদ, একথা উহ্য আছে। আবার, এও বলা যায়, ক্রম উল্টে দেওয়া হয়েছে। আমরা সামান্যত মনে

করি— শরীর অন্ন, ও প্রাণ অন্নাদ। এখানে বলা হচ্ছে, শরীর প্রাণকে ভক্ষণ করে। সেটা কোন্ শরীর? সাধারণ শরীর নয়, ব্রহ্মবর্চসই শরীর, আনন্দব্রহ্মের উপলব্ধিতে যে শরীর ব্রহ্মবর্চস্বী হয়েছে— এটাই বৈষ্ণবদের ভাবতনু। সত্ত্বশুদ্ধির ফলে যা হয়। এই ভাবতনু বৈষ্ণবদের ভাষায় অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টদেহ। তিনিই অন্নাদ। আগে যে অন্নময় পুরুষের কথা বলা হয়েছে, তিনিই এই শরীরে অন্নাদ, তিনি প্রাণকে অন্নরূপে গ্রহণ করছেন। অন্ন হল যা কিছু বাইরে থেকে আহরণ করছি, সব। সমস্তই ভিতরের অন্নময় পুরুষের অনুকূল। চারিদিকে যা আছে, সবকিছু গ্রহণ করে আমি পুষ্ট হচ্ছি— সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া। তখনই তা সত্য করে গীতার ভাষায় 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ...' ইত্যাদি হবে।

এই অন্নময় পুরুষের অন্ন হল প্রাণ। সে প্রাণকে শোষণ করছে পঞ্চমহাভূত থেকে।

প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্— সেই শরীর, সেই অন্নময় পুরুষ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। এটা প্রাণাগ্নিহোত্র। আবার শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। অন্নময় পুরুষ ভিতরে আছেন বলেই প্রাণ শরীরে প্রতিষ্ঠিত।

এইভাবে অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। এটা অন্যোন্যভাবনা। matter and life-এর equation, অন্ন ও প্রাণের সমীকরণ। প্রাণ অন্নকে অবলম্বন করে আছে, আর অন্নও প্রাণের সঙ্গেই আছে। অন্যোন্যনির্ভর। এভাবে যে জানে, সে অন্নে প্রতিষ্ঠিত। তুলনীয়— আইনস্টাইনের প্রসিদ্ধ equation $E = mc^2$.

এরপর ফলশ্রুতি আগের মতো। এই ধারার অনুবৃত্তি পরের অনুবাকগুলিতেও চলবে।

অষ্টম অনুবাক

অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্ ব্রতম্। আপঃ বৈ অন্নম্। জ্যোতিঃ অন্নাদম্। অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষি আপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তত এতত্ অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। সঃ যঃ এতত্ অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতং ৱেদ, প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নৱান্ অন্নাদঃ ভৱতি। মহান্ ভৱতি। প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মৱর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা।। ৩।৮

অন্নকে পরিহাস বা উপেক্ষা করবে না। ব্রহ্মবিদের এই ব্রত। জলই অন্ন আর জ্যোতি বা তেজ অন্নাদ। (এর বিপরীতও সত্য— তেজই অন্ন, জল অন্নাদ। জলের মধ্যে তেজ প্রতিষ্ঠিত আর তেজের মধ্যে জল প্রতিষ্ঠিত। তাই এভাবে অন্যোন্যসাপেক্ষ

জল ও তেজ, অন্নের মধ্যে অন্ন প্রতিষ্ঠিত)। যিনি এভাবে এক অন্নের মধ্যেই অন্য অন্ন প্রতিষ্ঠিত আছে বলে জানেন, তিনি অন্নবান আর অন্নাদ, প্রচুর অন্নশালী ও অন্নভোজী হন। তিনি সন্তান, পশু ও ব্রহ্মতেজে মহান্ হন। আর কীর্তিতেও মহান্ হন।। ৩।৮

অন্নং ন পরিচক্ষীত— অন্নকে অর্থাৎ আহার্য বস্তু যা কিছু সামনে আসে বা কাছে আছে— তোমার mode of living কে পরিচক্ষণ করবে না। পরি=চারিদিক, all around। √চক্ষ্ =দেখা, তাকে circumspect করবে না, চারিদিকে তাকিয়ে দেখবে না। অর্থাৎ খেতে বসে খুঁতখুঁত করা, অন্নের নিন্দা করা বা একেবারে অস্বীকার করা, চলবে না। যা আসছে, যা পাচ্ছো, তাকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে হবে। রামকৃষ্ণের ব্রাহ্মণ আর চাষার গোরুর উপমা— ব্রাহ্মণের গোরু ছিড়িক ছিড়িক করে দুধ দেয় আর চাষার গোরু হুড় হুড় করে দুধ দেয়।

আপঃ বৈ অন্নম্। জ্যোতিঃ অন্নাদম্। ব্রহ্মবিদের শরীর ব্রহ্মবর্চস্বী জ্যোতির্ময় হয়ে গেছে। ভাবতনু থেকে সত্ত্বতনু হয়ে গেছে। আপঃ—দেবীরাপঃ। জ্যোতির্ময় অপ্। দ্যুলোকের প্রাণ। এইভাবে শরীর জ্যোতির্ময় হয়ে গেলে আর খুঁতখুঁতে ভাব থাকে না, পরিচক্ষণ থাকে না।

অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। এই জ্যোতি বিদ্যুতের জ্যোতি। আমি বর্ষার সজল মেঘ, তার মধ্যে বিদ্যুতের ঝলক। জ্যোতিষি আপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। জ্যোতিতে তেজে অপ্ প্রতিষ্ঠিত। এই জ্যোতি সূর্য। তার থেকে আপঃ, দেবীরাপঃ ঝরে পড়ছে পৃথিবীতে। বিদ্যুৎরূপী জ্যোতি অপ্-এ প্রতিষ্ঠিত। বেদের ভাষায় অপাং নপাত্— বিদ্যুতের দেবতা আর সূর্য দুই এক— দুই আমি। ফলশ্রুতি আগের মতো।

নবম অনুবাক

অন্নম্ বহু কুর্বীত। তদ্ ব্রতম্। পৃথিবী বৈ অন্নম্। আকাশঃ অন্নাদঃ। পৃথিব্যাম্ আকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তত্ এতত্ অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতত্ অন্নম্ অন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা।। ৩।৯

অন্নকে বর্ধিত করবে— ব্রহ্মবিদের পক্ষে এটাও ব্রত। পৃথিবী অন্ন, আর আকাশ অন্নাদ। কারণ পৃথিবী আকাশে প্রতিষ্ঠিত। (আবার, আকাশই অন্ন, পৃথিবী অন্নাদ, কারণ) পৃথিবীতে আকাশ প্রতিষ্ঠিত। তাই (এই পৃথিবী ও আকাশ অন্যোন্যসাপেক্ষ

বলে) অন্নই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এভাবে জানেন তিনি প্রচুর অন্নশালী ও অন্নভোজী হন। তিনি সন্তান, পশু ও ব্রহ্মতেজে মহান্ হন। কীর্তিতেও মহান্ হন। ৩।৯

অন্নং বহু কুর্বীত। তদ্ ব্রতম্ সোজা কথায় অন্নকে তৈরি করবে, সংগ্রহ করবে, বাড়াবে। যাতে অনেক লোক খাওয়াতে পারো। ক্ষুদ্রকে, অল্পকে বিপুল করবে। অন্নে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাকে বড়ো করবে। To transform matter by entering into it. অভ্যুদয়ে পিছপা হবে না। এই তোমার ব্রত হোক।

পৃথিৱী বৈ অন্নম্। আকাশঃ অন্নাদঃ। আকাশ-শরীরের কথা হচ্ছে। শরীর আকাশবৎ হয়ে যায়। আকাশরূপী তিনিই অন্নাদ। পৃথিবী তখন অন্ন। ভুক্ত অন্ন যেমন রূপান্তরিত হয় প্রাণ ও মনে, তেমনি আকাশ-শরীর সমস্ত পৃথিবীকে রূপান্তরিত করবে প্রাণে ও মনে। I become one with the earth, with the universe. এই পৃথিবীতেই তখন আকাশ প্রতিষ্ঠিত আর পৃথিবী আকাশে প্রতিষ্ঠিত। এভাবে যিনি জানেন, তাঁর ফলশ্রুতি আগের মতো।

অন্ন বিষয়ে তিনটি ব্রতের কথা বলা হল। এক, অন্নকে প্রত্যাখ্যান না করা, not to reject food, material welfare। দুই, অন্নের নিন্দা বা উপেক্ষা না করা, not to criticise or ignore food, material welfare। তিন, অন্নকে বহু, বিপুল করে তোলা, to increase food, wealth of all type. এইভাবে আকাশ-শরীরং ব্রহ্ম সত্যাত্মা প্রাণারামং মন আনন্দং শান্তিসমৃদ্ধমমৃতং ব্রহ্ম (১।৬।২) হয়ে গেলে এই সমস্ত পৃথিবী তার কাছে অন্ন। পৃথিবী যখন অন্ন, তখন সবাই, সবকিছু, আমার কাছেই আসবে। এবং আমিও সবার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হব। তখন আমিই 'জগন্নিৱাসঃ'। গীতাতেও এই ভাবনা আছে। আরো দ্র. ঈশ ৬, ৭।

দশম অনুবাক

ন কঞ্চন ৱসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ ব্রতম্ তস্মাত্ যয়া তয়া চ ৱিধয়া বহু অন্নং প্রাপ্নুয়াত্। অরাধি অস্মৈ অন্নম্ ইতি আচক্ষতে। এতত্ বৈ মুখতঃ অন্নং রাদ্ধম্। মধ্যতঃ অস্মৈ অন্নং রাধ্যতে। এতত্ বৈ অন্ততঃ অন্নং রাদ্ধম্। অন্ততঃ অস্মৈ অন্নং রাধ্যতে।। ৩।১০।১

নিবাসের জন্য আগত কাউকে প্রত্যাখ্যান করবে না। এই তার (ব্রহ্মবিদের) ব্রত। সুতরাং যে কোনভাবে তিনি বহু অন্ন লাভ করবেন। (যারাই তার কাছে আসবেন)

তাদের তিনি বলবেন, আপনার জন্যই এই অন্ন রন্ধন করা হয়েছে— এভাবে মুখ্য বা প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ সৎকারপূর্বক যিনি অন্ন রন্ধন করে প্রদান করেন, তাঁর নিকট মুখ্য প্রকারে— ভাল করে অন্ন উপস্থিত হয়। যিনি মধ্যম বৃত্তি অবলম্বন করে অর্থাৎ মধ্যম অবস্থায় বা মধ্যম শ্রদ্ধা সহকারে অন্ন রন্ধন করে প্রদান করেন, তাঁর নিকট মধ্যমভাবে অন্ন সমাগম হয়। আর যিনি অন্তকালে অর্থাৎ অধমবৃত্তি অবলম্বন করে বা অনাদরপূর্বক অন্ন রন্ধন করে প্রদান করেন তাঁর কাছে অধম প্রকারের অন্ন-সমাগম হয়।। ৩।১০।১

মুখতঃ অন্নং রাদ্ধম, মধ্যতঃ অন্নং রাদ্ধম্, অন্ততঃ অন্নং রাদ্ধম্— মুখতঃ, মধ্যতঃ আর অন্ততঃ এই তিন শব্দের ব্যাখ্যা ভাষ্যকাররা, অনুবাদে যেমন দেওয়া হয়েছে, তেমনি মুখ্যভাবে, আরম্ভে বা উত্তম শ্রদ্ধাসহকারে, মধ্যমভাবে মধ্যসময়ে বা মধ্য শ্রদ্ধা সহকারে, আর অন্তসময়ে বা নিকৃষ্টভাবে অন্ন রন্ধন করার কথা বলেছেন, যেন যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, যিনি আকাশ-শরীর সত্যাত্মা, প্রাণারাম, মন-আনন্দং শান্তি-সমৃদ্ধম্ অমৃতং ব্রহ্মের উপলব্ধি করেছেন, তাঁর বাকি জীবনের কর্তব্য শুধু অন্নসত্র বা অতিথিশালা চালানো অথবা শিবভাবে জীবসেবা করা। এটা খুব সাধারণ ব্যাখ্যা। আসলে, অন্নকে শুধু স্থূলভাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। ব্রহ্মজ্ঞ শ্রোত্রিয় অন্ন থেকে আনন্দ পর্যন্ত সর্বপ্রকার অন্ন লাভ করেছেন আর সেই অন্ন বিতরণ করার ক্ষমতাও অর্জন করেছেন। তাঁর আশ্রম বা গৃহের দ্বার সর্বপ্রকার অন্নপ্রার্থী অভ্যাগত বা অন্তেবাসীর জন্য উন্মুক্ত থাকবে। অধিকারভেদে তিনি সবার ক্ষুধা নিবারণ করবেন।

এখানে ভাব হল, আপূর্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠম্ সমুদ্রম্ আপঃ প্রবিশন্তি যদ্বত্ গী. ২।৭০। সিদ্ধপুরুষ অচলপ্রতিষ্ঠ ভরা-সমুদ্রের মতো, আকাশের মতো হয়ে যান। নদীগুলি যেমন সমুদ্রে সহজভাবে প্রবেশ করে, সমুদ্র যেমন বিনা দ্বিধায় সমস্ত জল গ্রহণ করে, সিদ্ধও তাঁর কাছে যাঁরাই আসবেন, তাঁদের গ্রহণ করবেন, তাঁদের ক্ষুধা-নিবারণ করবেন, কাউকে অস্বীকার করবেন না, ঠেলে দেবেন না।

ন কঞ্চন রসতৌ প্রত্যাচক্ষীত— তোমার কাছে যাঁরাই আসবেন, তাঁদের কাউকে প্রত্যাখ্যান করবে না। তদ্‌ব্রতম্— এটাই ব্রত।

তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহু অন্নং প্রাপ্নুয়াত্— সবার জন্য তোমার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। তোমাকে যেকোন ভাবে বহু অন্ন, সর্বপ্রকার প্রচুর অন্ন লাভ করতে হবে। তুমি মহাশাল, মহাশ্রোত্রিয় হবে। তোমার ভাব হবে, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম্।। গী. ৪।১১। যারা যেভাবে তোমার কাছে আসবে, তুমি তাদের সেভাবে গ্রহণ করবে।

অরাধি অস্মৈ অন্নম্ ইতি আচক্ষতে— অরাধি √রাধ্ সংসিদ্ধৌ। তখনি বলা যেতে

পারে, এর কাছে সর্বপ্রকার অন্ন ভাল করে রন্ধন করা হয়েছে। সর্বপ্রকার সিদ্ধি এখানে সিদ্ধ হয়েছে। আচক্ষতে— লোকে বলে, তিনি সর্বসিদ্ধ।

মুখতঃ অন্নম্ রাদ্ধম্— এর মুখে অন্ন সিদ্ধ হয়েছে অর্থাৎ তিনি বাক্‌সিদ্ধ হয়েছেন। এটা বাক্‌রূপী অন্নের সিদ্ধি। মুখ, বাক্ দ্বারা সংসিদ্ধি। তিনি তাঁর মুখ, বাক্, মন্ত্রশক্তি দিয়ে সবাইকে জারিত করছেন। এখানে সমস্তই আধ্যাত্মিক, বৈশ্বিক ব্যাপার।

এতদ্বৈ মধ্যতঃ অন্নং রাদ্ধম্— অন্ন মধ্যভাগে, হৃদয়ে এল। হার্দাকাশে, হৃৎকেন্দ্রে অন্ন সিদ্ধ হয়েছে।

এতদ্বৈ অন্ততঃ অন্নং রাদ্ধম্— এখানে অন্ন অন্তে— দুটো অন্ত ধরতে হবে— নীচে বা উপরে। নিম্নে নাভিচক্রে বা ঊর্ধ্বে আজ্ঞা বা সহস্রার কেন্দ্রে সিদ্ধ হয়েছে। ভূলোক থেকে সত্যলোক পর্যন্ত সর্বত্র চেতনার সিদ্ধি হয়েছে। নাভিতে অর্থাৎ উদরে অন্ন জীর্ণ হয়। অর্থাৎ চেতনা আত্মসাৎ হয়, তদ্‌রূপে রূপান্তরিত হয়। অন্ন নাভিতে সিদ্ধ হয়। সেখানে বৈশ্বানর অগ্নি রয়েছে। অন্ন সেখানে পাক হলে অগ্নিশিখা হয়ে ঊর্ধ্বে উঠে যায়, মুখে বাক্‌শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। এটাই যথার্থ অন্নভোজন, অগ্নিভোজন,। কালাগ্নি হয়ে খাওয়া। অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা পচামি-অন্নম্ চতুর্বিধম্, গী. ১৫।১৪। তারপর সহস্রার থেকে সর্বত্র তেজরূপে চৈতন্য বিকীর্ণ হয়, সূর্যতেজের ব্যূহনের মতো।

ব্রহ্মবিদের যেমন চেতনার সর্বস্তরে সিদ্ধি হয়, তেমনি সেটা বিতরণ করার শক্তিও তিনি পান। আর যেমন বিতরণ হয়, তেমনি তাঁর কাছে শক্তির, অন্নের বৃদ্ধিও হয়। তখন তাঁর মীরার মতো ভাব— পায়ো জি ম্যয়নে রামরতন ধন পায়ো/খরচে ন খুটে, জাকো চোর ন লুটে/দিন দিন বঢ়ত সৱায়ো।। শোনো সকল সুজন, আমি রাম-রূপী রত্ন ধন পেয়েছি, যা খরচা করলেও কমে না, যা চোরও লুটতে পারে না, আর দিনের পর দিন যা সওয়া-গুণ বেড়েই চলে।

য এৱং ৱেদ। ক্ষেম ইতি ৱাচি। যোগক্ষেমঃ ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্ম ইতি হস্তয়োঃ। গতিঃ ইতি পাদয়োঃ। ৱিমুক্তিঃ ইতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈৱীঃ। তৃপ্তিঃ ইতি ৱৃষ্টৌ। বলম্ ইতি ৱিদ্যুতি।। ৩।১০।২

যিনি এইভাবে জানেন (তাঁর ফলশ্রুতি।)। তিনি (ব্রহ্মকে) ক্ষেমরূপে বাণীতে, যোগক্ষেমরূপে প্রাণাপানে, কর্মরূপে দুটি হাতে, গতিরূপে দুটি চরণে, পরিত্যাগরূপে পায়ুতে প্রতিষ্ঠিত জানেন। এই সমস্ত হল মানুষী সমাজ্ঞা—উপাসনা। এবার দৈবী সমাজ্ঞা— (তিনি ব্রহ্মকে) তৃপ্তিরূপে বৃষ্টিতে আর বলরূপে বিদ্যুতে জানেন।। ৩।১০।২

আগে যা বলা হয়েছে, সে বিষয়ে এখন দুটি সমাজ্ঞার কথা বলা হচ্ছে। মানুষী আর দৈবী। সমাজ্ঞা—সম্-আ-জ্ঞা। সম্যক্‌ভাবে সবকিছু জানা। উপনিষদে 'আদেশ' বলে কথা আছে। ইতি আদেশঃ, ইতি উপনিষত্। আদেশ— এমন বাচনভঙ্গী, কথা বলা, যার মধ্যে শক্তি রয়েছে, যা ক্রমশঃ স্ফুরিত হয়। নেতি নেতি ইতি আদেশঃ— বৃহদারণ্যক। তস্য এষ আদেশঃ, যদ্ এতদ্ ৱিদ্যুতো ৱ্যদ্যুতত্ আ ইতি, নি-অ মিমীষদ্ আ (কেন-৪।৪) অর্থাত্— বিদ্যুতের প্রভা বিদ্যোতিত বা চমকিত হল, আ... এইভাবে। চোখ নিমীলিত হল, আ... এইভাবে। এই রকমই ব্রহ্মের অনুভূতি। উপনিষদের মহাবাক্যগুলিও এইরকম আদেশ। যেমন— অয়মাত্মা ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ ত্বম্ অসি, সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম, সর্ৱং খলু ইদং ব্রহ্ম প্রভৃতি সমাজ্ঞা। সম্যক্ আদেশ। সম্যক্‌রূপে সবকিছু জানা। সমাজ্ঞা দুপ্রকার— মানুষী আর দৈবী। ভিতরের অধ্যাত্ম আর বাইরের অধিদৈবত।

প্রথম মানুষী বা অধ্যাত্ম সমাজ্ঞা। চলছি-ফিরছি, বলছি, কাজ করছি— সবকিছুর মধ্যে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জীবনের সব কর্ম ব্রহ্মভাবনাসহ করতে হবে।

ক্ষেম ইতি বাচি— কথা বলছি, বাক্ উচ্চারণ করছি, তার দ্বারা ব্রহ্মকে জানব ক্ষেমরূপে। আমার বাক্ যেন সত্য হয়, প্রিয় হয়, কল্যাণী হয়। যেমন শান্তিপাঠে আছে— জিহ্বা মে মধুমত্তমা। বাক্ যেন ক্ষেমঙ্করী হয়, রাক্ষসী বা ক্রূর না হয়। অন্যত্র আছে, সত্যং ব্রূয়াত্ প্রিয়ং ব্রূয়াত্। বাকে তিনি ক্ষেমরূপে আছেন, এইভাবে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। প্রাণাপান— নিঃশ্বাস ছাড়া আর নেওয়া, তার মধ্যেই যোগ-ক্ষেমের ভাবনা করতে হবে। যোগক্ষেম পারিভাষিক শব্দ। ঋগ্বেদেও তার ব্যবহার আছে। যোগক্ষেমং ৱহাম্যহম্, গী. ৯।২২। যোগ অর্থাৎ যা বাইরে ছিল, তাকে ভিতরে আনা to bring in, to earn something। ক্ষেম হল নিবাস। যা এসেছে তাকে রক্ষা করা। to save, to protect। জীবনে চাই যোগক্ষেম to earn and to save। নানাভাবে বিদ্যা বা জ্ঞান আহরণ করতে হবে এবং তার সংরক্ষণও করতে হবে। প্রাণাপানের ক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ছাড়ার সময় ব্রহ্মের যোগক্ষেম লক্ষ্য করবে। যেমন— শ্বাস গ্রহণকালে ব্রহ্মকেই যেন যোগরূপে টেনে আনছ। আর যখন শ্বাস ত্যাগ হচ্ছে, তখন আকাশেই ব্রহ্মকে ক্ষেমরূপে প্রতিষ্ঠিত করছ। এই ক্রিয়াকেই উল্টো করে অপানকে আকর্ষণ করছি, আর প্রাণকে ছড়িয়ে দিচ্ছি— এই ভাবনা প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে করতে হবে। ব্রহ্মই আমার মধ্যে প্রাণাপানরূপে প্রতিষ্ঠিত।

কর্ম ইতি হস্তয়োঃ— হাত দিয়ে যা কিছু করছি, আমার সমস্ত কর্ম ব্রহ্মকর্ম বা ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মের দ্বারাই হচ্ছে। কর্ম-করণ-কর্তা সবই ব্রহ্মময়।

ৱিমুক্তিঃ ইতি পায়ৌ— পায়ুর দ্বারা মলত্যাগও ব্রহ্মের ক্রিয়া। আমার সর্বেন্দ্রিয়ের পরিচালনা তিনিই করছেন। শরীরের বর্জ্য পদার্থও ব্রহ্ম। ঘর্মও পায়ুর ক্রিয়া। ব্রহ্মরূপে সব বেরিয়ে যাচ্ছে বলেই বেঁচে আছি। পা+আয়ু=পায়ু। পাতি =রক্ষতি। যা ভিতরে আসে, সেটি ব্রহ্ম অমৃত, আবার যা বেরিয়ে যায় সেটিও ব্রহ্ম অমৃত। বাউলদের সাধনায় আছে— চারি চন্দ্র শোধন। চারি চন্দ্র হল মল-মূত্র-রজঃ-বীর্য। চন্দ্র=অমৃত। তান্ত্রিকরা বিশেষ করে অঘোর তান্ত্রিকরা এই সাধনা করেন। কথা আছে— সিদ্ধপুরুষের মলমূত্র পর্যন্ত অমৃতসমান। সাধকপ্রবর বামাক্ষেপাকে নিয়ে এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ কাহিনী আছে।

এখানে উপস্থকে বাদ দিয়ে চারটি কর্মেন্দ্রিয়ের কথা বলা হল। উপস্থ সম্পর্কে পরে বলা হবে।

অথ দৈৱীঃ— এখন দৈবী সমাজ্ঞা। এটা cosmic, বৈশ্বিক, অধিদৈবিক— বাইরের জগতে যে ক্রিয়াগুলি হয়, সে বিষয়ে বলছেন। ব্রহ্ম সর্বত্র আছেন। যেখানে যাকিছু হচ্ছে, তিনিই করছেন। বলা হয়েছে— বৃষ্টিতে ব্রহ্ম তৃপ্তিরূপে আছেন— তৃপ্তিঃ ইতি ৱৃষ্টৌ। অনাবৃষ্টির পরে বা বর্ষার আগে, চারিদিকে শুখা, শুষ্ক— √শুষ্ =শুকিয়ে যাওয়া। চারদিক শুখিয়ে গেলে ব্রহ্ম বৃষ্টিধারারূপে সবার মধ্যে যেন আনন্দ তৃপ্তি বর্ষণ করেন। ব্রহ্মই তৃপ্তিরূপে বৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত। 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো'—রবীন্দ্রনাথ।

বলম্ ইতি ৱিদ্যুতি— বিদ্যুতের মধ্যে তিনিই বল। সবার মধ্যে যেন বিদ্যুৎরূপে energy, শক্তিরূপে তিনি খেলে বেড়াচ্ছেন। বিদ্যুৎই ইন্দ্রের বজ্র। যা দিয়ে মেঘ বিদীর্ণ করে ইন্দ্র বৃষ্টি ঝরান।

এরপরে দুটি অনুচ্ছেদে মানুষী ও দৈবী সমাজ্ঞা একাধারে বলা হয়েছে। আর তৎ-ব্রহ্মের নানাবিধ উপাসনা ও ফলশ্রুতির কথা বলা হচ্ছে—।

যশঃ ইতি পশুষু। জ্যোতিঃ ইতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতিঃ অমৃতম্ আনন্দঃ ইতি উপস্থে। সৰ্ৱম্ ইতি আকাশে। তত্ প্রতিষ্ঠা ইতি উপাসীত। প্রতিষ্ঠাৱান্ ভৱতি। তত্ মহঃ ইতি উপাসীত। মহান্ ভৱতি। তত্ মনঃ ইতি উপাসীত। মান-ৱান্ ভৱতি।। ৩।১০।৩

তত্ নমঃ ইতি উপাসীত। নম্যন্তে অস্মৈ কামাঃ। তত্ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত। ব্রহ্মবান্ ভৱতি। তদ্ ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ ইতি উপাসীত। পরি এনং ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যে অপ্রিয়াঃ ভ্রাতৃৱ্যাঃ। স যঃ ■ অয়ং পুরুষে। যঃ চ অসৌ আদিত্যে। স একঃ।। ৩।১০।৪

যশরূপে পশুদের মধ্যে, জ্যোতিরূপে তারকাদের মধ্যে, সন্তান-উৎপত্তি দ্বারা অমৃতত্বপ্রদানকারী ও আনন্দরূপে জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে এবং সর্বরূপে আকাশে (ব্রহ্মই উপস্থিত) প্রতিষ্ঠিত। (এই সর্বাধাররূপী আকাশের মধ্যেই) তিনি প্রতিষ্ঠিত— এইভাবে তাঁর উপাসনা করা উচিত। (এইভাবে ব্রহ্মের যিনি উপাসনা করেন) তিনি (সর্বত্র) প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁকে মহঃ— মহান্ বা শক্তিমান্‌রূপে যিনি উপাসনা করেন, তিনি মহান্ হন। তাঁকে মনরূপে উপাসনা করলে মনস্বী— মনীষী হন।। ৩।১০।৩

তাঁকে নমঃরূপে উপাসনা করবে। তখন তার কাছে সর্বকামনা, তাঁর ইচ্ছাসমূহ, সংকল্প নেমে আসে অর্থাৎ সবকিছু তার বশ হয়। তাঁকে ব্রহ্মরূপে অর্থাৎ বৃহৎরূপে যিনি উপাসনা করেন, তিনি বৃহৎ হন। (সেই) ব্রহ্মকে (সবার) সংহারের দ্বাররূপে (যাঁর মধ্যে সবার লয় হয়) উপাসনা করবে। (তাহলে) তোমার বিদ্বেষী (শত্রুগণ) আর অপ্রিয় আত্মীয়েরাও মৃত্যুবরণ করবেন। সেই পরমাত্মা, যিনি এই পুরুষের মধ্যে রয়েছেন, আর যিনি ঐ আদিত্যে আছেন, তিনি এক, অভিন্ন।। ৩।১০।৪

যশঃ ইতি পশুষু। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ, বলমিতি ৱিদ্যুতি;— ইত্যাদি ভাব পর্জন্যসূক্ত (ঋ ৫।৮৩) থেকে নেওয়া। সেখানে বজ্র-বর্ষণের কথাও আছে। ব্রহ্মই পশুরূপে সর্বত্র বিচরণ করছেন। √ঈশ্ >যশ— ঈশনা, mastery, প্রভুত্ব, প্রাণের ওপর প্রভুত্ব। প্রাণের সামর্থ্যই যশঃ। পশুদের মধ্যে, সব প্রাণীর মধ্যেই এই প্রাণের সামর্থ্যরূপে ব্রহ্মই আছেন।

জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু— সব জ্যোতিই আকাশে লয় হয়ে যায়। তখন অমাবস্যার রাত্রিতে থাকে কেবল নক্ষত্রের জ্যোতি। ব্রহ্মই জ্যোতিরূপে নক্ষত্রগুলিতে ব্যাপ্ত আছেন। ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম। নেমা ৱিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ৱম্। তস্য ভাসা সর্ৱমিদং ৱিভাতি।। কঠ ২।২।১৫; শ্বেতা ৬।১৪; মুণ্ডক ২।২।১০। দ্যুলোকের জ্যোতি সূর্য চন্দ্র তারা, অন্তরিক্ষের জ্যোতি বিদ্যুৎ, পৃথিবীর জ্যোতি অগ্নি— সমস্ত জ্যোতির অধিষ্ঠান ব্রহ্ম। তাঁর জ্যোতিতেই সবাই জ্যোতির্ময়। তাই বলা হল— নক্ষত্রসমূহে ব্রহ্মই জ্যোতিরূপে অধিষ্ঠিত। আকাশে নক্ষত্রসমূহের ব্যাপ্তি সর্বাধিক। তাই ব্রহ্মজ্যোতিও নক্ষত্রসমূহে সর্বাধিক। নক্ষত্রের বিপরীত সক্ষত্র, ক্ষত্র=ক্ষাত্রবীর্য। সূর্যের মধ্যে প্রাণের—বীর্যের প্রকাশ, ব্যক্তজ্যোতি বা মিত্রজ্যোতি। নক্ষত্রের মধ্যে যে প্রকাশ, সে

অব্যক্তজ্যোতি। সেই অব্যক্তই আবার সূর্যের উৎস। নক্ষত্র সেদিক থেকে জ্যোতির সর্বোত্তম রূপ— রাতের আকাশ। সেখানে বরুণই নক্ষত্রের জ্যোতি। এখানে অনন্তের দ্যোতনা। অর্থাৎ নক্ষত্রের জ্যোতি অনন্ত; অনন্ত আকাশ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত।

প্রজাতিঃ অমৃতম্ আনন্দঃ ইতি উপস্থে। সাধনার যে ধারার কথা এখানে বলা হয়েছে, তার মধ্যে তন্ত্রের বামাচারের বীজ পাচ্ছি। ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই কথা বিশদভাবে আছে। এই ধারারও মূল আছে ঋগ্বেদের গর্ভাধান মন্ত্রে (১০।১৮৪)। উপস্থ—জননেন্দ্রিয়। প্রজননের ব্যাপারকে ঋষি অন্যদৃষ্টিতে দেখছেন। সুপ্রজনন বৈদিককালে অতি পবিত্র কর্ম। গর্ভাধান একটা সংস্কার। কিন্তু তাকে দৈবীভাবনায় আবিষ্ট হয়ে সাধনারূপে গ্রহণ করতে হবে। ছান্দোগ্যে ও বিশেষ করে বৃহদারণ্যকে গর্ভাধানকে পুত্রমন্থরূপে— একটা যজ্ঞরূপে গ্রহণ করার কথা বিশদভাবে বলা হয়েছে, বৃ ৬।৪।১৩-২২। গর্ভাধানের অনেক মন্ত্র ঋগ্বেদ থেকে হুবহু নেওয়া হয়েছে। তন্ত্র ও বাউল সাধনার বীজও এখানে। সত্যকাম জাবাল এই বিদ্যার প্রবর্তক ছিলেন। প্রজনন ব্যাপার দুইভাবে দেখা যায়। কন্দর্প আর কাম। কামের অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয়ে তথা প্রাণ-মন-বুদ্ধিতে। এটা প্রজননের স্থূল ব্যাপার। কাম বুদ্ধি পর্যন্ত উঠে যায়। হৃদয়ে যে প্রেম, ভালবাসা জাগে, সেটা উল্টোদিকে কাম হয়ে আসতে পারে। প্রথমে বুদ্ধিতে, তারপর মনে ও শেষে ইন্দ্রিয়ে। আবার platonic love ও হতে পারে। ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে হৃদয় মন আর বুদ্ধিতেই থাকে, যা আনন্দরূপে প্রকাশ পায়।

পুত্রমন্থ ছাড়া আরো দুটি মন্থের কথা উপনিষদগুলিতে আছে। শ্রীমন্থ, ছা. ৫।২; বৃহ. ৬।৩; এবং ঊর্ধ্বমন্থ, তু বাতরশনাঃ... শ্রমণাঃ ঊর্ধ্বমন্থিনঃ তৈ আ. ২।৭।১, দ্র. মুনিসূক্ত ঋ ১০।১৩৬। তিনটি মন্থকর্মের লক্ষ্য যথাক্রমে— প্রজা, শ্রী আর আত্মোপলব্ধি।

প্রজনন বিদ্যায় দুটি ভাব আছে। প্রজনন ও আনন্দ। এটা বৈদিক ঋষিদের খুব বড় আবিষ্কার। তন্ত্রে ও বাউলদের সাধনায় এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও রাহস্যিক আলোচনা আছে।

প্রজাতি : প্রজনন, সন্তানোৎপত্তি। শীক্ষাবল্লীতে শেষ অনুবাকে আচার্যের উপদেশেও তাই বলা হয়েছে— প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। গৃহে ফিরে তুমি সন্তান— প্রজা উৎপাদন করবে, যাতে বংশলোপ না হয়। Physically– স্থূল, শারীরিকভাবে তোমার বংশপরম্পরা যেন অমৃত— অমর থাকে। এটাই বংশধারার মাধ্যমে অমৃতত্ব লাভ। আর অন্যটি— আনন্দঃ, কন্দর্পের ব্যাপার। √কন্ =ভালবাসা, প্রীতি, প্রেম >কন্যা=ভালবাসার পাত্র। এখানে আনন্দই প্রধান।

ছান্দোগ্যে এটাকে বামদেব্য পন্থা বলা হয়েছে। ন কাঞ্চন পরিহরেত্— তদ্ ব্রতম্, ছা. ২।১৩। তাঁর ব্রত হল সমাগমার্থিনী কোন নারীকে তিনি পরিহার করবেন না। এখানেই বিশেষ করে তন্ত্রোক্ত বামাচারের বীজ পাচ্ছি। দ্র. ঋ. ৪।৩১।১, বেমী ১ম খণ্ড পৃ ১১৮-১৯। সেখানে ইঙ্গিত আছে প্রজাতির— প্রজননের ব্যাপারকে কিভাবে ঊর্ধ্বমুখী— sublimate করা যায়। ঋষি বাৎস্যায়নও কামসূত্রে ঊর্ধ্বায়নের এই ধারার ইঙ্গিত দিয়েছেন। রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে উজ্জ্বল রসের কথা বলা হয়েছে। প্রজননের ক্ষেত্রে দুটি ব্যাপার আছে— সম্প্রয়োগ আর উপচার। যাঁরা রসিক তাঁরা জানেন লীলাবিলাসে যে সুখ, সম্প্রয়োগে সেটি হয় না। সমস্ত প্রজনন-প্রক্রিয়াকে লীলাবিলাসে নিয়ে যেতে হবে। তখন সেটাই অমৃত আনন্দের কারণ হয়। বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য সৃষ্টি প্রকরণে বলেছেন— স ৱৈ নৈৱ রেমে, তস্মাৎ একাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছত্। স হ এতাৱান্ আস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ। স এমম্ এৱ আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ত্, ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্। তস্মাত্ ইদম্ অর্ধ্ববৃগলম্ ইব স্বঃ ইতি হ স্ম আহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। তস্মাদ্ অয়ম্ আকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যতে এৱ তাং সমভৱত্, বৃ. ১।৪।৩। সেই পুরুষ যিনি একাই ছিলেন, তিনি মোটেই আনন্দিত হলেন না। এইজন্যে আজও কেউ একাকী থাকলে সুখী হয় না। তিনি সঙ্গীর অভিলাষ করলেন। স্বামী ও স্ত্রী আলিঙ্গিত হয়ে যেভাবে থাকেন, তিনি সেইরূপ হলেন। তিনি নিজের দেহকেই দুইভাগে ভাগ করলেন। তাঁর থেকে পতি ও পত্নী জাত হলেন। এইজন্যেই (পত্নী-গ্রহণের আগে) নিজ দেহ অর্ধবৃগলের (ছোলা) মতো থাকে। এই কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন। এজন্যই (পুরুষের অসম্পূর্ণ দেহরূপ) এই আকাশ পত্নীর দ্বারাই পূর্ণ হয়। পতি-পত্নী হল একটি গোটা ছোলার মধ্যে যুগনদ্ধভাবে থাকা দুটি অর্ধ-বৃগল। ভাগবতে আছে— আত্মনি অৱরুধ্য সৌরতের কথা। শ্রীধর তাঁর টীকায় বলেছেন— শৃঙ্গারেঽপি অস্খলিতবীর্যম্। তু. বাউলদের চারিচন্দ্র শোধন। এটাই কুণ্ডলিনীর উজানধারায় সহস্রারে উঠে যাওয়া। সেখানে শিবশক্তির মিলন। তিব্বতে এটাই yang-yung-এর ভাব। মহাকালের কোলে এসে গৌরী হল মহাকালী— গেয়েছেন কবি নজরুল। এটাই প্রজনন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অমৃত আনন্দের উপলব্ধি। উপস্থে যে আনন্দ, সেটি ব্রহ্মানন্দেরই প্রকারভেদ। বিষয়ানন্দে ব্রহ্মানন্দ—পঞ্চদশী।

সর্ৱম্ ইতি আকাশে। সবকিছু আকাশে নিয়ে যেতে হবে। ব্রহ্মকে সর্বরূপে সর্বধারণকর্তা আকাশরূপে তাঁর উপাসনা করবে। ব্রহ্ম সর্ৱম্ ইতি উপাসীত, ছান্দোগ্য। তিনি আকাশরূপ হয়ে সবার সবকিছুর আধার হয়ে রয়েছেন। চেতনা আকাশবত্ হলে— আকাশশরীরং ব্রহ্ম— এই অনুভূতি হলে এই ভাব গ্রহণ করা

সম্ভব। আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্ নির্বহিতা, ছা. ৮।১৪। আকাশরূপে তুমি সবকিছুর আয়তন এবং প্রতিষ্ঠা— এইভাবে উপাসনা করতে হবে।

এরপরে উপাসনার ধারা পাল্টে যাচ্ছে। এখানে সর্বাত্মভাবের কথা বলা হয়েছে, আগের অনুবাকের সঙ্গে যোগ রেখে। তিনটি সমীকরণের কথা পাওয়া যায়। (১) সমস্তই ব্রহ্ম— সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, ছা. ৩।১৪। (২) আত্মাই ব্রহ্ম— অয়মাত্মা ব্রহ্ম। তাই আত্মাই সর্ব— এতদ্ আত্মা এব ইদং সর্বম্। (৩) যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূত্ বিজানতঃ, ঈশ. ৭।

তৎ প্রতিষ্ঠা ইতি উপাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তৎ অনির্বচনীয় তত্ত্ব। তাকেই প্রতিষ্ঠা বলে উপাসনা করবে। প্রতিষ্ঠা = সবকিছুর আধার। এভাবে উপাসনা করলে তিনি প্রতিষ্ঠাবান্ হয়ে যান। সবার মাঝে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠারূপে রয়েছেন। তিনি সন্মূলঃ সদায়তনঃ সত্-প্রতিষ্ঠা। সেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠায় যুক্ত হবেন তিনি, তাঁর প্রতিষ্ঠারূপে আত্মাকে অনুভব করবেন।

তত্ মহঃ ইতি উপাসীত। মহান্ ভবতি। আদিত্যই মহঃ। মহঃ বোঝায়— বিস্তার, জ্যোতি আর শক্তি, এই তিনের সমন্বয়কে। সংহিতাতে 'মহঃ' 'মঘ'ও হয়েছে। ইন্দ্রকে বলা হয় মঘবা। আদিত্যের বিশিষ্ট ধর্ম হল রশ্মির বিকিরণ। সেই ব্রহ্মকে মহঃ বলে উপাসনা করবে। অর্থাৎ আদিত্যবত্ হয়ে যাবে— শক্তিতে এবং বৈপুল্যে। তখন ব্রহ্মের জ্যোতি বিকীর্ণ হবে। আবার সবার মধ্যে নিজেকে মহঃ = মহান্ বলে অনুভব করবে।

তত্ মনঃ ইতি উপাসীত। মানবান্ ভবতি। এখানে অন্তর্যামী ব্রহ্মের ভাব আছে। প্রতিষ্ঠারূপে, মহঃরূপে ও মনরূপে। যিনি ব্রহ্মকে মন-রূপে উপাসনা করেন, তিনি মানবান্ হবেন। √মন্>মান। ভাষ্যকাররা মনন অর্থে ধরেছেন। ঋগ্বেদে এক ঋষির এই নাম আছে। আসলে যিনি মনরূপে সবার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যান, তিনি মানবান্। সবার মন হয়ে যাওয়া। অন্যদিকে, মনের ঐশ্বর্য, বৈচিত্র ইত্যাদিও তাঁর মধ্যে ফুটে উঠবে। লক্ষণীয়, আগে মনকেই 'মন আনন্দম্' বলা হয়েছে।

তত্ নমঃ ইতি উপাসীত। নম্যন্তে অস্মৈ কামাঃ। এটা সামান্য নমস্কার নয়। √নম্ = নেমে আসা। দেবতার সম্পর্কে নমঃ =ভক্তিপূর্বক মাথা নোওয়ানো। কিন্তু এই নম্ >নাম =নেমে আসা, descent অর্থে নম্-ধাতুর ব্যবহার আছে। এখানে ব্রহ্মকে নমঃরূপে উপাসনার কথা বলা হয়েছে। তিনিই নেমে আসেন আমার মধ্যে, সবার মধ্যে। তাই তাঁর কাছে সর্বকামনা নেমে আসছে, তাঁর বশ হচ্ছে। ফলে সবার কামনা পূর্ণ হচ্ছে। আবার, কাম হল ব্রহ্মের সৃষ্টিসংকল্প। কামস্তদগ্রে

সমৱর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীত্, ঋ ১০।১২৯।৪ (নাসদীয়-সূক্ত) বলা হচ্ছে— তাঁর মধ্যে যা ছিল মনসো রেতঃ হয়ে সেটাই আমাদের মধ্যে নেমে আসে। কিন্তু অহং-কে জড়িয়ে সে কামনার রূপ ধরে। তাঁর সংকল্পই আমাদের মধ্যে নেমে আসে, কিন্তু অবিদ্যাচ্ছন্ন হওয়াতে সেটা কাম-সংকল্প হয়ে যায়। তাঁকে যদি নমঃরূপে উপাসনা করি, তাহলে তাঁর দিব্য সংকল্পই সবার মধ্যে সিদ্ধ হয় আর সাধক, উপাসক নিজের মধ্যেও সেটি অনুভব করেন। সিদ্ধকাম, সর্বকাম হন।

তদ্ব্রহ্ম ইতি উপাসীত। ব্রহ্মৱান্ ভৱতি। তৎকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করবে বলে এই আদেশগুলি শেষ করা হয়েছে। ফলে উপাসক বা সাধক ব্রহ্মবান্ হবেন। তিনি সবার মধ্যেই ব্রহ্মকে অনুভব করবেন। অন্যত্র আছে— ব্রহ্মৱিদ্ ব্রহ্মৈৱ ভৱতি। সর্বান্তর্যামী— সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে তিনি অনুভব করেন।

পরের কথাগুলি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদে আছে। তদ্ ব্রহ্মণঃ পরিমর ইতি উপাসীত ইত্যাদি। এতক্ষণ ভাবনাগুলি positive ইতিবাচক ছিল। কিন্তু এই জগতে ভালো-র সঙ্গে মন্দের negative নেতিবাচক দিকও আছে। বেদে, উপনিষদে সর্বত্র এই ভাব পাওয়া যায়। দেৱাসুরা হ ৱৈ উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ— দেবতা ও অসুর দুইই প্রজাপতির সন্তান (ছা. ১।২)। গীতাতেও দ্বিবিধ সৃষ্টির কথা আছে। দৈবসর্গ ও আসুরসর্গ। দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈৱ আসুর এৱ চ (গী. ১৬।৬)। দেবতা ও অসুরদের মধ্যে বিরোধ অনাদি। দেবীসূক্তে অসুরদের সাধারণ নাম— ব্রহ্মদ্বিষঃ। যারা ব্রহ্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এটাই অংহঃ— চেতনার সংকোচ, ক্লিষ্টতা। এটাই সাংখ্যদের অহন্তা। বড় যেন ছোট হয়ে গুটিয়ে আসে। তার দুটি রূপ এখানে দেখানো হয়েছে— সপত্নাঃ ও ভ্রাতৃৱ্যাঃ। উপমা দুটি প্রাকৃত জীবন থেকে নেওয়া হয়েছে। সপত্নাঃ সপত্নী— পতিত্বের অধিকার নিয়ে যারা লড়াই করে। এটা বাইরে থেকে আসে, alien। বাইরে বিদ্বেষ করে। আর ভ্রাতৃব্যা = নিজেদের মধ্যে, ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ, যেমন কুরুপাণ্ডব। ছান্দোগ্যেও দেবাসুর সংগ্রামের কথা আছে। সাপত্ন্যের কথাও আছে। সাপত্ন্য বা ভ্রাতৃব্য— প্রজাপতিরই দুটি দিক। স্পষ্টত যারা বিরোধ করে, তারা সপত্নাঃ। আর যার মুখোসপরা, মিত্র বা ভাইয়ের মতো, তারা ভ্রাতৃব্যা, যেন কত আত্মীয়ের মতো। তখন 'ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে'। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেখলে, আমার মধ্যেই দিব্য ও অদিব্য বৃত্তি— দৈবী ও আসুরী সম্পদ আছে।

পরি এনং ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যে অপ্রিয়াঃ ভ্রাতৃৱ্যাঃ। সপত্নাঃ— যারা আমায় বাহ্যত দ্বেষ করে, আর ভ্রাতৃব্যাঃ— যারা আমার অপ্রিয় হয়, তারা

ভিতরে ভিতরে দ্বেষ করে। এই জাতীয় কথা বেদ, উপনিষদে অনেক জায়গায় আছে। আদিত্যদ্যুতির বিকিরণে এই অন্ধকার, অবিদ্যা দূর হয়ে যায়। আর তখন যেমন বাইরে, তেমনি ভিতরে সব আলোকিত হয়ে যায়। এটাই ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ। ব্রহ্ম মাঝখানে, তাঁর চারিদিকে মৃত্যুর খেলা চলছে। এটাই কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃত্ প্রবৃদ্ধঃ-এর রূপ (গী. ১১।৩২)। কৌষীতকিতে এর বর্ণনা পাই। দীপশিখার চারিদিকে আঁধার মরে যাচ্ছে। এটাই সংহিতার ভাষায়— সানুচর বৃত্রের শেষ হওয়া। সবকিছু আলোময় হয়ে যায়। এই অবস্থা যিনি লাভ করেন, তিনিই মহান্ পুরুষ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যৱর্ণং তমসঃ পরস্তাত্, শ্বেতা, ৩।৮।

স যঃ চ অয়ং পুরুষে। যঃ চ অসৌ আদিত্যে স একঃ। সেই যিনি এই পুরুষে আছেন অর্থাৎ এই পুরুষে, এই মানুষে যে চৈতন্যপুরুষ, যে তেজ, যে দীপ্তি, যে আলো আছে, যাতে তার চারিদিকের অন্ধকার দূর হয়ে যাচ্ছে আর ঐ আদিত্যে যে চৈতন্যপুরুষ যে তেজ, যে দীপ্তি, যে আলো আছে— সে একই। এই পুরুষ আর ঐ আদিত্য দুইই এক। ঈশোপনিষদের যঃ অসৌ অসৌ পুরুষঃ সঃ অহম্ অস্মি— একই কথা। এখানে পরোক্ষভাব আর ঈশ.তে অপরোক্ষভাব।

স যঃ এৱং ৱিত্। অস্মাত্ লোকাত্ প্রেত্য। এতম্ অন্নময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য। এতং প্রাণময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য। এতং মনোময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য। এতং ৱিজ্ঞানময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য। এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য। ইমান্ লোকান্ কামান্নী কামরূপী অনুসঞ্চরন্। এতত্ সাম গায়ন্ আস্তে। হা৩বু, হা৩বু হা৩বু।। ৩।১০।৫।।

অহম্ অন্নম্ অহম অন্নম্ অহম্ অন্নম্। অহম্ অন্নাদো ৩ অহম্ অন্নাদো ৩ অহম্ অন্নাদঃ। অহং শ্লোককৃত্ অহং শ্লোককৃত্ অহং শ্লোককৃত্। অহম্ অস্মি প্রথমজা ঋতা৩স্য। পূর্ৱং দেৱেভ্যঃ অমৃতস্য না৩ভাঁয়ি। যঃ মা দদাতি, স ইত্ এৱ মা৩ আৱাঃ। অহম্ অন্নম্, অন্নম্ অদন্তম্ আ৩দ্মি। অহং বিশ্বম্ ভুবনম্ অভি অভবা৩ম্। সুৱঃ (= স্বঃ) ন জ্যোতীঃ যঃ এৱং ৱেদ। ইতি উপনিষত্।। ৩।১০।৬।।

যিনি এইভাবে জানেন তিনি এই লোক হতে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে অন্নময় আত্মাকে উপসংক্রান্ত করে, এই প্রাণময় আত্মাকে উপসংক্রান্ত করে, এই মনোময় আত্মাকে উপসংক্রান্ত করে, এই বিজ্ঞানময় আত্মাকে উপসংক্রান্ত করে (এবং) এই আনন্দময় আত্মাকেও উপসংক্রান্ত করে, এই সমস্ত লোকে যথাকাম, যথেচ্ছ অন্নবান ও রূপবান হয়ে বিচরণ করেন। আর এই সামগান গাইতে থাকেন, 'অহো, অহো, অহো'— ৩।১০।৫।।

আমি 'অন্ন, আমি অন্ন, আমিই অন্ন। আমি অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা, আমিই অন্নভোক্তা। আমি অন্ন ও অন্নাদের শ্লোককৃত্ অর্থাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা, আমিই পরম বাকের শ্রোতা, আমিই জ্ঞাতা। আমি ঋতের প্রথম জাতক, আমি দেবসৃষ্টিরও পূর্ববর্তী, আমি অমৃতের নাভি। যিনি (অন্নস্বরূপ) আমাকে অন্ন দেন, তিনি (এভাবেই) আমাকে রক্ষা করেন। আর যিনি অ দান করেন না, তাঁকে অন্নরূপী আমি ভক্ষণ করি। আমি সমস্ত জগৎকে উপ ংহার করি। (আমার) জ্যোতি আদিত্যের 'মতো নিত্য প্রকাশমান। যিনি এভাবে জানেন তাঁর এটাই উপনিষৎ। ৩।১০।৬।।

এখানে সর্বাত্মভাবের ছবি খুবই স্পষ্ট। আদিত্যের মধ্যে যে পুরুষ আর আমার মধ্যে যে পুরুষ— দুইই এক। সেই আদিত্যজ্যোতিই আমার মধ্যে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তখন আমার মধ্যে যে অন্নময় আত্মা— physical self, সে অস্মাত্ লোকাত্ প্রেত্য— এই ব্যক্তিগত, সীমিত লোক থেকে উৎক্রান্ত হয়ে, সবার সঙ্গে এক হয়ে যায়। আগে বলা হয়েছে, আত্মা বৈ ইদং সর্ব্বম্। সেই আত্মা পঞ্চপর্বা— অন্নময় থেকে আনন্দময় পর্যন্ত। সেই আত্মা অন্ন থেকে আনন্দের ভিতর দিয়ে বিশ্বাত্মক, সবার মধ্যে সংক্রামিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েন। যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ ৱিজানতঃ। (ঈশ, ৭) —যার মধ্যে সর্বভূত— সকলে তাঁর আত্মস্বরূপই হয়ে যান। একই কথার এপিঠ-ওপিঠ।

ইমান্ লোকান্ কামান্নী কামরূপী অনুসঞ্চরন্— তখন তিনি কামান্নী, সবার অন্নই তাঁর অন্ন। সবার বিচরণ তাঁর বিচরণ। তিনি সর্বময়, তিনি কামচারী, ইচ্ছাচারী। এটাই পরিব্রাজকের প্রব্রজ্যার অবস্থা। যার কথা বৃহদারণ্যকে বলা হয়েছে। দ্র. বৃ. ৪।৫।১৫। এইভাবে পরম-মুক্তির সহজানন্দের অবস্থা লাভ করে তিনি এতত্ সাম গায়ন্ আস্তে। এই সামগান গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়ান, আপন মনে বিভোর হয়ে থাকেন। যেমন বাউলরা নেচে নেচে গান গেয়ে ঘুরে বেড়ান। সন্ত ও নাথযোগীদের অবস্থা। শ্রীরামকৃষ্ণ, রমণ মহর্ষি, আনন্দময়ী মায়ের অবস্থা। ঋগ্বেদে আছে— নাধমানস্য কীরেঃ (ঋ. ২।১২।৬)। নাধমান, যারা ভিক্ষা করে বেড়ান গান করতে করতে √নাধ্ =যাজ্ঞা করা দেবতার কাছে। ভিক্ষাজীবী কীর্তনীয়ারও প্রচোদয়িতা (বেমী ৩।৭৩৯)। √নাধ >নাথ। ধাতু নাধের অর্থ চাওয়া। যাঁরা চাইতেন, তাঁরা স্বরাট্ পুরুষ ছিলেন। মহারাজ, স্বামী শব্দগুলির মতো নাথ শব্দও ঈশ্বরবাচক হয়েছে। কিন্তু আসল অর্থ যাচক। প্রব্রজ্যার ধারা বৌদ্ধযুগে প্রবল হয়ে গিয়েছিল।

সাম গায়ন্ আস্তে— এই সাম হল হা৩বু, হা৩বু, হা৩বু। কামরূপ শব্দটি অন্নাদকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। যেমন অন্নের বিবিধ রূপ, তেমনি অন্নাদেরও বিবিধরূপ। অন্ন আর অন্নাদ— দুভাবেই তিনি যথাকাম।

অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নম্। সবকিছুই অন্নাদকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। মন্ত্রের কিছুটা ঋগ্বেদ, আর কিছুটা সাম ও যজুর্বেদ থেকে নেওয়া হয়েছে। সমস্তটাই যেন একটা স্বরলিপি। যখন সুর দেওয়া হয়, তখন সুরের টানে শব্দের কিছু বিকৃতি ঘটে। মন্ত্র এখানে বিকৃতি-শুদ্ধু দেওয়া হয়েছে। যেমন হা৩বু=হাউ। একে স্তোভ বলে। স্তোভাক্ষর বলে মাঝখানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সামগানে স্তোভের ব্যবহার ছিল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে তার আলোচনা আছে। দ্র. ছা. ১।১৩ হাউ, হাই, অথ, ইহ— ইত্যাদি স্তোভাক্ষর।

অহম্ অন্নাদো ৩ অহম্ অন্নাদো ৩ অহম্ অন্নাদঃ— এখানে অন্নাদ-শব্দে প্লুত স্বর। শ্লোককৃত্-শব্দে কোন স্বরের বিকার নেই। এরপর ঋতা৩স্য শব্দে প্লুত স্বর। আসলে ঋতস্য হবে। গানের টানে প্লুত হবার জন্য ঋতা...স্য হয়েছে।

পূর্বং দেবেভ্যঃ অমৃতস্য না৩ভায়ি। আসল শব্দ নাভিঃ >সুরের টানে নাভায়ি হয়েছে।

যঃ মা দদাতি স ইত্ এব মা৩বাঃ। এখানে মা প্লুত। মা+আবাঃ।

পঞ্চম অনুচ্ছেদের হাউ থেকে এই ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে ভবাম পর্যন্ত সামগান।

অন্ন এবং অন্নাদ যিনি, তিনি ব্রহ্মীভূত। অন্যত্র আছে তিনি কামচারঃ। যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ান। অন্ন matter, পদার্থ, বস্তু। অন্নাদ চৈতন্য, spirit। matter and spirit– অন্ন ও অন্নাদ— দুইই আমি। আত্মা আর ইদম্— দুই এক। আত্মা বৈ ইদং সর্বম্।

প্রথম 'অন্নম্' পদার্থ, বস্তু, matter। সে এমন শক্তি, যে নিজেই নিজেকে খাচ্ছে। যিনি খান, তিনি অন্নাদ। অন্ন থেকেই অন্নাদ হয়েছে। যেমন— কাঠে ঘুণপোকা। Matter থেকে spirit, বস্তু থেকেই চৈতন্য। কর্তা, জ্ঞাতা, ভোক্তা পুরুষ— প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই দেখা দেয়, এটাই evolution-এর ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের প্রথম স্তর। সবাই অন্নাদ কিন্তু শ্রেষ্ঠ অন্নাদ হলেন, যিনি শ্লোককৃৎ—মন্ত্রকৃৎ। শ্লোক—√শ্রু >শ্রোকঃ >শ্লোকঃ। র, ল হয়ে যায়। শ্রোক আর শ্রুতি এক কথা। যা শোনা যায়, সেটি শ্রোক। শ্রোক নাদানুসন্ধান। ব্রহ্মকে শ্রবণ করা। আকাশবৎ চেতনায় প্রথম স্পন্দ ওঁকারকে শ্রবণ করা— এটাই শ্রোকঃ, শ্রুতি। যখন উচ্চারণ করি, তখন সেটি শ্লোক হয়ে যায়। যিনি নিজে শুনে শোনাচ্ছেন পরম ব্যোমের স্পন্দ, তিনি শ্লোককৃৎ। পরমা বাক্‌কে শুনে মন্ত্ররূপে

প্রকট করলেন আর তখন সেটি সবার শ্রুতিগম্য হল। এমনি করে শোনা, জানা আর জানানো— এটা অন্নাদের পরম অবস্থা। তাতে জগতের সঙ্গে যে সম্পর্ক তার মূল কথাটি এখন বলা হবে।

অহম্ অস্মি প্রথমজা ঋতা৩স্য। পূর্বং দেবে ভ্যঃ অমৃতস্য না৩ভায়ি।

আমি ঋতের প্রথমজাত এবং অমৃতের নাভি। আমি মনুষ্যসৃষ্টির আগে, দেবসৃষ্টিরও পূর্ববর্তী। দেবতাদের পূর্বে ঋতের প্রথমজাত এবং অমৃতের নাভি— দুটোকে এক অর্থে গ্রহণ করতে পারি। সৃষ্টির ধারা এভাবে ধরতে পারি। ঋত প্রথমজাত, যিনি অমৃতের নাভি। তাঁর থেকে উৎপন্ন দেবগণ। তারপরে গন্ধর্ব, পিতৃগণ, মনুষ্য প্রভৃতি। ঋতের প্রথমজাত অর্থাৎ ঋতের সঙ্গে বা আগে এক তত্ত্ব সৎ বা সত্য। ঋতং চ সত্যং চ অভীদ্ধাত্ ঋ. ১০।১৯০।১। আবার, সত্যম্ দুইভাগে বিভক্ত— সৎ চ ত্যত্ চ। যা সৎ, তা ঋতের সত্, এবং ত্যত্— that, অনির্বচনীয়, নিরাকার নিরঞ্জন নির্গুণ তত্ত্ব। সৎ আর ত্যত্ দুটি মিলে যা হয়, সেটি ঋতের পূর্ব। তিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ— সৎ এবং ঋত থেকে প্রথমজাত, যাকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। ঋগ্বেদে হিরণ্যগর্ভসূক্ত আছে— ১০।১২১। সেখানে বলা হয়েছে— হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীত্। সবার আগে জাত হয়েছিলেন হিরণ্যগর্ভ। ঋগ্বেদে বিশ্ব-আদি অগ্নিকেও বলা হয়েছে প্রথমজা ঋতস্য। তিনি আদি অগ্নি cosmic fire বা firmament। তিনিই হিরণ্যগর্ভ। এইরূপে তিনি ঋতম্ আর সত্যম্। উভয়ই আদিতত্ত্ব। তাইতে তিনি অমৃতের নাভি। এই কথা ঋগ্বেদে অনেক জায়গায় আছে। অমৃতের এষণা এক জায়গায় গিয়ে সঙ্গত হলে সেটাই নাভি। যেমন চক্রের অরগুলি যেখানে সঙ্গত হয়, সেটাই চক্রের নাভি। ঋতের প্রথমজাতকে পেলে অমৃতকে পাওয়া যায়। এটা বৈদিক হিরণ্যগর্ভ, বৈদান্তিক নয়।

যঃ মা দদাতি স ইত্ এব মা৩ আবাঃ। (মা আবাঃ)। যে আমাকে দেয়, সে আমাকে পালন করে। যে আমাকে অন্নরূপে দেখে, সে অন্নাদরূপী আমাকে রক্ষা করে। ঋগ্বেদে ঋষি ভিক্ষু আঙ্গিরসের ধনান্নদানম্ সূক্তে (১০।১১৭) আছে— কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী— যে একা অন্ন ভক্ষণ করে, সে পাপ ভোজন করে। অন্ন সবার সঙ্গে ভাগ করে খেতে হয়। তাতে চিৎপুরুষ অন্নাদ পুষ্ট হন। আবার, অহম অন্নম্ অন্নম্ অদন্তম্ আ৩দ্মি। ভাষ্যকারেরা অদন্তম্ শব্দের অর্থ করেছেন— যে অন্ন দান করে না, সেটা ঠিক নয়। সামবেদে এই মন্ত্র আছে। ব্যাকরণসিদ্ধ শব্দ হবে অদদত্। কেউ যদি অন্ন না দিয়ে (আদ্য) অন্ন খায়, তাকে অহম্ অন্নম্— আমি অন্নরূপে ভক্ষণ করি। অথবা অন্ন তাকেই খায়। যদি অন্ন দিয়ে খাওয়া যায়,

তাহলে অন্ন আমাকে খায় না। আগে বলা হয়েছে, যে অন্ন দেয়, সে অন্নাদকে পুষ্ট করে। পরে বলা হল, যে অন্নদান করে না, তাকে অন্নরূপে আমিই খাই।

অহং ৰিশ্বং ভুবনম্ অভি-অভবা৩ম্। আমি বিশ্ব-ভুবনকে অভিভূত করে আছি। সবাই আমার শাসনের অধীন। আমি যেমন অন্তর্যামী, তেমনি প্রশাস্তাও। তিনি সর্বেশ্বর। এটা তাঁর ঐশ্বর্যের দিক।

সুৱঃ (=স্বর্) জ্যোতীঃ যঃ এবং বেদ। যিনি এইভাবে নিজেকে এবং ব্রহ্মকে জানেন, তিনি সূর্যের জ্যোতির মতো হিরণ্ময় হয়ে যান। যেন সূর্যই হয়ে যান।

ইতি উপনিষত্। এই হল উপনিষৎ— পরমাত্মজ্ঞান।

ভৃগুবল্লীর দশম অনুবাক সমাপ্ত হল। তার অন্তে শান্তিপাঠ— ওঁ সহ নাৱৱতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ ৱীর্যং করৱাৱহৈ। তেজস্বি নাৱধীতমস্তু। মা ৱিদ্বিষাৱহৈ।।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভৃগুবল্লীর দশম অনুবাক সমাপ্ত।

তৈত্তিরীয় উপনিষত্ সমাপ্ত।

শব্দসূচি

অকামহত ১০৬, ১০৯
অকামহত শ্রেত্রিয় ১০৭, ১১২
অগ্নিবিদ্যা ১১৬
অগ্নিভাজন ৯১
অগ্নিস্বাত্ত ৯১
অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ ৭৯
অতিমানস ১২৪
অতিষ্ঠা ১১৮
অতিষ্ঠাতত্ত্ব ১০১, ১১৭
অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্ ১১৮
অত্যগ্রাক্ষী ৬৪
অধিজ্যোতিষম্ ২৭
অধিবিদ্য ২৭
অধিপ্রজম্ ২৮
অধিলোক ২৬
অধীতি ৬৬
অধ্যাত্ম ২৮
অনর্থকাঃ মন্ত্রাঃ ২৫
অনিরুক্ত স্তোভ ১০২
অনিলয়ন ১০২
অন্ন ১৫, ১৭, ১৮, ৮০, ৮১, ১১৬
অন্নবান ২২৭
অন্নময় দেহ ৯২
অন্নময় পুরুষ ৭২, ৮২, ১০০
অন্নময় ভূমি ৮৯
অন্নরসময় আত্মা ১১২
অন্নরসময় পুরুষ ৭১, ৭৮, ৭৯, ৮৫
অন্নশুদ্ধি ১১৭
অন্নাদ ১৫, ১৭, ১৮, ৮০, ১২৭
অন্নাদ্য ১২৬
অপাং নপাৎ ১২৯
অপ্রমত্তা ৯২
অবাক্‌শাখ ৫৬
অবিদ্যা ৯৭
অবিদ্যার অস্মিতা ৯৭
অব্যক্ত ১৬
অব্যক্ত অসৎ ১০৪
অব্যক্ত পুরুষ, অব্যক্ত প্রকৃতি ৯৭
অভয়ং জ্যোতিঃ ৩৯
অভিনিবেশ ১০৫
অমৃতলোক ৪২
অমৃতের নাভি ১৪৩
অসৎ ব্রহ্ম ১৬, ৯৭, ৯৯, ১০০
অসস্মাত্র ৯২
অসম্ভূতি ৭৬, ১০২
অসুর ১১৭
অস্তিব্রহ্ম ১৬
অস্মিতা ৯৭
অহন্তা ১৩৯
অংহ ১৩৯
আকাশ ৯১
আকাশ শরীর ব্রহ্ম ৭৬, ১২২
আনান ১, ১০৭, ১১১
আণব ৬৫
আদিত্য ৪১
আদিত্যলোক ৪২
আনন্দ ৬৭, ৯৩, ১০১
আনন্দ ব্রহ্ম ৯০, ১০৮, ১১৩
আনন্দময় আত্মা ৯২, ১১৩
আনন্দময় পুরুষ ৭২, ৮২, ৮৭, ৯২, ১০০
আনন্দময় প্রাণ ৮৪
আনন্দময় ব্রহ্মলোক ৯৮

আনন্দময় শরীর ৯৯
আনন্দমীমাংসা ১৬, ১৮, ১০১, ১০৬
আভাস্বর চেতনার ভূমি ৯৭
আশিষ্ঠ ১০৯
আহার শুদ্ধি ১১৭
ইন্দ্রদ্বার/ইন্দ্রযোনি ৪৬
ঈক্ষা ১০৯
উদ্ধারণ ২৫
উজ্জ্বল নীলমণি ১৩৭
উদ্‌গীথ ২৯, ৫১
উপরিবুধ্র ৩৭
উপচার ১৩৪
উষর্বুধ ৩৬
ঊর্ধ্ব পবিত্র ৫৬
ঊর্ধ্বমূলোঽ বাক্‌শাখ ৩৬
ওঙ্কার ৫২
ঋত এবং সত্য ২২, ৫৪
ঋতম্ ৮৮, ৯৩
ঋতং বৃহৎ ৭৭
ঋতের প্রথমজাত ১৪১
ঋত্বিক্ ৯১
কারণ শরীর ৯৯
কুশল ১৪
কেশী ৭৫
চক্ষুষ্পতি ৪৫
চন্দ্রমা ৪২
চারিচন্দ্র শোধন ১৩৪, ১৩৭
চিতিশক্তি ১১৯
চিত্তের পঞ্চভূমি ৮৯
চিন্ময় প্রত্যক্ষবাদ ২১, ২২, ৭১
জীবশক্তি ১১৯
জ্যেষ্ঠব্রহ্ম ৯১
জ্যোতি ২৬
জ্যোতিরগ্রাঃ ৩৯
তনূরপাত্ ৬৪
তপঃ ১১৯, ১২১
তুবিজাত ৩৮
ত্যত্ ১৬, ১৮, ৯৯, ১০২
ত্রিশঙ্কু ১৪, ৫৬, ৫৭
দক্ষিণামূর্তি ৮৮
দম ৩৩
দর্শত ১১
দিব্যমন ১১১
দিব্য সম্বিৎ ১১০
দিব্য সুপর্ণ ৮০
দীক্ষা ৯১
দেবতা ৭৪
দেবযাস পথ ৯১
দেবীর্ আপঃ ৭৫, ৭৬, ১২৯
দেবীর্ দ্বারঃ ১৩
দৈবী সমাজ্ঞা ১৮, ১৩২
ধাতা ৩৮
নক্ষত্র ১৩৫
নাকঃ মৌদ্‌গণ্য ৫৫
নাধমান ১৪১
নাভানেদিষ্ঠ ৭৩
নিবিদ ৩৯
নিম্ন প্রাণ ঊর্ধ্ব প্রাণ
নি মৃজে ৩৭
নির্বাস প্রলয় ৭৬
নিলয়ন ১০২
নিহশ্রেয়স্ ২৮, ৬৮
নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয় ৮৬
পরম ব্যোম ১৫
পরাক্ দৃষ্টি ১৭
পরা বাক্ ১১৯, ১২০
পশ্যন্তী বাক্ ১১৯, ১২০
পাংক্ত ব্রহ্ম ১৩, ৪৯
পারায়ণ
পিতু ১২৬
পিপ্পলাদ পুরুষ ১০৪
পুত্রমস্থ ১৮, ১৩৭
পুরুষ ও প্রকৃতি ৭৬, ৯৫, ১০২
পৃশ্নি ১৩
পৃশ্নিমাতরঃ ১৩
পৌরুশিষ্টি ১৪, ৫৫
প্রজন
প্রজনন বিদ্যা ১৩৬
প্রজাতি ১৩৬
প্রজ্ঞান ১২১
প্রণবতন
প্রণববিদ্যা ১৪

প্রতিগর শস্ত্র
প্রত্যক্ দৃষ্টি ১৭
প্রবর্তদশা ১১৯
প্রভাস ৯০
প্রমোদ ৯৩
প্রাচীনযোগ্য ৪৮
প্রাণ অপান ব্যান ৪৩, ৪৪, ৮৩
প্রাণময় আত্মা ৮২
প্রাণময় দেহ ৮৮, ৯২
প্রাণময় পুরুষ ৪৭, ৮২, ৮৫, ৮৭
প্রাণময় ভূমি ৮৯
প্রাণাগ্নিহোত্র ৮০, ১২৬, ১২৮
প্রাণাপান ৪৪, ১৩৩
প্রীতি-সহগত ধ্যান ৯৩
প্রিয় ৯৩
প্রেত্য ৯৮
প্রেত্য চেতনা ৯৮
বাক্‌পতি ৪৫
বায়বী বাক্ ১১৯
বারুণী বিদ্যা ১৭
বিচর্ষণ ৩০
বিচারসহগত ধ্যান ৯৩
বিজ্ঞান ৯০
বিজ্ঞান চেতনা ৯০
বিজ্ঞান পতি ৪৫
বিজ্ঞানব্রহ্ম ৯০, ১২৪
বিজ্ঞানভূমি ১১১
বিজ্ঞানময় ৯১
বিজ্ঞানময় আত্মা ৮৭, ৯২
বিজ্ঞানময় পাখি ৮৯
বিজ্ঞানময় পুরুষ ৪৭, ৯২
বিজ্ঞানময় প্রাণ ৮৪, ১১১
বিজ্ঞানানন্দময় পুরুষ ৮০
বিজ্ঞানী পুরুষ ৯১
বিজ্ঞানের ভূমি ৯০
বিতনন ৯১
বিতর্ক-সহগত ধ্যান ৯৩
বিতান ৯১
বিদেহ ভাবনা ১০৮
বিদ্যার অস্মিতা ৯৭
বিপশ্চিত্ ৭০, ৭১
বিবৃতং সদ্ম ৬৫
বিরাট পুরুষ ১১৮
বিশ্বব্যাপী চৈতন্য ৪১, ৮৯
বিশ্বেদেবা ৯১
বিষয়ানন্দে ব্রহ্মানন্দ ৯৩, ১১০, ১২৭
বিষ্ণু ২২
বৈখরী বাক্ ১১৯
বৈশ্বানর অগ্নি ৭৪, ৭৫
ব্যক্ত ও অব্যক্ত ১৬
ব্যাহৃতি ২৬, ৩০, ৩৯, ১১৯
বৃহরশ্মীন্ ৭৫, ১২১
ব্রহ্ম ২৩, ৯৩
ব্রহ্মক্ষোভ ১০১
ব্রহ্মচৈতন্য ৪১
ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বার পান ৪৭, ১১৬
ব্রহ্মণ্ ৩২
ব্রহ্মদ্বিষ ১৩৯
ব্রহ্মবর্চস ২৬, ২৮, ৫৬
ব্রহ্মবর্চস্বী ১২৮
ব্রহ্মবৃক্ষ ৫৬
ব্রহ্মবেদ ৪৩
ব্রহ্মযজ্ঞ ৫৪
ব্রহ্মযোনি ১০৪
ব্রহ্ম ৯১
ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার ১৭, ১১৬
ব্রাহ্মণ ৩২, ৫১
ব্রাহ্মী স্থিতি ৯২
ভগ ৩৫, ৩৮
ভাগবত ৩৫
ভাবতনু ১২৮
ভার্গবী বারুণী বিদ্যা ১৭, ১০০, ১১৭, ১২৫
ভূদেব ৯১
ভূর্ভুবঃস্বঃ ৪০, ৪৭, ৪৮, ৯৩, ১১৯
মনোভূমি ১১১
মনোময় আত্মা ১১৩
মনোময় চৈতন্য ৭৩
মনোময় দেহ ৯২
মনোময় পুরুষ ৪৬, ৪৭, ৮৫
মনোময় প্রাণ ৮৪
মনোময় ভূমি ৮৯
মন্ত্রময় পুরুষ ৮৬

মরুৎ ৯৬
মহত্ ৯৭
মহত্তত্ত্ব ৭৭, ১২৫
মহঃ, মখ ১৮, ৪১, ৮৮, ৮৯, ৯৩, ১৩৮
মহর্লোক ১২৪
মহাক্ষত্রিয় ১২৫
মহাবিদেহ ভাবনা ১০৮
মহাশাল ১২৫, ১৩১
মহাশ্রোত্রিয় ১৩১
মহাসংহিতা ২৬
মানবান্ ১৩৮
মানবৌখ ১১০
মানুষী সমাজ্ঞা ১৮, ১৩২
মানসযজ্ঞ ৯১, ১১১
মায়াশক্তি ১১৯
মার্গ দর্শন ৯১
মাহাচমস্য ১১৯
মিত্রাবরুণ ১৬, ২১
মোদ ৯৩
মৌদ্‌গল্য ১৪, ৫৫
যজ্ঞ ৯০, ৯১
যশ ৯০, ৯১
যুক্তাহারবিহার ১২৭
যোগ ৯৩
যোগক্ষেম ১৩৩
যোগবীর্য ৮৮
রতিতত্ত্ব ১০৪
রাথীতর ২৪, ৫৫
লোক ২৬, ৭৪
শব্দব্রহ্ম ২২
শমঃ ৩৩
শাক্ত ৫৫
শম্ভব ৬৫
শিক্ষা/শীক্ষা ২৪, ২৫
শ্রদ্ধা ৮৮, ৮৯, ৯৩
শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ৬৫, ১১৮
শ্রোক শ্রুতি ১৮, ১৪২
শ্রোত্রপতি ৪৫
শ্রোত্রিয় ১১০
ষোড়শকল পুরুষ ১৩, ৪৪
সকৃত্ সদ্‌ব্রহ্ম
সক্ষত্র ১৩৫
সৎ ১৬, ৯৮, ৯৯, ১০২
সৎ চিৎ আনন্দ ২৬, ৬৮, ৭২, ৯০
সত্ত্বতনু ১২৯
সত্ত্ব রজঃ তম
সত্যম্ ৮৮, ৯৩, ৯৪
সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্ ৭১, ৭৮, ১০০
সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম ৯৫
সদ্‌ব্রহ্ম ৯৭
সন্তম্ ৯৮
সন্তান ২৫
সম্মাত্র ৭৬, ৯১, ১১৭
সমূহিত চেতনা ৭৭
সম্প্রয়োগ ১৩৭
সম্ভূতি ৭৬
সর্ব অস্মিতা ৯৭
সর্বায়ুষ ৮৪
সহজানন্দ ৯৩
সহস্রবল্‌সঃ/শাখা ৩৬
সানন্দ সমাপত্তি ৯৩
সাম ২৫
সুকৃত ১৬, ১০৩
সুকর্মকৃৎ ১০৩
সুবর্গ ২৮
সোমলোক ৪২
সোম্য জ্যোতি ৪৩
স্তোভ, স্তোভাক্ষর ১৪২
স্বপ্নচেতনা ৮৯
স্বর্জ্যোতি ৩৯
স্বাধ্যায় ও প্রবচন ৫৪, ৫৯
স্বারাজ্য ৪৭, ৪৮
স্বিষ্টকৃৎ ৭৫
হিতানাড়ী ৩৮, ৯১
হিরণ্যগর্ভ ১৪৩

শব্দসূচি করে দিয়েছেন শ্রীমতী শুভ্রা মজুমদার।